রাজনৈতিক তত্ত্ব

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

রাজনৈতিক তত্ত্ব

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

এন সি ই আর টি-র

Political Theory পাঠ্যপুস্তকের

২০১৭ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ।

এন সি ই আর টি অনুমোদিত

প্রথম বাংলা সংস্করণ-

প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০১৯

পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ : সমীরণ দেবনাথ।

অক্ষর বিন্যাস : পিংকি দেবনাথ

মূল্য: ৭০ টাকা মাত্র

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড,
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭২

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

১। ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং, এন সি ই আর টি।

২। ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর, এন সি ই আর টি।

অনুবাদ

১। ড: রতন মজুমদার, অধ্যাপক।
২। কিরীট কুমার সাহা, শিক্ষক
৩। কমল কুমার ভৌমিক, শিক্ষক
৪। ড: মোস্তাফা কামাল, শিক্ষক
৫। সৌরভ বিশ্বাস, শিক্ষক
৬। নির্মল চন্দ্র দেব, শিক্ষক
৭। কমল দাস, শিক্ষক

পরিমার্জনা

১। সুধীর কান্তি ভুষণ, অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক
২। শুক্লা সিংহ, শিক্ষিকা
৩। প্রবুদ্ধসুন্দর কর, শিক্ষক

প্রাক্‌কথন

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, শিশুদের স্কুলজীবন ও স্কুলের বাইরের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকা খুব প্রয়োজন। তার কারণ, শিশুদের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে সেইসব শিশুদের স্কুল, বাড়ি এবং সম্প্রদায়— এই তিন জায়গার শিক্ষায় একটি বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মূলত এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন ধরনের পাঠ্যবই তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিশুদের মুখস্থ করা এবং চারদেয়ালের মধ্যে তীব্রভাবে আবদ্ধ করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার প্রবণতা করা বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তন জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপরে, যাঁরা শিশুদের শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং বিভিন্ন কাজে শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। আমাদের এটা মনে রাখা খুব জরুরি, শিশুরা যদি সময়, স্থান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিয়ে তারা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। একমাত্র পাঠ্যবই পড়েই পরীক্ষায় পাস করা যায় - মূলত এই ধারণার ফলেই শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলো সর্বদা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওদের এই গোটা শিখন প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র গ্রহীতা না ভেবে একটা পূর্ণ অংশীদার মনে করব।

তবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পরিবর্তন অনিবার্য। স্কুলের দৈনন্দিন সময় সূচি যেমন নমনীয় হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই বার্ষিক কার্যসূচি এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষাদানের দিনগুলোর সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন না আসে। তবে বাস্তবে এই নতুন পাঠ্যবই শিশুদের কতটুকু কাজে লাগবে। ওদের স্কুলজীবন কতটা সমৃদ্ধ করবে কিংবা ওদের স্কুলজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে না, সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই বইটি স্কুলে পড়াবেন এবং কীভাবে সেই পড়ার

মূল্যায়ন করবেন। বিগত দিনগুলোর ন্যায় শিশুদের যাতে পাঠ্যবইয়ের বোঝা বইতে না হয়, এই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য শিক্ষাদানের প্রদত্ত সময় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি স্তরের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের নানারকম প্রশ্ন করা, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, ছোটো ছোটো গ্রুপ বানিয়ে আলোচনা করা এবং হাতে-কলমে শিক্ষা এইসব কিছুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে এই বইটি রূপায়ন করেছেন তাঁদেরকে এন সি ই আর টি প্রশংসা জানাচ্ছে। এই কমিটির কার্যকলাপকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হরি বাসুদেবন এবং এই পাঠ্য বইয়ের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক যোগেন্দ্র যাদব এবং অধ্যাপক সুহাস পালসিকার মহোদয়গণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পাঠ্যবই পুনর্গঠনের পিছনে বহু শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা সেইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন তাঁদের বহুমূল্য সম্পদ, উপাদান এবং লোকবল নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এম এইচ আর ডি) চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি এবং অধ্যাপক জি পি দেশপান্ডের তত্ত্বধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত জাতীয় পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্যদের বহুমূল্য সময় ও অবদানের জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নিজেদের প্রকাশনা এবং ব্যবস্থাপনার গুণগত মান সংস্কারের কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকা এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষ সর্বদা পাঠকদের মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানায়, যাতে ভবিষ্যতে পাঠ্যবই সংশোধনী প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

নিউ দিল্লি
২০ ডিসেম্বর ২০০৫

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ
(এন সি ই আর টি)

অবতরণিকা

এবছর এন সি ই আর টি একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য রাজনৈতিক তত্ত্ব নামে একটি পৃথক খণ্ড চালু করেন। এই পরিবর্তনটি বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের নতুন নকশা ও সংস্করণের জন্য গৃহীত বিশাল পরিকল্পনারই একটি অংশ। শিক্ষার্থীরা পূর্বে ফ্যাসিবাদ, মার্কসবাদ, উদারনীতিবাদ ইত্যাদির মত রাজনৈতিক মতাদর্শগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারণা ও তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারত। সাম্য এবং স্বাধীনতার মত ধারণাগুলো মাঝে মাঝে উল্লেখিত মতাদর্শগুলো সম্পর্কে অধ্যয়নের সময় পরোক্ষভাবে আবির্ভূত হতো। নতুন পাঠ্যক্রমে রাজনৈতিক মতাদর্শগুলোর পরিবর্তে রাজনৈতিক ধারণাগুলোর উপরেই অধিক জোড় দেওয়া হয়। এই পাঠ্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীদের সাথে ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও মতাদর্শের সাথে পরিচয় করানো যেগুলো, বর্তমান পৃথিবীর চলমান রাজনৈতিক চিন্তাধারাজনিত পরম্পরার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

বইটি লেখার সময় যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে তাহল শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গ্রাহক এবং উদ্ভাবক হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা । এর উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক তত্ত্বের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বৃদ্ধি করা, যাতে তারা এ বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি ও ধারণাকে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, পাশাপাশি এ বিষয়ে যাতে তাদের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয়। সুতরাং, বইটির প্রতিটি অধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপরে কিছু ন্যূনতম বোঝাপড়া ও সংবেদনশীলতা দিয়ে শুরু হয় এবং একই সময় বিষয়টির বিভিন্ন দিক ও এর বিস্তৃতিগুলোকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা হয়।

তোমরা সকলে, বিশেষ করে যারা এই পাঠ্যক্রমটি নিয়ে অধ্যয়ন ও মূল্যায়ণের মুখোমুখি হবে, শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় তাদেরকে জ্ঞানের গ্রাহক ও উদ্ভাবক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আমরা আশা করি রাজনৈতিক তত্ত্ব বিষয়টি অধ্যয়ন করার সময় এই দৃষ্টিভঙ্গিটি পাঠককে আরো বেশি আগ্রহী করে তুলবে। আমাদের প্রত্যাশা, দীর্ঘবছর ধরে রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের দ্বারা উদ্ভূত বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারণা সম্পর্কে তোমরা শুধু জ্ঞান অর্জনই করবে না বরং চলমান পৃথিবীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিষয়গুলোর উপর নিজেদের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করবে । তোমরা লক্ষ করবে যে এই বইটিতে আলোচিত স্বাধীনতা, সাম্য, অধিকার এবং জাতীয়তাবাদের মত ধারণাগুলো

শুধুমাত্র সরকার কিংবা রাজনীতিবিদ্‌দের প্রাত্যহিক জীবনের সাথেই নয় বরং আমাদের সকলের জীবনের সাথেই সম্পর্কিত। আমরা অতিমাত্রায় যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি সেগুলো হল আমাদের স্বাধীনতা এবং অধিকার, গৃহীত নীতিমালার ভালো কিংবা মন্দ দিক, সমতার ভিত্তিতে আশা আকাঙ্খার পূরণ, জাতীয়তাবাদ ও শান্তি বিষয়ে আমাদের সংবেদনশীলতা অথবা এধরনের আরো অনেক বিষয়। তাই এই বইটিতে আমরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব তার প্রত্যেকটি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক জীবন, বিদ্যালয় কিংবা বন্ধু মহলে এমন কি রাজনৈতিক বিতর্ক বা জনস্বার্থে গৃহীত সিদ্ধান্তমালা সবকিছুতেই আমরা উপরোক্ত ধারণাগুলো প্রয়োগ করি।

সুতরাং, অধ্যয়নের বিষয়গুলোর প্রারম্ভিকতা আমাদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। তবে আমরা আশা করি রাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন করার পর বিষয় সম্পর্কে তোমাদের ধারণাগুলো আরো পরিমার্জিত ও প্রসারিত হবে, যেগুলো তোমরা সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টতার সাথে ব্যাখ্যা করতে পারবে। যদি বছর শেষে অর্জিত অভিজ্ঞতার নিরিখে অধ্যয়নকৃত বিষয়গুলোকে তোমরা সমালোচনার দৃষ্টিতে মূল্যায়ণ করতে পার এবং স্বপক্ষের সমর্থনে গ্রহণযোগ্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনা করতে পার, তাহলে মনে করব আমাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছে। বইটির বিভিন্ন পৃষ্ঠার পাশে প্রদত্ত উক্তি, পরামর্শ ইত্যাদি এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সংযুক্ত অনুশীলনীগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যার সাহায্যে তোমরা অর্জিতজ্ঞানকে বর্তমান বিভ্রান্ত পৃথিবীর সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমাদের এসকল প্রচেষ্টার মাঝে অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে, তারপরেও আমরা তোমাদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

যদিও পাঠ্যবইটির পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীরাই আমাদের চিন্তার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তবে শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও আমরা স্বীকার করছি, আমরা আশা করি বইটি শুধুমাত্র শিক্ষকদের সামর্থ্য বিকাশের ক্ষেত্রে সত্যের মূল আধার হিসাবেই ব্যবহৃত হবে না বরং শ্রেণি কক্ষের সৃজনশীল পরিবেশ সৃষ্টিতেও মৌলিক সূত্র হিসাবে কাজ করবে। প্রতিটি অধ্যায়ে সংযুক্ত বিভিন্ন অনুশীলনী ও পাঠক্রম সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ সমূহ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানরত শিক্ষকদের নির্দেশিকা হিসাবেই শুধু ভূমিকা রাখবে না বরং সামগ্রিকভাবে অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পথ নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে।

মূল পাঠক্রম ছাড়াও, বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে অংকিত বাক্সগুলো কোনো রাজনৈতিক দর্শন এবং রাজনীতিবিদ কিংবা তাত্ত্বিকদের অবদান সম্পর্কে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য

সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলো করা হয়েছে তোমাদের আলোচ্য জ্ঞানকে আরো উন্নত এবং গভীরতর করার জন্য, পাশাপাশি কোনো রাজনীতিবিদ কি বলেছেন, কেন বলেছেন এবং কোথায় বলেছেন- এসব বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যেন বাধ্য হয়ে মুখস্ত করতে না হয়। আমরা আশা করি যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ করবেন বইটিতে প্রদত্ত বিভিন্ন মতাদর্শগত ধারণা ও দিকগুলো সম্পর্কে তাদের গভীর অনুধাবন এবং ব্যাখা করার সামর্থ্যের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ে আলোচ্য বিষয়গুলোতে ইতিমধ্যে উপস্থাপিত যুক্তি তর্কগুলোকে মুখস্ত করে তার পুণরাবৃত্তি করার দক্ষতাকে শুধুমাত্র বিবেচনা করা হবে না । এ ধরনের মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের জন্য কিছু জটিলতা সৃষ্টি করলেও এটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

এই সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে আমরা বইটি নিয়ে কি করা উচিত বা কীভাবে করা উচিত সে সম্পর্কে কোনো বিষয়কে নির্দেশ করিনি, বরং বইটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তোমাদের বলার চেষ্টা করেছি। এই বইটি এবং তার পরিকল্পনা ও প্রচ্ছদ সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষিকাদের মতামত আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করব।

বইটি প্রণয়ন ছিল অনেক মানুষের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি, যেখানে কোনো একটি মতাদর্শের প্রকৃত অর্থ এবং কীভাবে তা সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় সে সম্পর্কে ধারাবাহিক পর্যালোচনা ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা একে অপরের মতামতকে মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং যুক্তির দ্বারা পরস্পরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছি। এর চূড়ান্ত ফসল এখন তোমাদের সামনে, তাই এ সম্পর্কে তোমাদের মতামত পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

মুখ্য উপদেষ্টা
সুহাস পালসিকর
যোগেন্দ্র যাদব।

উপদেষ্টাগণ
গুরপ্রিত মহাজন
সারা যোসেফ

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Committee for Textbooks at the Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

Chief Advisors

Suhas Palshikar, *Professor,* Department of Politics and Public Administration, University of Pune, Maharashtra

Yogendra Yadav, *Senior Fellow,* Centre for the Study of Developing Societies, Delhi

Advisors

Gurpreet Mahajan, *Professor,* Centre for Political Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Sarah Joseph, (Retd.) *Reader,* Lady Sri Ram College, New Delhi, 2A, Palacina Apts., 43, M.E.G.Officers Colony, Banaswadi Road, Bangalore

Members

Ashok Acharya, *Professor,* Department of Political Science, Art Faculty Extension, Delhi University, Delhi

Bhagat Oinam, *Associate Professor,* Center of Philosophy, JNU, New Delhi

Lajwanti Chattani, *Associate Professor,* Department of Political Science, MS University Baroda, Vadodara, Gujarat

Mangesh Kulkarni, *Reader,* Department of Politics and Public Administration, University of Pune, Maharashtra

Meenakshi Tandon, *PGT* (Pol. Sc.), Sardar Patel Vidyalaya, New Delhi

Neeraj Priya, *Lecturer,* N 16, Navin Shahadara, Delhi

Peter R. D' Souza, *Professor and Co-Director Lokniti,* Senior Fellow, CSDS, 29, Rajpur Road, Delhi

Rajeev Bhargava, *Professor and Senior Fellow,* CSDS, 29 Rajpur Road, Delhi

Rajesh Dev, *Lecturer ,* Women's College, Laithumkhrah, Shillong, Meghalaya

Rupa Sen, *Principal,* Former PGT (Pol. Sc.) Ajanta Public School, Gurgaon

Satya P. Gautam, *Professor,* Centre for Philosophy, SSS, JNU, New Delhi

Vasanthi Srinivasan, *Associate Professor,* B-20, University of Hyderabad, Gachi Bowli Campus, Hyderabad

Vipul Mudgal, *Editor,* HT-School edition, Hindustan Times House, New Delhi

Member-Coordinator

Sanjay Dubey, *Reader*, DESSH, NCERT, New Delhi

Acknowledgements

We would like to thank all the people who have been associated with this book in different capacities. At the initial stages of planning inputs were provided by a committee which included school teachers, representatives of the NCERT and some State Education Boards in addition to chapter writers. Although it is difficult to mention the names of all the people who helped in the production and preparation of this book, we would like to mention Vasanthi Srinivasan from Hyderabad Central University and Mangesh Kulkarni from Pune University for contributing chapters and willingly offering additional help through editorial and other inputs. We would also like to thank Peter D'Souza, S. Gautam, Rajeev Bhargava, Bhagat Oinam, Ashok Acharya, Nivedita Menon, Lajwanti and Janaki Srinivasan for contributing to the text. Their contributions kick-started this project. Besides them several young teachers and research students provided invaluable help in giving the book its final form. We would in particular like to thank Ankita Pandey, Divya Singh and Navanita Sinha from JNU, Sriranjani from CSDS and Mohinder Singh and Papia SenGupta from Delhi University. We would also like to thank Aarti Sethi and Rafia Zaman in helping the preparation of the box items.

For some of the images used in this book, we would like to thank www.africawithin.com, www.ibiblio.org, www.narmada.org, Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd., and the National Archives and Records Administration, USA .Our special thanks also to P. Sainath, Harikrishna, Deepa Jani and Shweta Rao for allowing us to use their pictures and images. Most of all we would like to thank R.K. Laxman for letting us use Cartoons from his various collections. We are grateful to Mathew John for proof reading and to DTP Operator, Arvind Sharma for assistance in finalising the book.

The design of this book has the stamp of Shweta Rao and if the book has an attractive look that compels you to leaf through it, it is on account of her efforts.

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

---

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় রাজনৈতিক তত্ত্ব : এর ভূমিকা	১—১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাধীনতা	১৭—৩০
তৃতীয় অধ্যায় সাম্য	৩১—৫২
চতুর্থ অধ্যায় সামাজিক ন্যায়	৫৩—৬৬
পঞ্চম অধ্যায় অধিকার	৬৭—৭৮
ষষ্ঠ অধ্যায় নাগরিকতা	৭৯—৯৬
সপ্তম অধ্যায় জাতীয়তাবাদ	৯৭—১১০
অষ্টম অধ্যায় ধর্মনিরপেক্ষতা	১১১—১২৮
নবম অধ্যায় শান্তি	১২৯—১৪২
দশম অধ্যায় উন্নয়ন	১৪৩—১৫৭

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

প্রথম অধ্যায়

রাজনৈতিক তত্ত্ব

ভূমিকা

রাজনৈতিক তত্ত্ব

অন্য সব প্রাণীর চাইতে মানুষ দুটি বিষয়ে অনন্য! প্রথমত তারা যে-কোনো কিছু বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারে এবং দ্বিতীয়ত মানুষ তার নিজ কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে পারে। শুধু তাই নয়, মানুষ ভাষার সাহায্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা অন্যের সঙ্গে আদান-প্রদান করতে পারে। অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায়, মানুষ তার নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং একে অন্যের সাথে কোনো বিষয়ের আদান প্রদান করতে পারে। রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল উৎস নিহিত রয়েছে মানুষের এই দুটি সত্তার উপর। যুগে যুগে মানুষ রাষ্ট্রতত্ত্বের বিভিন্ন ও বহুমুখী প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। মানুষ বুঝতে চেষ্টা করল কীভাবে তারা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হল? কখন, কীভাবে মনুষ্য সমাজ সৃষ্টি হল? কীভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠল? মানুষের জীবনে সরকারের প্রয়োজনীয়তা কী? সর্বোৎকৃষ্ট জনকল্যাণকামী সরকার কোন্‌টি? রাষ্ট্র প্রণীত আইন কি আমাদের স্বাধীনতার পরিপন্থী? রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কাছ থেকে কি দাবি করতে পারে? সমাজে বসবাসকারী নাগরিকদের পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা কী রকম ?

যে-কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বই এই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে এবং সুনির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক জীবনের মূল্যমান নির্ধারণ করে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ন্যায় এই সমস্ত মৌলিক আদর্শগুলি যুগে যুগে রাজনৈতিক তত্ত্বকে আন্দোলিত করেছে। রাজনৈতিক তত্ত্ব এই মৌলিক আদর্শগুলির অর্থ, প্রাসঙ্গিকতা এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। অতীতে এবং বর্তমানে যেসকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই মৌলিক আদর্শগুলির সংজ্ঞা নিরুপণ করার চেষ্টা করেছেন, তার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাও রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রধান কাজ। রাজনৈতিক তত্ত্ব এটাও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করে, কীভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সাম্য ও স্বাধীনতা বাস্তবে রয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন - বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, গাড়ি, হাট-বাজার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে সাম্য ও স্বাধীনতার মত মূল আদর্শগুলি কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আরো এক ধাপ এগিয়ে বলা যায়, রাজনৈতিক তত্ত্ব এটাও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করে যে, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-ন্যায় ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সঠিক এবং পর্যাপ্ত কিনা। রাজনৈতিক তত্ত্ব চলমান সরকারি প্রতিষ্ঠান, আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের রূপরেখা তৈরির চেষ্টা করে। বস্তুত রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্যই হল সমাজস্থ নাগরিকদের এমনভাবে সচেতন করা যাতে তারা যে-কোনো রাজনৈতিক প্রশ্নেরই সন্তোষজনক ও যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর খুঁজে পেতে পারে এবং চলমান রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারে।

এই অধ্যায়ে আমরা পর্যালোচনা করব যে রাজনীতি ও রাজনৈতিক তত্ত্ব কি এবং কেন আমাদের এই অধ্যায়টি পাঠ করা উচিত।

চলো চর্চা করি

রাজনীতি কি?

১.১ রাজনীতি বলতে কী বোঝায়? (What is Politics?)

সকলেই এটা লক্ষ করে থাকবে যে রাজনীতি বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা রয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন তাদের মতে রাজনীতি হল একটি জনসেবামূলক কাজ। আবার কিছু মানুষ

রাজনৈতিক তত্ত্ব

আছে যারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ বা কোনো উচ্চাভিলাষ পূরণ করার জন্য। কেউ কেউ আবার মনে করেন রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডই হল রাজনীতি। অনেক সময় দেখা যায় ক্ষমতার লালসায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মানুষকে নির্বাচনের প্রাক্কালে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন, বড়ো বড়ো দাবি করেন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে প্রতারণা করেন এবং দুর্নীতিতে জড়িয়ে পরেন। যার ফলে রাজনীতি ও দুর্বৃত্তায়ন সমার্থবোধক হয়ে উঠে। সুতরাং মানুষ যখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেকোনো ধরনের অপকৌশল এবং ঘৃণ্যপন্থা অবলম্বন করে, তখনই বলা হয় তারা রাজনীতি করছে। দেখা যায় যখন একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় দলে নিজের স্থান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য স্বজনপোষণের আশ্রয় নেয়, স্কুলের একজন ছাত্র তার পিতার পদমর্যাদার বলে পরবর্তী ক্লাশে উত্তীর্ণ হন, আবার কোনো কার্যালয়ে সরকারি কর্মচারী তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তোষামোদ করে পছন্দমত স্থানে বদলি অথবা পদোন্নতির ব্যবস্থা করে নেয়; তখনি আমরা বলি যে তারা রাজনীতি করছেন। এই নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ও ঘৃণ্য চক্রান্তের জন্যই আমরা রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলি। আমরা এও বলি যে, "আমি রাজনীতিতে উৎসাহিত নই" বা "আমি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চাই"। শুধুমাত্র সাধারণ নাগরিকই নয়, অনেক সময় ব্যবসায়ী, উদ্যোগপতি ও শিল্পপতিরা তাদের নিজেদের এবং দেশের দুর্দশার জন্য রাজনীতিকে দায়ী করে থাকে। আবার এই সকল ব্যক্তিরাই নির্বাচনের সময় চাঁদা দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তহবিল মজবুত করেন। চিত্র তারকারাও সমাজের সমস্যার জন্য রাজনীতিকে দায়ী করেন। আবার সেই চিত্র তারকারা যখন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে তখন তারাই আবার ঘৃণ্য রাজনীতির অংশীদার হয়ে যায়।

R. K. Laxman in the Times of India

এখুনি আমাকে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে হবে। তোমার কার্যকলাপ তার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সে ভাবছে তোমার মতই মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে পার পেয়ে যাবে।

আমাদের তাই রাজনীতির দুমুখী চরিত্রের মুখোমুখি হতে হয়। রাজনীতি কি আসলে মানব সমাজের একটি অনাকাঙ্খিত কার্যকলাপ যার থেকে আমাদের দূরে থাকা কিংবা পরিত্রাণ পাওয়া উচিত? অথবা ইহা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যাতে যুক্ত হয়ে আমরা একটি উন্নত বিশ্ব নির্মাণ করতে পারি?

দুভার্গ্যবশত, রাজনীতিকে যে-কোনো উপায়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে তোলার একটা মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃত বিশ্লেষণে দেখা যায় রাজনীতি প্রতিটি মানুষ এবং সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অঙ্গ। মহাত্মা গান্ধি একদা বলেছিলেন যে, সাপের কুন্ডলির মতো রাজনীতিও আমাদের আবদ্ধ করে রাখে যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। এরূপ কোন সমাজ ব্যবস্থা নেই যেখানে কোনো না কোনো প্রকারের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নেই বা যেখানে কোন সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। সমাজের গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য সমাজস্থ মানুষের বহুমুখী চাহিদা ও উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, উপজাতি গোষ্ঠী, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটেছে সমাজস্থ মানুষের

রাজনৈতিক তত্ত্ব

বহুমুখী চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য । এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিই আমাদের শিক্ষা দেয় কীভাবে পারস্পরিক স্বীকৃতি ও বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে সমাজে বেঁচে থাকতে হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো দেশে সরকার কীভাবে গঠিত হয়, কীভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে ইত্যাদি হল রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

সংবাদপত্র পাঠ করো, এর মুখ্য সংবাদগুলি কী কী? তোমার ক্ষেত্রে কি এগুলি প্রাসঙ্গিক?

কিন্তু তা বলে, রাজনীতির পরিধিকে কোনোভাবেই সরকারের কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। বস্তুতপক্ষে সরকার আমাদের জন্য যা যা কাজ করে তা ব্যক্তি ও সমাজজীবনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। আমরা এটা লক্ষ করে থাকি যে, সরকার আমাদের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করছে, শিক্ষানীতি ঠিক করে দিচ্ছে এবং প্রয়োজনে একটি দেশের বিদেশ নীতি নির্ধারণ করছে। সরকারের এসকল নীতি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে একটা অনভিজ্ঞ, অকর্মণ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত মানুষের জীবনে নানাবিধ দুর্ভোগ নিয়ে আসে। যদি ক্ষমতাসীন সরকার কোনো ধরনের হিংসা, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সাহায্য দিয়ে থাকে তাহলে মানুষ নিশ্চিন্তে হাটে বাজারে বেরোতে ও ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না সমাজের সর্বত্র এক অরাজক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যেখানে কারোরই জীবন-সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকে না। এরূপ অস্থির পরিস্থিতিতে সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব হয় না। মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। স্কুলে ঠিকমতো পড়াশোনা হয় না সঠিক সময়ে পাঠক্রম সম্পূর্ণ হয় না, বা যথা সময়ে পরীক্ষা নেওয়া ও ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্য হয় শিক্ষক মহাশয়ের বাড়িতে গিয়ে অর্থের বিনিময়ে কোচিং নিতে। একটি জনকল্যাণকামী সরকার শিক্ষা ও সাক্ষরতার মানোন্নয়নের জন্য নীতি প্রণয়ন করে, তখনি আমরা ভালো স্কুলে পড়া ও প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়ে থাকি।

যেহেতু সরকারের সকল সিদ্ধান্তই নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত করে, সেহেতু আমরা সরকারি সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপে আগ্রহী হয়ে উঠি। আমরা সংঘ, সমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের দাবি দাওয়া সমূহ সংশোধিতভাবে সরকারের নিকট উপস্থাপন করি। আমরা একে অপরের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকারের জন্য কিছু লক্ষ্য স্থির করে দিতে পারি। আমরা যদি সরকারি সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে না পারি তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারকে চলমান সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারি। আমরা আগ্রহের সাথে আইন প্রণয়নকারী সদস্যদের কর্মকাণ্ডের উপরে বিতর্ক করতে পারি এবং দেখার চেষ্টা করি সমাজে দুর্নীতি বেড়েছে না কমেছে। আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে সমাজ থেকে দুর্নীতির মূল উৎপাটন করা যায় কিনা এবং নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর জন্য প্রদত্ত সংরক্ষণ বৈধ বা অবৈধ কিনা। আমরা অনুভব করার চেষ্টা করতে পারি কেন কিছু রাজনৈতিক দল এবং নেতা নির্বাচনে জয়ী হন। এভাবে প্রচলিত রাজনৈতিক

চলো চর্চা করি

রাজনীতি কীভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে প্রভাবিত করে? তোমার জীবনের যে-কোনো একটি দিনের ঘটনা বিশ্লেষণ কর।

সংঘর্ষ ও পতনের কারণগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি উন্নত পৃথিবী গড়ার প্রত্যাশ্যা করতে পারি।

পরিশেষে বলা যায় আমাদের এবং সমাজের বিভিন্ন প্রকারের বৈধ এবং কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণের মধ্য থেকেই রাজনীতির সূত্রপাত হয়। রাজনীতির মাধ্যমে সমাজে বহুমাত্রিক আলোচনা ও পর্যালোচনা ক্রমাগত চলতে থাকে, যার মাধ্যমে সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা হয়। একদিকে রাজনীতি হল মানুষের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এবং এর সাথে যুক্ত সরকারের কর্মতৎপরতা; অন্যদিকে এটি হল সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ব্যবস্থায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম ও অংশগ্রহণ। জনগণ তখনই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় যখন তারা বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে এবং সামাজিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে।

চলো বিতর্ক করি

ছাত্রদের কি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত?

১.২ রাজনৈতিক তত্ত্ব বিষয়টিতে আমরা কী পাঠ করি?
(WHAT DO WE STUDY IN POLITICAL THEORY?)

সমাজে প্রবাহমান ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় চারিপাশে ঘটে চলেছে বিভিন্ন আন্দোলন, উন্নয়ন এবং পরিবর্তন। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে আমরা এমন কিছু মূল্যবোধ ও আদর্শসমূহকে প্রত্যক্ষ করি যা জনগণ এবং তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নীতিমালাগুলোকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। এ ধরনের কিছু আদর্শের উদাহরণ হল গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এ আদর্শগুলোকে দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছে।

এই সমস্ত নীতি আদর্শগুলি হঠাৎ করে গড়ে ওঠেনি; এগুলো গড়ে উঠেছে সুদীর্ঘ কাল ধরে বিভিন্ন রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের ধ্যান ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে। সুদূর অতীতকাল থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র দার্শনিক যেমন- কৌটিল্য, অ্যারিস্টটল, জাঁ জ্যাক রুশো, কার্ল মার্কস, মহাত্মা গান্ধি এবং আম্বেদকরের মতো চিন্তাবিদদের দ্বারা এসকল নীতি আদর্শগুলো আলোচিত হয়েছে। এমনকি খ্রিস্টের জন্মের আরো পাঁচ শতাব্দী পূর্ব থেকে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মতো রাষ্ট্র দার্শনিকেরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করতেন যে, রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা। আধুনিককালে ফরাসি দার্শনিক রুশো সর্বপ্রথম ব্যক্তি স্বাধীনতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হিসেবে মানব সমাজের নিকট উপস্থাপন করেছিলেন। কার্ল মার্কস যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে স্বাধীনতার মতো সাম্য ও মানব জাতির জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধি তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে স্বাধীনতা এবং স্বরাজ এর প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। আম্বেদকর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন তপশিলি জাতি শ্রেণির মানুষকে সংখ্যালঘুর মর্যাদা দিয়ে তাদের জন্য বিশেষ

এই অধ্যায়ে উল্লেখিত যে কোন একজন রাষ্ট্র চিন্তাবিদের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ (৫০ শব্দের মধ্যে)

সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। আম্বেদকরের এই ধারণাকে ভারতীয় সংবিধানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যার জন্য দেখা যায়, সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে সমস্ত ধরনের অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত নীতি ও আদর্শগুলোকে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ নির্দেশমূলক নীতি অংশে স্থান দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক তত্ত্ব হল সমাজ বিজ্ঞানের সেই শাখা যা, সুনির্দিষ্টভাবে কোনো দেশের সংবিধান, সরকার এবং মানুষের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন নীতি ও আদর্শগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে। রাজনৈতিক তত্ত্ব, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের মতো বিষয়গুলির অর্থ এবং ধারণা বিশ্লেষণ করে থাকে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক তত্ত্ব রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতি যেমন-আইনের শাসন, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা করে। এটা করা হয়ে থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দ্বারা উত্থাপিত বিভিন্ন যুক্তির মূল্যায়নের দ্বারা। যদিও দার্শনিক রুশো, কার্ল মার্কস বা গান্ধিজি কেউই রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। কিন্তু তাদের চিন্তাধারা পরবর্তী যুগের রাজনীতিবিদ্‌দের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সমসাময়িক কালে আরো অনেক চিন্তাবিদ্ এই সকল বিষয়ে নিজেদের চিন্তাধারা উপস্থাপন করেছেন যা রাষ্ট্র চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবশালী করেছে। তারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মতো ধারণাগুলিতে নতুনভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। এই সমস্ত রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি বিভিন্ন ধারণার মূল্যায়ন করার চেষ্টা যেমন করেছেন, তেমনি বর্তমান রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা সমসাময়িক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ রাজনীতির প্রবণতা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক্ নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

নীচে দেওয়া বক্তব্যগুলির সমর্থনে তুমি কি কোনো রাজনৈতিক নীতি বা আদর্শ খুঁজে বের করতে পার?

ক) বিদ্যালয়ে কোন্ বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করব যে বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকা উচিত।

খ) অস্পৃশ্যতার অনুশীলন সমাজে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গ) সমস্ত ভারতীয় নাগরিক আইনের চোখে সমান।

ঘ) সংখ্যালঘুদের নিজস্ব বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় থাকতে পারে।

ঙ) ভারতের নির্বাচনে ভ্রমণের জন্য আসা বিদেশিরা ভোট দিতে পারে না।

চ) চলচ্চিত্র এবং সংবাদমাধ্যমের উপর কোনো ধরনের সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়।

ছ) বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

জ) প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

রাজনৈতিক তত্ত্ব

কিন্তু এই সকল বিষয়গুলো কি সমাজের জন্য এখনো প্রাসঙ্গিক? সাধারণ মানুষ কি এখনো গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মতো আদর্শগুলো অর্জন করতে পারেনি? যদিও ভারত এখন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র তবু স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর মতো বিষয়গুলি সকল মানুষের নিকট সমানভাবে পৌঁছায়নি। কারণ স্বাধীনতা, সাম্য এবং গণতন্ত্রের মতো বিষয়গুলির ব্যাপকতা অনেক বেশি। এই সকল বিষয়গুলি সামাজিক জীবনে বিভিন্নভাবে প্রসারিত। এসমস্ত আদর্শগুলোকে সমাজের স্তর এবং ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সাম্য উপস্থিত থাকলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা উপেক্ষিত। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক সমান অধিকারের নীতি অনুসরণ করা হলেও জাতিগত বৈষম্য বা দারিদ্রতার কারণে অনেকেই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। কিছু মানুষ অর্থ ও ক্ষমতার বলে সমাজে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করলেও একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখনো জীবনে ন্যূনতম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হলেও অন্য একটি অংশ শিক্ষা লাভের সাধারণ সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। যার কারণে সে ভবিষ্যৎ কর্ম সংস্থানের সুযোগ পায় না। সমাজের এই বৃহত্তর অংশের মানুষের কাছে স্বাধীনতা একটা দিবাস্বপ্ন মাত্র।

দ্বিতীয়ত ,যদিও ভারতের সংবিধানে সকলের জন্য স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। তবুও মানুষ স্বাধীনতার বিষয়ে নিত্য নতুন ব্যাখ্যার সম্মুখীন হয়। এটা একটি নির্দিষ্ট খেলাধূলা যেমন, ক্রিকেট বা দাবার মতো যেখানে আমরা জানি কীভাবে একটি নিয়মের ব্যাখ্যা করতে হয়। আমরা লক্ষ করি যে, এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন নিয়মের নিত্য নতুন ব্যাখ্যা এবং অর্থ উপস্থাপন করা হয়। অনুরূপভাবে, আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলোকেও বিভিন্ন সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভারতের সংবিধানে বর্ণিত জীবনের অধিকার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাননীয় আদালত তার মধ্যে জীবনের অধিকারের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বর্তমানে আদালতের মতে, যে-কোনো তথ্য জানার বা পাওয়ার অধিকারও মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। নিত্যনতুন সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য আদালতের দেওয়া ব্যাখ্যা অনুসারে ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। যা উদ্ভূত নিত্যনতুন সমস্যাগুলো মোকাবেলায় সহায়ক হয়েছে।

তৃতীয়ত বহি:বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা শব্দের বিভিন্ন দিক ও তার প্রতি নতুন হুমকিসমূহ আবিষ্কৃত ও আলোচিত হচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি ও যোগাযোগের ব্যবস্থা হল আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বব্যাপী এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সমাজকর্মীরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একে অপরের সাথে সহজ যোগাযোগের মাধ্যমে আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও বনের অধিকার সংরক্ষণের কাজ করে আসছে। আবার অন্যদিকে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে ইন্টারনেট বাণিজ্য সম্প্রসারণের ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যা আরো প্রসারিত হবে। সুতরাং নেট দুনিয়ার যে-কোনো কেনা-বেচা, বা অর্থ আদান-প্রদানের

চলো চর্চা করি

বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে ব্যাঙ্গ চিত্র সংগ্রহ কর। এই সকল ব্যঙ্গ চিত্রগুলি কোন্ বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত? কোন্ কোন্ রাজনৈতিক মতাদর্শ এইগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে?

প্রাচীন গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে সক্রেটিসকে মনে করা হত সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক। সমাজ, রাজনীতি এবং ধর্মীয় বিষয়ে জনপ্রিয় ও প্রচলিত বিশ্বাসসমূহের প্রতি তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন। যার কারণে এথেন্সের শাসকরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর শিষ্য প্লেটো তাঁর জীবন ও আদর্শের উপর বই লেখেন। যার নাম 'দ্যা রিপাবলিক' বা প্রজাতন্ত্র। তিনি এই বইতে সক্রেটিসের চরিত্র নির্মাণ করেন এবং ন্যায় বলতে কী বোঝায় তাঁর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন।

এই বইটির দুটি চরিত্র সক্রেটিস এবং সেফিলাস এর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এই কথোপকথনের মাধ্যমে সেফিলাস ও তার বন্ধুরা বুঝতে পারেন যে ন্যায় সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অপর্যাপ্ত এবং অগ্রহণযোগ্য।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, সমাজ সম্পর্কে যে প্রচলিত বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে সক্রেটিস সেগুলোকে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে খণ্ডন করে বলেন যে, এগুলি অযৌক্তিক, সীমাবদ্ধ এবং স্ববিরোধী। সমাজ সম্পর্কে এই স্ববিরোধী ধারণাগুলি নিয়ে কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে সমাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

প্রক্রিয়া সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ইন্টারনেট দুনিয়ার নাগরিকরা অতি মাত্রায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ পছন্দ করে না। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও স্বাধীকার বজায় রাখার জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনো প্রকার যোগাযোগ সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, ইন্টারনেট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের কী পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত? যেমন, নাগরিকদের কি এই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত যাতে তারা অযাচিত কোনো ই-মেইল একজন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট পাঠাতে পারে?

কোনো ব্যক্তি কি তার উৎপাদিত জিনিস বিক্রি করার জন্য বা বিজ্ঞাপিত করার জন্য কারো ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে ? সরকার কি সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে কোনো ব্যক্তিগত ই-মেইল অনুসন্ধান করতে পারে? এসকল বিষয়গুলো ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে অত্যন্ত জটিল বিষয়। এইক্ষেত্রে সরকারি বা বেসরকারি নিয়ন্ত্রণ কতটা যুক্তিযুক্ত? সুতরাং রাজনৈতিক তত্ত্বের কাজ হল এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করা, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক।

১.৩ রাজনৈতিক তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ : (Putting Political Theory to Practice)

এই পাঠ্য বইতে রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র কিছু রাজনৈতিক ধারনার উৎস, অর্থ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছি। সেই রাজনৈতিক ধারণাগুলো হল - স্বাধীনতা, সাম্য, নাগরিকত্ব, ন্যায়, উন্নয়ন, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি। কোনো বিষয় সম্পর্কে বিতর্ক

রাজনৈতিক তত্ত্ব

ভালো করে পড়ো এবং বোঝার চেষ্টা করো কীভাবে সক্রেটিস এগুলো অর্জন করেছিলেন?

" সেফিলাস ভালো বলেছ, আমি উত্তর দিলাম; কিন্তু ন্যায় সম্পর্কিত বিষয় বলতে কী বোঝ?

সত্য কথা বলা এবং যার যা প্রাপ্য তা ফিরিয়ে দেওয়ার নামই ন্যায়। তার থেকে বেশি কিছু নয় কি?

তবে এক্ষেত্রেও কিছু ব্যতিক্রম কি লক্ষ করা যায় না? যেমন একজন বন্ধু সুস্থ মস্তিষ্কে তার অস্ত্রখানি আমার কাছে রাখলেন এবং অসুস্থ মস্তিষ্কে অস্ত্রটি ফিরে চাইলেন। এই অবস্থায় তার প্রাপ্য কি আমার ফিরিয়ে দেওয়া উচিত?

তিনি বললেন তুমি সত্যি কথা বলছ।

কিন্তু দেখ, সত্য কথা বলা এবং যার যেটা প্রাপ্য সেটা ফিরিয়ে দেওয়া ন্যায়ের সঠিক সংজ্ঞা নয়।

পরিবর্তে দেখা যায় সাধারণভাবে আমরা যা করে থাকি তাহল আমাদের বন্ধুর উপকারের জন্য ভালো কাজ করা এবং যতটুকু সম্ভব শত্রুর ক্ষতি করা। অথবা আমরা আরো বলতে পারি যে, যতটুকু সম্ভব আমাদের বন্ধুর জন্য তখন ভালো কাজ করা, যখন বন্ধু ভালো অবস্থায় থাকে এবং শত্রু যদি খারাপ কাজ করে তার ক্ষতি করা। তাহলেই সত্যিকারের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সক্রেটিস বলেন, হ্যাঁ, আমার এটাই সত্য বলে মনে হয়।

করতে গিয়ে আমরা যে প্রশ্নগুলো দিয়ে শুরু করি সেগুলো হল, "এর অর্থ কী?" এবং "এর প্রভাব কতটুকু"? রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা স্বাধীনতা ও সাম্য কী এ নিয়ে প্রশ্ন করেন এবং তার নানাবিধ সংজ্ঞাও প্রদান করেন। অংকশাস্ত্রে একটি ত্রিভুজ কিংবা চতুর্ভুজের একটি করেই সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা থাকে। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানে স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে একই সাথে অনেকগুলো সংজ্ঞা থাকতে পারে।

এটা এমন হওয়ার কারণ হল, যেমন সাম্য শব্দটি মানুষ এবং বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয় করেনা বরং মানুষে মানুষে সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। বস্তুর নিজের কোনো মতামত থাকে না। কিন্তু কোনো বিষয়ের উপর মানুষের নিজস্ব মতামত থাকে, সেক্ষেত্রে সকল মতামতকেই ভালো করে বুঝতে হয় এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। একাজটা আমরা কীভাবে করি? চলো, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সাম্য শব্দটি কীভাবে বিশ্লেষিত হয় তার উপর আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেটা ব্যাখ্যা করি।

তোমারা লক্ষ করে থাকবে যে-কোনো দোকান কিংবা চিকিৎসকের কক্ষে অথবা সরকারি দপ্তরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষমান মানুষেরা একে অপরকে পেছনে ফেলে যাওয়ার চেষ্টা করে, এর মধ্যে কিছু মানুষ ঐ সকল লোকদের পুনরায় পেছনে সরে যেতে বাধ্য করে, যা দেখতে আমাদের খুব ভালো লাগে। আবার কেউ যখন অপেক্ষমান জায়গা থেকে অন্যায়ভাবে অন্যকে পেছনে ফেলে যাওয়ার চেষ্টা করে তখন নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে হয়। এটা ভেবে তখন আমাদের রাগও হয় কারণ পণ্য ও পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের সমান সুযোগ থাকা উচিত। কেননা এর জন্য আমরা সমান মূল্য পরিশোধ করি। সুতরাং অভিজ্ঞতা আমাদের বলে যে, সাম্য হল সকলের জন্য সমান সুবিধা।

কিন্তু, কোনো একজনকে আঘাত করা কতটা ন্যায় সংগত?
নিঃসন্দেহে তাকেই আঘাত করা হয় যে সমাজের চোখে শত্রু এবং দুষ্ট লোক।
ঘোড়া আঘাতপ্রাপ্ত হলে এটা কি উন্নতি না অবনতি?
পরবর্তীটি।
যদি বলি অবনতি তাহলে সেটা ঘোড়ার গুণের অবনতি, কুকুরের নয়?
হ্যাঁ, ঘোড়ার গুণের অবনতি হয়।
যদি কুকুরের অবনতি হয় তাহলে সেটা কুকুরের গুণের অবনতি, ঘোড়ার নয়?
হ্যাঁ, অবশ্যই।
সুতরাং যখন কোনো মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন তার মধ্যে মনুষ্যত্বের অবনতি হয়?
হ্যাঁ, অবশ্যই।
এবং, সে মনুষ্যত্বই হল ন্যায়?
নিশ্চিতভাবে।

একই সাথে বয়স্ক ও দিব্যাঙ্গাদের জন্য পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে যদি বিশেষ কোনো সুবিধা থাকে তখন এটাকে আমরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।

কিন্তু প্রতিদিন আমরা এটাও লক্ষ করি যে অনেক দরিদ্র মানুষ অভাবের কারণে পণ্য ও পরিষেবার মূল্য প্রদানে অসমর্থ যার কারণে তারা পণ্য ক্রয়ের জন্য দোকানে কিংবা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের কাছে যেতে পারে না। এদের মধ্যে অনেকে হয়তো দিনমজুর যারা দীর্ঘ সময় ধরে পাথর ভাঙার কাজ করে কিংবা দূরদূরান্তে ইট, পাথর ইত্যাদি বহন করে। সংবেদনশীল হলে আমরা বুঝতে পারব কিছু মানুষ নিজেদের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাতে পারে না, যা সমাজের পক্ষে একেবারেই বেমানান। আমরা এটা অনুধাবন করতে পারি যে, সাম্য এমন একটি সুষম ব্যবস্থা যার মধ্যে কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে শোষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত হয় না।

বিষয়টি আমরা এভাবেও ভাবতে পারি যে, সমাজের বেশিরভাগ শিশুরা এজন্য বিদ্যালয়মুখী হতে পারেনা কারণ, তাদের কাজ করে খেতে হয় এবং দরিদ্র পরিবারের অনেক মেয়েরা বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, কেননা তাদেরকে পরিবারের ছোটো ছোটো শিশুদের যত্ন করতে হয়। যখন তাদের পিতামাতারা কাজের জন্য বাইরে যেতে বাধ্য হন। যদিও ভারতের সংবিধান সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এই অধিকার অনেকের জন্য আনুষ্ঠানিক হিসাবে রয়ে গেছে। যার ফলে এসকল দরিদ্র পিতা-মাতা এবং তাদের সন্তানদের জন্য এমন কিছু করা উচিত যাতে এসকল শিশুরা বিদ্যালয়মুখী হতে পারে।

রাজনৈতিক তত্ত্ব

যখন মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন সে অন্যায়কারীতে পরিণত হয়?
তার পরিণাম এটাই হয়।

কোনো সংগীতকার কি নিজের কলাকৌশলের মাধ্যমে অন্য মানুষকে সংগীত থেকে দূরে রাখতে পারে?
মোটেই নয়?

অথবা কোনো ঘোড়সওয়ার নিজ কৌশলে তাদেরকে খারাপ ঘোড়সওয়ারে পরিণত করতে পারে?
অসম্ভব।

এবং কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ন্যায়ের মাধ্যমে অন্যকে অন্যায়কারী বানাতে পারে? অথবা সাধারণভাবে কোন সৎ ব্যক্তি সৎ কাজের মাধ্যমে অন্যকে অসৎ বানাতে পারে?
নিশ্চিতরূপে না।

তেমনি কোনো সৎ ব্যক্তি কাউকে আঘাত করতে পারে না?
অবশ্যই না।

ন্যায়পরায়ণ মানুষই ভালো মানুষ?
অবশ্যই

সুতরাং, তোমরা দেখবে যে সাম্যের ধারনাটি অত্যন্ত জটিল, যখন আমরা কোনো পরিষেবা পাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াই তখন সকলের জন্য সমান সুযোগ প্রত্যাশা করি। যদি আমরা শারীরিক কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধকতার দ্বারা আক্রান্ত হই তখন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশা করি। যখন আমরা মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ হই তখন সমান সুযোগের ব্যবস্থাও যথেষ্ট হয় না। আমাদের অবশ্যই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে এবং সম্পদ ও সুযোগের সুষম বণ্টন ব্যবস্থতা (যেমন কর্মসংস্থান, উপযুক্ত মজুরি, চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধা) ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এই ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই কিছু প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থাকে দায়িত্ব দিতে হবে।

সুতরাং সাম্যের বহুমুখী সংজ্ঞার কারণ হল এর প্রকৃত অর্থ কী তা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে। শুরুতেই আমাদের ক্ষেত্রে সাম্যের অর্থ কী, তা ব্যাখ্যা করেছি। পরে অন্যদের (দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত, বয়স্ক নাগরিক ইত্যাদির) ক্ষেত্রে সাম্যের অর্থ কী তাও বলার চেষ্টা করেছি। এখানে আমরা সাম্যের অর্থের অনেকগুলি দিক উন্মোচন করেছি। আসলে প্রকৃত উপলব্ধি ছাড়াই আমরা রাজনৈতিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।

রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা রাজনৈতিক ধারণা সমূহকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যা মানুষের স্বাভাবিক ভাষায় ব্যবহৃত ও বোধগম্য হয়। তারা রাজনৈতিক ধারণাসমূহের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বিতর্ক ও অনুসন্ধান করেন। কখন সমান সুযোগের ব্যবস্থা যথেষ্ট হয়? কখন

বন্ধু কিংবা অন্য কাউকে আঘাত করা কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাজ নয়। বরং তার বিপরীত, যেখানে আঘাতকারী একজন অসৎ ব্যক্তি?

আমার মতে তুমি যা বলছ তাই আসল সত্য, সক্রেটিস।

এবং যে ব্যক্তি কোনো ব্যাধিকে আটকাতে কিংবা তার থেকে দূরে থাকতে সক্ষম সে ব্যক্তি ওই রোগ সৃষ্টি করতেও তার চেয়ে বেশি সক্ষম?

সত্যি কথা।

যে ব্যক্তি শত্রুকে পরাজিত করতে পারে সে ব্যক্তিই দুর্গের ভালো রক্ষক?

অবশ্যই।

যে ব্যক্তি একজন ভালো রক্ষক সে ব্যক্তি একজন দক্ষ তস্করও বটে?

আমার মনে হয় এটাই সার কথা।

যে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সম্পদের সুরক্ষা দিতে পারে, সে তার তস্করীও করতে পারে?

এই যুক্তিতে এটাই প্রমাণিত হয়।

মানুষের বিশেষ সুবিধার প্রয়োজন হয়? বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য দরিদ্র শিশুদের মধ্যাহ্ন আহারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা এপ্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন। তুমি দেখবে এ বিষয়গুলি অত্যন্ত বাস্তব। এর উপর ভিত্তি করেই শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা প্রণীত হয়।

সাম্য এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ধারনার ক্ষেত্রেও এদের সাথে সম্পর্কিত দৈনন্দিন মতামত সমূহ, সম্ভাব্য অর্থ ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা আলোচনা এবং বিকল্পনীতি প্রস্তাব করেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা স্বাধীনতা, নাগরিকতা, অধিকার, উন্নয়ন, ন্যায়, সাম্য, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করব।

১.৪ কেন আমরা রাজনৈতিক তত্ত্ব পাঠ করব?

WHY SHOULD WE STUDY POLITICAL THEORY?

আমাদের রাজনৈতিক ধারণা আছে, তা সত্ত্বেও কি রাজনৈতিক তত্ত্ব পাঠ করা প্রয়োজন? যারা বাস্তবে রাজনীতি করেন এটা কী তাদের জন্য অধিক প্রয়োজন নয়? অথবা ওই সকল আমলাদের জন্য যারা নীতি প্রণয়নে যুক্ত থাকেন? অথবা ঐ সকল লোকদের জন্য যারা রাজনৈতিক তত্ত্বের পাঠ পড়ান, অথবা ওই সকল আইনজীবী বা বিচারক যারা আইন ও সংবিধানকে ব্যাখ্যা করে? অথবা ওই সকল সমাজকর্মী ও সাংবাদিক যারা সমাজে প্রচলিত অন্যায়গুলিকে উন্মোচন করেন এবং নতুন অধিকারের দাবি করেন?

আসল কথা হল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তস্করে পরিণত হওয়ার পর তুমি যুক্তি দেবে যে সকল ভালো মানুষরা আমাদের বন্ধু এবং মন্দলোকেরা আমাদের শত্রু?
হ্যাঁ।

প্রথমে আমরা সোজা কথায় বলেছিলাম যে ন্যায় হল বন্ধুর সাথে ভালো আচরণ এবং শত্রুর সাথে খারাপ আচরণ। আমাদের আরো বলা উচিত বন্ধুর সাথে আমরা ভালো আচরণ করব যখন সে ভালো থাকে এবং শত্রুর সাথে মন্দ আচরণ করব যখন সে খারাপ থাকে।
হ্যাঁ, আমার কাছে এটাই সঠিক বলে মনে হচ্ছে।

তবে যে কোনো কাউকে আঘাত করাকে কি কখনো ন্যায়পরায়ণতা বলা যায়?

নিঃসন্দেহে যারা শত্রু এবং মন্দ প্রকৃতির তাদের আঘাত করা যায়।

ঘোড়া আঘাতপ্রাপ্ত হলে এটা কি উন্নতি না অবনতি?
পরবর্তীটি।

যদি বলি অবনতি তাহলে সেটা ঘোড়ার গুণের অবনতি কুকুরের নয়?
হ্যাঁ, ঘোড়ার গুণের অবনতি।

যদি কুকুরের অবনতি হয় তাহলে সেটা কুকুরের গুণের অবনতি ঘোড়ার নয়?
হ্যাঁ, অবশ্যই।

আমরা (উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা) স্বাধীনতা অথবা সাম্যের অর্থ জেনে কী অর্জন করব?

প্রথমত: উপরে উল্লেখিত সকল স্তরের মানুষের জন্যই রাজনৈতিক তত্ত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী হিসাবে উপরে উল্লেখিত যে-কোনো স্তরকেই আমরা ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে পারি। সুতরাং অপ্রত্যক্ষভাবে এখন থেকেই রাজনৈতিক তত্ত্ব আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। ভবিষ্যতে আমরা সকলে হয়তো অঙ্কশাস্ত্রবিদ কিংবা প্রকৌশলী হব না, তাই বলে কি এখন অঙ্ক শিখব না? আমাদের জীবনে সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য মৌলিক হিসাব নিকাশ জানা কি আবশ্যক নয়?

দ্বিতীয়ত: আমরা সবাই কিছুদিন পরে নাগরিক হিসেবে ভোট দান করব এবং অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান আমাদের উপকারে আসবে। বর্তমান তথ্য নির্ভর সমাজে আমরা শিখব কিভাবে দায়িত্ববান হতে হয় এবং কীভাবে গ্রামসভায় অংশগ্রহণ করব। অথবা ওয়েবসাইটে এবং নির্বাচনের সময় কীভাবে মতামত ব্যক্ত করব? সে সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। যদি আমরা অগ্রাধিকার বাছাই এর ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হই তাহলে এটা ফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু আমরা যদি সঠিক চিন্তাশীল ও পরিপক্ক হই তাহলে নতুন প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় নিজেদের সর্বজনীন স্বার্থ সমূহ নিয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে পারি।

সুতরাং যখন কোনো মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন তার মধ্যে মনুষ্যত্বের অবনতি ঘটে?
হ্যাঁ, অবশ্যই।
এবং সে মনুষ্যত্বই হল ন্যায়?
নিশ্চিতভাবে।
যখন মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন সে অন্যায়কারীতে পরিণত হয়?
তার পরিণাম এটাই হয়।
কোনো সংগীতকার কি নিজের কলাকৌশলের মাধ্যমে অন্য মানুষকে সংগীত থেকে দূরে রাখতে পারে?
মোটেই নয়।
অথবা কোনো ঘোড়সওয়ার নিজ কৌশলে তাদেরকে খারাপ ঘোড়সওয়ারতে পরিণত করতে পারে?
অসম্ভব।
এবং কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ন্যায়ের মাধ্যমে অন্যকে অন্যায়কারী বানাতে পারে? অথবা সাধারণভাবে কোন সৎ ব্যক্তি সৎকাজের মাধ্যমে অন্যকে অসৎ বানাতে পারে?
নিশ্চিতরূপে না।

নাগরিক হিসেবে আমরা কোনো এক সংগীতানুষ্ঠানের শ্রোতার মতো। আমরা এখানে গায়কের ভূমিকা পালন করি না কিংবা সংগীতের সুর, তালের বিশ্লেষণও করি না, আমরা শুধু গানের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করি এবং তার ফলশ্রুতিতে প্রশংসা করে নতুন গানের জন্য আবেদন করি। তোমরা কি লক্ষ কর সংগীতকাররা তখনি ভালো গায় যখন তারা বুঝতে পারে শ্রোতাদের সংগীত সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে এবং তারা এর সঠিক প্রশংসা করতে জানে? অনুরূপভাবে জ্ঞানী এবং সচেতন নাগরিকরাই রাজনীতিবিদদের আরো বেশি জনদরদি হতে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত: স্বাধীনতা, সাম্য এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মতো বিষয়গুলো আমাদের জীবনে কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়। প্রতিদিনই আমরা কেনাকাটার বাজার (Shopping malls), মহাবিদ্যালয়, পরিবার ইত্যাদিতে বিভিন্ন রকমের বৈষম্য লক্ষ করি। ভিন্ন প্রকৃতির মানুষদের প্রতি আমাদের এক ধরনের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, যদি তারা ভিন্ন জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ কিংবা শ্রেণিভুক্ত হয়, আমাদের এই ধারনা আরো প্রবল হয়। কখনো বৈষম্যের শিকার হলে আমরা তার তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান চাই। তা যদি দেরিতে হয় তখন আমরা সহিংস আন্দোলনকেও ন্যায় বলে মনে করি। আবার বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হলে আমরা অন্যের প্রতি বৈষম্য হওয়াকে অবহেলা করি। যেমন আমাদের ঘরেই অবস্থানকারী পরিচারিকা কিংবা চাকর-বাকররা যখন তাদের মর্যাদার জন্য লড়াই করে তা আমরা অস্বীকার করি। কখনো কখনো আমরা এটাও অনুভব করি। চাকর-বাকরদের প্রতি আমরা যে আচরণ করি তার চেয়ে বেশি কিছু

তেমনি কোনো সৎ ব্যক্তি কাউকে আঘাত করতে পারে না?
অবশ্যই না।
ন্যায়পরায়ণ মানুষই ভালো মানুষ?
অবশ্যই।
বন্ধু কিংবা অন্য কাউকে আঘাত করা কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাজ নয়। বরং তার বিপরীত, যেখানে আঘাতকারী একজন অসৎ ব্যক্তি?
আমার মতে তুমি যা বলছ তাই আসল সত্য, সক্রেটিস
তখন যদি কোন ব্যক্তি বলে যে ঋণ পরিশোধই হল ন্যায় এবং ভালো ঋণ হল যা বন্ধুকে পরিশোধ করা হয় এবং মন্দ ঋণ হল যা শত্রুকে পরিশোধ করা হয় — এরকম বলাটা ঠিক নয়, কারণ এটা সত্য নয়। যেমন এটা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে অন্যকে আঘাত করা কখনোই ন্যায়ের কাজ হতে পারে না।
আমি তোমার সাথে একমত, পলিমার্কোস বললেন।

পাওয়ার যোগ্য তারা নয়। রাজনৈতিক তত্ত্ব আসলে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের ধারনা ও অনুভূতিগুলোকে পর্যালোচনা করতে উৎসাহ দেয়। এবং এই বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হলে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতিতে আমরা আরো উদার হতে পারব।

সবশেষে, একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা বিভিন্ন বিতর্ক এবং বক্তৃতা উপভোগ করি। কোনটি ন্যায় এবং অন্যায়, ভালো কিংবা মন্দ তা আমরা বুঝি কিন্তু কোন্‌টি যুক্তিসঙ্গত বা কোন্‌টি অযৌক্তিক তা জানার চেষ্টা করিনা। অন্যের সাথে বিতর্ক করার সময় আমরা চেষ্টা করি কীভাবে নিজের প্রয়োজনগুলোকে রক্ষা করা যায় এবং এজন্য আরো বেশি যুক্তি বুদ্ধি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি। রাজনৈতিক তত্ত্ব ন্যায় এবং সাম্যের বিষয়ে আমাদের সুষম চিন্তা করতে সাহায্য করে, যাতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাছাই করা যুক্তি প্রমাণের সহযোগিতায় সর্বজনীন স্বার্থগুলোকে রক্ষা করতে পারি। এ ধরনের যুক্তিসঙ্গত বিতর্কের দক্ষতা অর্জন এবং ফলপ্রসূ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী তথ্য আদান-প্রদানের আসল সম্পদ।

অনুশীলনী

১) রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলির কোন্‌টি সত্য বা মিথ্যা তা যাচাই করো।

ক) রাজনৈতিক তত্ত্ব সে সকল ধারণা নিয়ে আলোচনা করে, যা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি গঠন করতে সাহায্য করে।

খ) এটি বিভিন্ন ধর্মসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে।

গ) এটি স্বাধীনতা ও সাম্যের মতো ধারণাগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করে।

ঘ) এটি রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে।

অনুশীলনী

২) রাজনীতি হল রাজনীতিবিদরা যা করে থাকেন তার চেয়ে বেশি কিছু। তুমি কি এই মন্তব্যের সাথে একতম? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

৩) একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কার্যকলাপের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন দেশের সচেতন নাগরিক। - ব্যাখ্যা করো।

৪) রাজনৈতিক তত্ত্বের অধ্যয়ন আমাদের প্রত্যেকের কাছে কীভাবে উপযোগী? এরকম চারটি উপায় বের করো যার সাহায্যে এটা প্রমাণ করা যায় যে রাজনৈতিক তত্ত্বের অধ্যয়ন আমাদের পক্ষে উপযোগী।

৫) তুমি কি মনে কর যে, ভালো যুক্তি অন্যদেরকে তোমার বক্তব্য শোনার জন্য বাধ্য করে?

৬) তুমি কি মনে কর যে, রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনা অংকশাস্ত্রের আলোচনার সমতুল্য? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

অধ্যায়-২

স্বাধীনতা (Freedom)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সুদূর অতীত কাল থেকে মানবজাতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী গোষ্ঠীর দ্বারা অবদমিত, শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও লক্ষ করা যায় যে এই ধরনের প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামের বহু ঘটনা ঘটেছে। এই স্বাধীনতা কি, যার জন্য মানুষ সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে এবং এমনকি হাসিমুখে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকে? সংক্ষেপে বলতে গেলে স্বাধীনতার জন্য এই যে মরণপণ সংগ্রাম তা প্রতিটি মানুষের নিজস্ব জীবন নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ করার জন্য পরিচালিত হয়। প্রতিটি মানুষ যাতে নিজের মনের ভাব স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে ও নিজের পছন্দ অনুসারে সে কাজ করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে চলতে পারে তা নিশ্চিত করা। শুধুমাত্র ব্যক্তি নয় প্রতিটি জাতি গোষ্ঠী তার সমাজের নিজস্ব মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে চায় এবং প্রয়োজনে তা সুরক্ষিত করতে চায়। বস্তুত পক্ষে, মানবজীবনের বহুমুখী লক্ষ ও স্বার্থের সুরক্ষার জন্য সমাজে অবস্থিত প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষেই কতগুলি নিয়মকানুন মেনে চলা প্রয়োজন। এই সমস্ত নিয়মকানুনগুলি হল ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনযাপন চলাফেরার ক্ষেত্রে কতগুলি আরোপিত বাধা-নিষেধ। কিন্তু এই সমস্তবাধা নিষেধগুলি কখনই ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাড়ায় না; বরং এই সমস্ত বাধা নিষেধগুলি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান ও স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। রাজনৈতিক তত্ত্বে স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বেশিরভাগ আলোচনা এমন কতগুলি নিয়ম তৈরি করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে আমরা সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। যেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক রয়েছে যে, স্বাধীনতার উপর সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে কতটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ বাঞ্ছনীয়। বর্তমান অধ্যায়ে এই ধরনের কতকগুলি বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ঃ

এই অধ্যায়টি আলোচনা করলে তোমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা পাবে।

- ব্যক্তি এবং সমাজের পক্ষে স্বাধীনতার গুরুত্ব অনুধাবন ।
- স্বাধীনতার সদর্থক এবং নঞর্থক দিকের পার্থক্যের ব্যাখ্যা।
- স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর নীতি বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা।

২.১ স্বাধীনতার আদর্শ (The Ideal of Freedom)

উপরোক্ত বিতর্কগুলোর সমাধান অনুসন্ধান করার পূর্বে কতগুলো বিষয় প্রাসঙ্গিক ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে পৃথিবীর অন্যতম মহৎ ব্যক্তি, নেলসন মেন্ডেলা তাঁর আত্মজীবনীমূলক "লঙ ওয়াক টু ফ্রিডম' (Long Walk to Freedom) গ্রন্থে কী বলতে চেয়েছেন তা বোঝা দরকার। এই গ্রন্থে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে পরিচালিত সংগ্রাম তুলে ধরেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ কী ধরনের অবর্ণনীয় শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য এবং শেতাঙ্গ শাসিত পুলিশি অত্যাচার সহ্য করেছিল তা তুলে ধরেছিলেন। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে কৃষ্ণাঙ্গারা কোন ধরনের ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতনা, তাদের কোন নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ ছিল না, এমনকি স্বাধীনভাবে শহরে চলাফেরা করার বা ইচ্ছামতো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ারও স্বাধীনতা ছিল না, সামগ্রিকভাবে শ্বেতাঙ্গাদের দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধগুলো অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পরেছিল। জাতি এবং বর্ণের ভিত্তিতে নাগরিকদের উপর আরোপিত বিধি নিষেধের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে, সাধারণ মানুষের দুর্দশার কোনো সীমা ছিল না। নেলসন ম্যান্ডেলা এবং তার সাথীরা এই বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে এক আপোসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন এবং এই সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। তিনি তাঁর রচিত "লঙ ওয়াক টু ফ্রিডম" গ্রন্থে দক্ষিণ আফ্রিকা পরিচালিত কৃষ্ণাঙ্গ ও অন্যান্য মানুষের উপর শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস ও তার বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

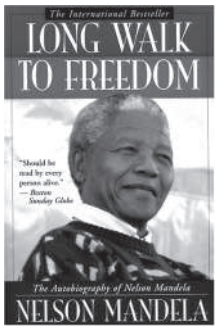

স্বাধীনতার মতো পবিত্র ও মহান আদর্শের জন্য আপোসহীন লড়াই সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য নেলসন মেন্ডেলাকে সুদীর্ঘ ২৮ (আটাশ) বৎসর কারান্তরালে কাটাতে হয়েছিল। এটা কি কল্পনা করা যায়, একজন ব্যক্তি তাঁর যৌবনের বা পুরোটা সময় জেলে কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন শুধুমাত্র স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার কারণে। তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর জীবনের সমস্ত ধরনের সুখ সুবিধা বিসর্জন দিয়েছিলেন। তিনি বক্সিং খেলা খুবই পছন্দ করতেন, কিন্তু তা থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করেছেন। তিনি জীবনে কোনো দিন তাঁর পছন্দমতো খাবার খেতে পারেন নি, নিজের পছন্দমত পোষাক পরিধান করতে পারেন নি, পছন্দমত

শুধুমাত্র কি মহান ব্যক্তিরাই স্বাধীনতার মত মহান আদর্শের জন্য লড়াই করেন? এই ধরনের আদর্শ আমার কাছে কী অর্থ বহন করে?

স্বাধীনতা

রাজনৈতিক তত্ত্ব

স্বাধীনতা

সংগীত শুনতে পারেন নি, বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপচারিতায় কোনো সময় ব্যয় করতে পারেন নি, এমনকি তাঁর পছন্দমতো কোনো সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে সময় অতিবাহিত করতে পারেননি। শুধুমাত্র স্বাধীনতার মতো মহান আদর্শের কথা জনগণের নিকট উপস্থাপন করার জন্য বছরের পর বছর তাঁকে জেলের বন্ধ কুঠরির মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কবে তিনি জেল থেকে মুক্তি পাবেন তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। এক কথায় বলা যায়, স্বাধীনতার জন্য তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ঠিক এই ধরনের অপর একটি ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের আং সাং সুকির ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তাঁকে জীবনের এক সুদীর্ঘ সময় ধরে গৃহবন্দি থাকতে হয়েছিল। আং সাং সুকি মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহ এবং অহিংস মতাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মানুষের স্বাধীনতার অধিকার বলবৎ করার জন্য তাঁকে চরম আত্ম ত্যাগকরতে হয়েছিল। তাঁকে তাঁর সন্তানদের সঙ্গে বসবাস করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি, এমনকি তাঁকে তাঁর ক্যান্সার আক্রান্ত মৃতপ্রায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্য কোনো সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়নি। এমনকি তিনি ভীত হয়ে ভাবতেন যে, যদি তিনি ইংল্যান্ডে চিকিৎসাধীন স্বামীকে দেখতে যান, আর স্বদেশে ফিরে আসতে পারবেন না। স্বাধীনতা বলতে তিনি সমগ্র মায়ানমারবাসীর মুক্তিকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলে মনে করতেন। তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ নিয়ে সংকলিত গ্রন্থ " ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার" এ তিনি স্বাধীনতার অর্থ ও প্রকৃতি কি এবং মায়ানমারবাসীর জন্য এই স্বাধীনতা কতটা প্রয়োজনীয় তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেছেন, "আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হল ভয় থেকে মুক্তি, আর যদি না তোমরা ভয় থেকে মুক্ত হতে পারো, তাহলে মর্যাদাপূর্ণ মানব জীবনযাপন করতে পারবে না।" এই বিষয়গুলো ও তাদের প্রভাব চিন্তা করলে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়। সুকির পরামর্শ মতে, যখন আমরা আত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম পরিচালনা করবো তখন অন্যের অপবাদ, কর্তৃপক্ষের চোখ রাঙানি অথবা অন্য কারোর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদিকে ভয় পাবোনা, সুকি তাই বলেছেন, মর্যাদাপূর্ণ মানবজীবনযাপন করতে গেলে আমাদেরকে এসকল ভয়ভীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নেলসন ম্যান্ডেলা এবং আং সাং সুকির রচিত দুটি গ্রন্থে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শের প্রাণ শক্তি খুঁজে পাই। এটি এমন এক আদর্শ যা আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং ব্রিটিশ, ফরাসী ও পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

চলো এটা করি

তুমি কি এমন একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে পার যিনি তোমার জেলার শহরে বা গ্রামে তার নিজের বা অন্যের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে? সেই ব্যক্তি এবং স্বাধীনতার বিশেষ দিক সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো যা তিনি রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

স্বাধীনতা

স্বরাজ (Swaraj)

'স্বরাজ' হল ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার স্বাধীনতার অনুরূপ একটি ধারণা। আক্ষরিক অর্থে 'স্বরাজ' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'স্ব' মানে হল নিজের এবং 'রাজ' মানে হল শাসন। যাকে দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, 'স্বরাজ'-এর অর্থ হল নিজেকে নিজে শাসন করা এবং নিজের কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় স্বাধীনতা হল একটি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক দাবি এবং সমষ্টিগত সামাজিক মূল্যবোধ। স্বরাজ কথাটি ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দাবি যা আমরা মহামান্য তিলক এর বক্তব্যে খুজে পাই-"স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, এবং আমি তা অর্জন করবই"।

স্বরাজ কথার অর্থ হল নিজের উপর নিজের শাসন, যা আমরা গান্ধীজীর 'হিন্দু স্বরাজ' গ্রন্থে দেখতে পাই, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন "যখন আমরা নিজের উপর শাসন করতে শিখি তাই হল স্বরাজ।" স্বরাজ শুধু মাত্র স্বাধীনতা নয়, স্বরাজ বলতে নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ, সমতা এবং অমানবিক কোনো কাজ সম্পর্কে আত্ম উপলব্ধিকে বোঝায়। নিজস্ব সত্তা উপলব্ধি করা এবং সম্প্রদায় ও সমাজের সাথে এর সম্পর্ক গড়ে তুলে স্বরাজ অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

গান্ধিজি বিশ্বাস করতেন যে ন্যায় নীতির দ্বারা পরিচালিত হলে ব্যক্তি ও সামগ্রিক সত্তা মুক্তি লাভ করে। এই কথাটি বর্তমানে যেমনি সত্য তেমনি ১৯০৯ সালে যখন গান্ধিজি 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তখনও তা প্রাসঙ্গিক ছিল।

২.২ স্বাধীনতা কী ? (What is Freedom)

'স্বাধীনতা কী' এই প্রশ্নের একটি সহজ সরল উত্তর হল ব্যক্তির উপর বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতিই হল স্বাধীনতা । স্বাধীনতা তখনই থাকে যখন ব্যক্তির উপর বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা থাকে না। এই সংজ্ঞানুসারে যদি কোন ব্যক্তির উপর বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ বা বল প্রয়োগ না হয় এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তাহলে ঐ ব্যক্তিকে স্বাধীন বলে গণ্য করা যায়। তবে প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতি হল স্বাধীনতার একটি মাত্র দিক। অন্য দিকে স্বাধীনতা মানুষকে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে এবং তাদের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার ক্ষমতাকে আরো সম্প্রসারিত করে। এই অর্থে স্বাধীনতা এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ তাদের সৃজনশীলতা ও সক্ষমতা বিকশিত করতে পারে।

সুতরাং স্বাধীনতার দুটি অর্থই-অর্থাৎ ব্যক্তির জীবনে সমস্ত ধরনের বাধার অনুপস্থিতি এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের উপযোগী পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি মুক্ত সমাজ বলতে সেই সমাজকে বুঝায়, যেখানে সমাজের প্রতিটি সদস্য তার নিজ নিজ যোগ্যতার সার্থক রূপায়ণ করতে পারে এবং সেখানে ব্যক্তির উপর আরোপিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ খুবই কম থাকে। সভ্য সমাজের কোন ব্যক্তিই এই ধরনের স্বাধীনতা আশা করতে পারে না, যেখানে তার বাহ্যিক কার্যকলাপের উপর কোনো প্রকারের নিয়ন্ত্রণ বা বিধি নিষেধ থাকবে না। তাই আমাদের এটা নির্ধারণ করা প্রয়োজন কোন্ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা যুক্তি সঙ্গত আর কোন্টা নয়, কোন্টা গ্রহণযোগ্য এবং কোন্টা বর্জনীয় । কোন্ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থাকা প্রয়োজন আছে তা বোঝার জন্য স্বাধীনতার আলোচনায় ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে অবস্থিত মৌলিক সম্পর্ককে জানতে হবে। এখানে সমাজের অর্থ হল গোষ্ঠী, সম্প্রদায়

বা রাষ্ট্র যার মধ্যে মানুষ বসবাস করে। এর অর্থ হল আমাদের উচিত ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক যাচাই করা। আমাদের দেখতে হবে সমাজের কোন্ বৈশিষ্ট্যটি ব্যক্তিকে নির্বাচন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাজ করার স্বাধীনতা প্রদান করে আর কোন্‌টি দেয় না। তাই আমাদের নির্ণয় করতে হবে কোন্ বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করব আর কোনটি বর্জন করব। এটাও লক্ষ করা প্রয়োজন, যে নীতির মানদণ্ডে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বাধার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়, তা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কিভাবে প্রযোজ্য হয়।

এখন পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতাকে প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতি রূপেই সংজ্ঞায়িত করেছি। স্বাধীন হওয়ার অর্থ সেই সব সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে হ্রাস করা যা আমাদের স্বাধীনভাবে কোনকিছু পছন্দ করার ক্ষমতাকে বাধা দেয়। যাই হোক এটা স্বাধীনতার একটি দিক মাত্র। অন্যদিক থেকে বলতে গেলে স্বাধীনতার একটি সদর্থক দিকও রয়েছে। স্বাধীন হতে গেলে সমাজকে আরো উদার ও বিস্তৃত হতে হবে যার মাধ্যমে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতি তাদের নিজস্ব ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে।

চলো বিতর্ক করি

নিজের জীবন সঙ্গী বেঁছে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত? এক্ষেত্রে পিতা মাতা বা অবিভাবকের কোন আপত্তি করা উচিত নয়।

স্বাধীনতা এই অর্থে ব্যক্তির সৃজনশীলতা, সংবেদনশীলতা ও সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশের অনুমতি দেয়। এই বিকাশ খেলাধুলা, বিজ্ঞান, শিল্প, সংগীত বা অনুসন্ধানের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে পারে। নূন্যতম প্রতিবন্ধকতা সত্বেও যেখানে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়, তাই হল মুক্ত সমাজ। স্বাধীনতাকে মূল্যবান বলে মনে করা হয় কারণ এটা আমাদের পছন্দ অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেয়। স্বাধীনতার কারণেই ব্যক্তি নিজের বিবেক ও সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করে।

প্রতিবন্ধকতার উৎস (The Sources of Constraints)

ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আরোপিত বিভিন্ন বাধা নিষেধ কর্তৃপক্ষের প্রভুত্ব এবং বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হতে পারে। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ বলপ্রয়োগ অথবা সরকারি আইনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা জনগণের উপর শাসক গোষ্ঠী সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় কার্যকর করে। এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা ঔপনিবেশিক শাসক দ্বারা বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্যের ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ করতে পারি। যে-কোনো দেশেই কোন না কোন ধরনের সরকার থাকা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি সেই সরকার গণতান্ত্রিক প্রকৃতির হয়, তাহলে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি শাসক কর্তৃপক্ষের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। সেজন্য গণতান্ত্রিক সরকারকে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে মনে করা হয়।

জাতপাত ভিত্তিক সামাজিক ও চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য স্বাধীনতার উপর প্রতিবন্ধকতা

স্বাধীনতা সম্পর্কে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস (Netaji Subhash Chandra Bose on Freedom)

"যদি আমরা সমাজে একটি বৈপ্লবিক ধারণা গড়ে তুলতে চাই, তাহলে এমন একটি আদর্শ গ্রহণ করতে হবে যা জীবনব্যাপী আমাদের উৎসাহ দেবে। এই আদর্শটি হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা হল একটি শব্দ যার বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের মতো দেশে স্বাধীনতার ধারণা দীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা, যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পাশাপাশি সামাজিক স্বাধীনতা, দরিদ্র অংশের মানুষের স্বাধীনতা, পুরুষ ও মহিলাদের সমান স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সমাজের সকল ব্যক্তি এবং সমষ্টির স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বলতে কেবল রাজনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তিকে বোঝায়না। বরং সম্পদের সমবণ্টন, জাতপাত ভিত্তিক বৈষম্য ও সামাজিক অন্যায়ের বিলুপ্তি এবং সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার অবলুপ্তিকে বোঝায়। এটি একটি আদর্শ যা ভাবপ্রবণতাহীন মানুষের কাছে কাল্পনিক বলে মনে হতে পারে কিন্তু এই আদর্শই একমাত্র মানসিক ক্ষুধা প্রশমিত করতে পারে।

১৯শে অক্টোবর ১৯২৯ সালে লাহোরে ছাত্র সম্মেলনে দেওয়া সভাপতির ভাষণ।

সৃষ্টি করতে পারে। এই সমস্ত বিধি নিষেধগুলো অপসারণের ক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে সমস্ত মন্তব্য করেছিলেন সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩ কেন আমাদের প্রতিবন্ধকতা প্রয়োজন (Why do we need constraints)

এরূপ কোনো পৃথিবীর কথা কল্পনা করা যায় না, যেখানে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের উপর কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এই সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিনিষেধগুলি সকলের মনে চলা উচিত, নতুবা সমাজে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। মতাদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সীমিত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে পার্থক্য এবং সংঘাত একটি স্বাভাবিক বিষয়। সমাজে সংগঠিত মত পার্থক্যগুলোর পশ্চাতে হাজারো কারণ থাকে, সেগুলো মাঝে মাঝে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। নগন্য কিংবা জঘন্য যে-কোন কারণেই আমাদের চারপাশের মানুষগুলো পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। যেমন, রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময়। নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি পার্কিং করার জন্য, জমি-বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে, কোন বিশেষ ছায়াছবি সাধারনের পক্ষে দৃষ্টিকটু কিনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মানুষে মানুষে মতবিরোধ দেখা যায়। যা মানুষকে হিংসার দিকে ধাবিত করে এবং জীবনহানীরও কারণ হয়ে দাড়ায়। সেজন্য সমাজে এরকম একটি পদ্ধতি থাকতে হবে যার মাধ্যমে হিংসা-বিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মতামতের ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরকে সম্মান করে যাব এবং নিজেদের ইচ্ছাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো না, তখনই আমরা ন্যূনতম প্রতিবন্ধকতা নিয়েও মুক্ত জীবন যাপন করতে পারবো। আদর্শগতভাবে একটি স্বাধীন সমাজে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসরণ করতে পারে, জীবন ধারণের জন্য নিজস্ব নিয়ম নীতি বিকশিত করতে পারে এবং যে-কোন বিষয়ে নিজস্ব স্বাধীন মতামত গড়ে তুলতে পারে।

স্বাধীনতা

তবে এরূপ সমাজ গড়ে তোলার জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন। ন্যূনতম পক্ষে সমাজে এমন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি একে অন্যের বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও মতামতকে শ্রদ্ধা করবে। অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে, নিজের বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ়তার জন্য প্রয়োজন অন্য সবার বিরোধিতা করা, যারা আমাদের মতামতকে উপেক্ষা বা বিরোধিতা করে, যার জন্য অন্যের মত ও পথকে আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত এবং অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে কিছু আইনি বা রাজনৈতিক বিধিনিষেধ থাকা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে এটা সুনিশ্চিত করা যায় যে এক গোষ্ঠীর বিচার অন্যের উপর না চাপিয়ে নিজেদের মধ্যকার মতনৈক্যগুলিকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। কোনো খারাপ পরিস্থিতিতে যদি আমাদেরকে অন্য কারোর মতাদর্শকে মানতে বাধ্য করা হয় তখন আমরা আইনের সাহায্য চাইতে পারি যা আমাদের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করবে।

উদারনীতিবাদ (Liberalism)

যখন মানুষ কথা প্রসঙ্গে এটা বলে থাকে যে, একজনের পিতামাতা বা অভিবক অত্যন্ত উদার, তার অর্থ দাড়ায় এই সমস্ত অভিভাবকরা খুবই সহিষ্ণু। উদারনীতিবাদের আদর্শকে রাজনৈতিক মতাদর্শে সহিষ্ণুতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। উদারনীতিবিদরা এটা সমর্থন করার চেষ্টা করেন যে একজন ব্যক্তির মতামত প্রকাশের বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা, অন্যের বিশ্বাস ও ধারণার বিরোধী হলেও সেটাকে তুলে ধরতে হবে। শুধুমাত্র উদারনীতিবাদই একটি আধুনিক মতাদর্শ নয়, যেখানে সহনশীলতার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আধুনিক উদারনীতিবাদি দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা। উদারনীতিবাদিদের কাছে পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায় এগুলোর কোন নিজস্ব মূল্য নেই। এগুলি তখনই মূল্যবান হয় যখন ব্যক্তি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হয়। উদারনীতিবাদিদের মতে, একজনের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পরিবার, জাতি বা সমাজের সিদ্ধান্তের চেয়ে ব্যক্তির সিদ্ধান্তই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উদারনীতিবাদীরা সাম্যের আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্পর্কেই বিশেষভাবে সন্দিহান।

ঐতিহাসিক ভাবে উদারনীতিবাদিরা মুক্ত বাজার তত্ত্বে এবং ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের নূন্যতম নিয়ন্ত্রণ আরোপের পক্ষপাতী। যদিও বর্তমান উদারনীতিবাদ জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভূমিকা স্বীকার করে এবং আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সমাজে যে বৈষম্য বর্তমান রয়েছে সেগুলি দূর করার প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করে।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল স্বাধীনতার উপর কোন্ ধরনের বিধিনিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত বা উপযোগী এবং কোন্ ধরনের বিধিনিষেধগুলি সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়? কোন্ ধরনের কর্তৃত্ব যথার্থই বলতে পারে যে কোনটা করা যাবে, কোনটা করা যাবে না। তাছারাও আমাদের জীবন ও কর্মের এমন কোন ক্ষেত্র আছে কি যেগুলিকে বাহ্যিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রাখা উচিত?

২.৪ ক্ষতিকারক নীতি (Harm Principle)

তিনি কেন মানব জাতির কথা বলেছেন? নারী সম্পর্কে কি ?

এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে হলে আমাদের উপর আরোপিত প্রতিবন্ধকতার সীমাবদ্ধতা, কার্যকারিতা এবং পরিণতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের অন্য একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে, যা জন স্টুয়ার্ট মিল তার 'অন লিবারটি' গ্রন্থে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনায় এগুলিকে 'ক্ষতিকারক নীতি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। চলো তাঁর বক্তব্যটি দেখি এবং পরে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

... একমাত্র উদ্দেশ্য যার জন্য গোটা মানব সমাজকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা হল ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে সমাজের যে-কোনো সদস্যের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকারের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ, এবং এটিই হল আত্মরক্ষা। সভ্য সমাজের যে-কোন সদস্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইনসঙ্গতভাবে শক্তি প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।

মিল এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য উপস্থাপন করেন। তিনি 'স্ব-সম্পর্কিত কার্য' এবং 'অন্য সম্পর্কিত কার্যের' মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। মিল স্ব-সম্পর্কিত কার্য বলতে বোঝাতে চেয়েছেন সেই সমস্ত কার্যকে যেগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে, অন্য কারো ক্ষেত্রে নয়। অন্যদিকে অন্য সম্পর্কিত কার্য বলতে সেই সমস্ত কার্যবলিকে বোঝায় যা সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তির যে সমস্ত কার্যাবলি ও আচরণ শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে রাষ্ট্র বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ সে ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবেনা। সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে এটা আমার নিজস্ব কাজ এবং আমি আমার পছন্দমত সেই কাজ করার চেষ্টা করব। 'এটা আমার কাজ আমি যা পছন্দ করি তা আমি করব যদি এটা আপনাকে প্রভাবিত না করে তাতে আপনার চিন্তা কী? এর বিপরীতে এরকম কার্য যা অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে বা এই কাজের ফলে অন্যের ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে বাহ্যিক হস্তক্ষেপ করা যায়। যদি আপনার কার্য আমার ক্ষতির কারণ হয় তাহলে আমি অবশ্যই কোনো বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবো। এই ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির এমন আচরণে বাধা দিতে পারে যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর ।

যেহেতু স্বাধীনতা মানব সমাজের মূল বিষয় এবং সম্মানজনক মানব জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই এর উপর শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধকতা রাখা উচিত। কোন ব্যক্তির কার্যকলাপের দ্বারা মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। কিন্তু , সামান্য পরিমাণ ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে মিল শুধুমাত্র বিশেষ সামাজিক বাধ্যবাধকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কোনো ধরনের আইনি হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ

বলা যায় একটি বহুতল বাড়ির কোনো এক কক্ষে জোরে গান বাজানোর জন্য অন্য বাসিন্দাদের শুধু সামাজিক অসন্তোষের মাধ্যমে তা সমাধান করা উচিত, তার জন্য পুলিশকে জড়ানো উচিত নয়। উচ্চ স্বরে গান বাজানোর জন্য যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে হয়তো তাকে শুভেচ্ছা জানাতে অস্বীকার করতে পারে। যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতির উপেক্ষা করে উচ্চ স্বরে গান

চলো চর্চা করি

পরিধেয় বস্ত্রের নিয়মাবলি সম্পর্কিত সমস্যা।

যদি একজন ব্যক্তি কী পরিধান করবে তা তার স্বাধীনতার অভিব্যক্তি হয় তাহলে নিম্নে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে পরিধেয় বস্ত্রের উপর আরোপিত বিধি নিষেধগুলো আমরা কীভাবে দেখব?

- চিনে মাও জমানায় সমস্ত চিনা নাগরিকের 'মাও পোশাক' পরিধান করা বাধ্যকতামূলক ছিল কারণ চিনে এটা মনে করা হত এই ধরনের পোষাক পরিধান সাম্যের ধারণাকে ব্যক্ত করে।
- বিখ্যাত টেনিস খেলোয়ার সানিয়া মির্জার বিরুদ্ধে একজন মৌলবি ফতোয়া জারি করেছেন কারণ তার পোশাকের ধরন মহিলাদের পোশাক পরিধানের নিয়ম বহির্ভূত ছিল ।
- পাঁচদিনের টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলার নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সাদা পোশাক পরিধান করা বাধ্যতামূলক।
- বিদ্যালয়ে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করা আবশ্যক।

চলো কিছু প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক করা যাক ঃ

- সমস্ত ক্ষেত্রে বা কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষ কি পরিধান করবে তা নিয়ে কি কোনো বিধি নিষেধ থাকা প্রয়োজন? এ ধরনের বিধি নিষেধ কখন স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়?
- এই ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করার কর্তৃত্ব কার হাতে রয়েছে? ধর্মীয় নেতাদের হাতে কি এই ধরনের কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া যায় যারা পোশাকের উপর ফতোয়া জারি করতে পারে? কে কী পোশাক পরিধান করবে তা কি রাষ্ট্র ঠিক করে দিতে পারে? আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা কি ক্রিকেট খেলার পোশাক নির্ধারণ করে দিতে পারে?
- এরূপ বিধিনিষেধ বাড়াবাড়ি নয়? মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের বিভিন্ন পথ কি এর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না?
- এই ধরনের বিধি নিষেধ গ্রহণ করার পরিণাম কী কী? মাও এর সমকালীন চিনের মতো যদি সবাই একই রকম পোশাক পরে তা হলে কি সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে?খেলাধূলায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে সহায়ক কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী পোশাক পরার কারণে মহিলারা কি প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন? ক্রিকেটাররা যদি রঙিন পোষাক পরে তাতে কি খেলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

বাজায় তার সাথে অন্যরা সৌজন্য বিনিময় বন্ধ করে দিতে পারে কারণ উচ্চ স্বরে গান বাজানো অন্যদের নিজস্ব আলাপচারিতা, নিদ্রা, একান্তে গান শোনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। এগুলি খুবই সাধারণ ক্ষতি এবং এক্ষেত্রে সামাজিক অসম্মতি দেখানোই যথেষ্ট। এটা আইনি শাস্তির জন্য উপযুক্ত মামলা নয়। আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তির কার্যাবলির উপর

বিধিনিষেধ শুধুমাত্র তখনই আরোপ করা উচিত যখন অন্যের সম্পর্কিত আচরণগুলো কিছু ব্যক্তির মারাত্মক ক্ষতি করে। অন্যথায় সমাজকে স্বাধীনতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।

মানুষকে জীবন যাপনের নানা পন্থা, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি সহনশীল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত, যত দিন তারা অন্যদের ক্ষতি না করে। কিন্তু এই ধরনের সহনশীলতার বিস্তার, সেই সব মতামত ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়ানো উচিত নয় যা জনগণকে বিপদে ফেলতে পারে বা তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার সৃষ্টি করতে পারে। ঘৃণার প্রচার এবং গুরুতর ক্ষতিকর কাজের উপর প্রতিবন্ধকতা লাগানো যেতে পারে। কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে প্রতিবন্ধকতা যেন এমন কঠোর না হয় যাতে স্বাধীনতাই নষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিদ্বেষ প্রচারকারীদের জন্য আমরা আজীবন কারাবাসের কথা বলতে পারি না। হয়তো তাদের আন্দোলন ও জনসভা করার অধিকার কিছুটা খর্ব করা যেতে পারে, বিশেষত যদি তারা এই প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাষ্ট্র দ্বারা আরোপিত সতর্কতা অমান্য করে।

ভারতের সাংবিধানিক আলোচনায় এধরনের সমর্থনযোগ্য প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যবহৃত শব্দটি হল 'যুক্তি সঙ্গত সীমাবদ্ধতা'। সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাগুলো সেখানে থাকতে পারে, তবে তা হবে যুক্তিসঙ্গত এবং তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই রকম প্রতিবন্ধকতা অতিরিক্ত হওয়া উচিত নয়। প্রতিবন্ধকতাটি এমন কোনো কাজের উপর প্রয়োগ হবে না যার সাথে তার সম্পর্ক নেই কারণ তা সামাজিক স্বাধীনতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। আমাদের প্রতিবন্ধকতা লাগানোর অভ্যাস গড়ে তোলা থেকে বিরত থাকতে হবে, কেন না এই অভ্যাস স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে।

২.৫ নেতিবাচক ও ইতিবাচক স্বাধীনতা (Negative and Positive Liberty)

এই অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে আমরা স্বাধীনতার দুটি দিকের কথা উল্লেখ করেছিলাম যথা, স্বাধীনতা হল বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতি এবং অন্যটি হল স্ব-মত প্রকাশের সীমাহীন সুযোগ। রাজনৈতিক তত্ত্বে এগুলোকে নেতিবাচক এবং ইতিবাচক স্বাধীনতা বলা হয়েছে। নেতিবাচক স্বাধীনতা এমন একটি ক্ষেত্রকে নির্দেশ কিংবা সমর্থন করে যেখানে ব্যক্তি হবে সর্বেসর্বা এবং যার মধ্যে সে যা খুশি করতে পারে কিংবা যা খুশি হতে পারে। এটা এমন একটা অবস্থা যাতে কোন বহিরাগত কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এটা এমন একটি ক্ষুত্র অথচ অলঙ্ঘনীয় ক্ষেত্র যেখানে ব্যক্তি যা করতে চায় তার উপর কোনো হস্তক্ষেপ করা যায় না। ন্যূনতম হস্তক্ষেপহীন ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটির উপস্থিতি এমন একটি অবস্থার স্বীকৃতি দেয় যা মানুষের প্রকৃতি ও মর্যাদার সুরক্ষার জন্য খুব প্রয়োজন এবং যে অবস্থায় ব্যক্তির কাজ অন্যের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এই সীমারেখাটি কতটা বড়ো হওয়া উচিত বা এতে কী কী থাকা উচিত এটি

বিতর্কের বিষয় এবং এই বিতর্ক চলতেই থাকবে কারণ হস্তক্ষেপ না করার ক্ষেত্রটি যত বড়ো হবে স্বাধীনতার ক্ষেত্রও তত বিস্তৃত হবে।

আমাদের সকলের স্বীকার করা প্রয়োজন যে নেতিবাচক স্বাধীনতার ঐতিহ্য ব্যক্তি স্বাধীনতার এমন ক্ষেত্রের কথা বলে যেখানে কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হয় না। হস্তক্ষেপহীনতার ক্ষেত্রটি যদি ছোটো হয় তাহলে মানব মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এখানে আমরা স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করতে পারি যে, বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে কিংবা দপ্তরে কোন্ ধরনের বস্ত্র পরিধান করা হবে এটি নির্বাচনের স্বাধীনতা এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে হস্তক্ষেপ অত্যন্ত সীমিত কিংবা বাইরের কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। অথবা স্বাধীনতার এই ক্ষেত্রটি কী এমন যেখানে রাষ্ট্র, ধর্ম, আই সি সি এবং সি বি এস ই-এর মত সংস্থার হস্তক্ষেপ থাকবে? নেতিবাচক স্বাধীনতা যুক্তির মাধ্যমে এই প্রশ্নটি করে যে স্বাধীনতার কোন্ ক্ষেত্রে শুধু আমার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ থাকবে? নেতিবাচক স্বাধীনতা যে ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করে তাহল "কী কী বিষয় থেকে ব্যক্তি মুক্ত বা স্বাধীন?"

প্রকারান্তরে ইতিবাচক স্বাধীনতা এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করে যে ' কোন বিষয়গুলোর প্রতি সে স্বাধীন'? উত্তরটি যে প্রশ্নের ক্ষেত্রে আসে তা হল 'কে আমাকে শাসন করে?' এবং যার আদর্শ উত্তর হল 'আমি আমাকে শাসন করি'। ইতিবাচক স্বাধীনতার একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে যা আমরা দেখতে পাই রুশো, হেগেল, মার্কস, গান্ধি, অরবিন্দ এবং তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত পরবর্তী চিন্তাবিদদের সামগ্রিক আদর্শে। বিষয়টি যুক্ত থাকে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের প্রকৃতি ও প্রেক্ষাপটের উপর, যেখানে ব্যক্তিত্বের বিকাশ যৎসামান্যই বাধাপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তির বিকাশ একটি ফুলের মতো যা প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য উর্বর মাটি, নরম সূর্যের আলো, প্রয়োজনীয় জল এবং প্রাত্যহিক যত্নের প্রয়োজন হয়।

আমাদের কি পরিবেশ ধ্বংস করার অধিকার আছে?

ব্যক্তির কিংবা তার সামর্থ্যের বিকাশের জন্য পরিবেশের বাস্তব রাজনৈতিক ও সামাজিক উপাদানগুলো ইতিবাচক হওয়াও বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কর্মহীনতা ও দারিদ্রতার দ্বারা অবরুদ্ধ থাকবে না, এবং তার প্রাত্যহিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আশেপাশে পর্যাপ্ত উপাদান উপস্থিত থাকবে। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে যাতে প্রণীত আইন তাদের অনুকূলে হয় এবং তাদের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো স্বীকৃতি পায়। সর্বোপরি মেধা ও বুদ্ধির বিকাশের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুবিধাগুলোতে ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ আবশ্যক, যাতে তারা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

ইতিবাচক স্বাধীনতা স্বীকার করে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র সমাজের মধ্যেই স্বাধীন হতে পারে (সমাজের বাইরে নয়)। যার কারণে সে এমন সমাজ নির্মাণ করার চেষ্টা করে যা ব্যক্তি বিকাশে সহায়ক হয়। অন্যদিক নেতিবাচক স্বাধীনতা এমন এক অলঙ্ঘনীয় হস্তক্ষেপহীন ক্ষেত্রের নির্দেশ

করে যেখানে ব্যক্তি শুধু সমাজের মধ্যে নয় তার বাইরেও স্বাধীন। বস্তুতপক্ষে নেতিবাচক স্বাধীনতা সবসময়ই তার সীমিত ক্ষেত্রটিকে যত দূর সম্ভব বৃদ্ধি করতে চায়, যদিও সে এখানে সমাজের স্থিতিশীলতাও কামনা করে। সাধারণত দুই ধরনের স্বাধীনতাই পাশাপাশি চলে এবং একে অপরকে সহায়তা করে। কিন্তু তথাপি স্বৈরতান্ত্রিকরা ইতিবাচক স্বাধীনতার যুক্তিকে খন্ডন করে নিজেদের শাসন ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দেখায়।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Expression)

মত প্রকাশের স্বাধীনতার ধারণাটি হস্তক্ষেপহীনতার নূন্যতম ক্ষেত্রের অর্ন্তভুক্ত একটি অন্যতম বিষয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেন বাধা দেওয়া উচিত নয় তা জন স্টুয়ার্ট মিল যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেছেন। এটি আলোচনার জন্য একটি উপযুক্ত বিষয়।

সময়ে বিভিন্ন বই, নাটক, চলচিত্র, পুঁথিগত রচনা যা বিভিন্ন গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর উপরে বিধিনিষেধ আরোপের জন্য দাবি করা হয়েছে। বই প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবিটি এই আলোচনার ভিত্তিতে চিন্তা করা যায় যেখানে আমরা দেখি স্বাধীনতা হল 'বিকল্প নির্বাচনের' স্বাধীনতা, যেখানে 'ইতিবাচক এবং নেতিবাচক স্বাধীনতার' মধ্য একটা সীমারেখা টানা হয়েছে। এখানে আমরা 'স্বাধীনতায় গ্রহণযোগ্য নিয়ন্ত্রণ' এর প্রয়োজন স্বীকার করি। তবে এর পেছনে নির্দিষ্ট নিয়ম এবং প্রয়োজনীয় যুক্তি তর্কের সমর্থন থাকতে হবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি মৌলিক মূল্য এবং যারা এটাকে সীমিত করতে চায় তাদের থেকে বাঁচার জন্য সমাজকে কিছু অসুবিধার প্রতি সহনশীল হতে তৈরি থাকতে হবে। ভলতেয়ারের বক্তব্যটি স্মরণ করো, 'তুমি যা বল আমি তা সমর্থন করি না কিন্তু আমি মরণ পর্যন্ত তোমার বলার অধিকারকে রক্ষা করব।' আমরা কতটা দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?

কিছু বছর আগে, চলচিত্র নির্মাতা দীপা মেহেতা বারাণসীর বিধবাদের সম্পর্কে একটি চলচিত্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন, এটি বিধবাদের দুর্দশার অন্বেষণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কিছু রাজনৈতিক সংগঠনের অংশ দৃঢ় প্রতিবাদ করে। তারা মনে করছিল যে এটি খুব খারাপভাবে ভারতকে উপস্থাপন করবে। তাদের মনে হয়েছিল এটা বিদেশী দর্শকদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। তারা মনে করেছিল এটি প্রাচীন শহরের নামকে কলুষিত করবে। তারা এটি তৈরি করার অনুমতি দেয়নি এবং ফলস্বরূপ এটি বারাণসীতে করা সম্ভব হয়নি। এটা পরবর্তীতে অন্যত্র তৈরি করা হয়েছিল। একইভাবে যেমন অব্রে মেনন (Aubrey Menon) এর রামায়ণ রিটোল্ড (Ramayana Retold) এবং সালমান রুশদি (Salman Rushdie) এর 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' (The Satanic verses) সমাজের কিছু অংশের প্রতিবাদের ফলে নিষিদ্ধ হয়েছিল। 'দ্য লাস্ট টেম্পটেশন অব ক্রাইস্ট (The Last Temptation of Christ) নামক চলচিত্র এবং মি নাথুরাম বোলতে (Me Nathuram Boltey) নামক নাটকের উপর বিরোধের ফলে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

স্বাধীনতা

এইভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারটা খুব সহজ কিন্তু এটা স্বল্পকালীন সমাধান। কারণ এটি শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করে কিন্তু সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার দৃষ্টিতে এটি খুবই ক্ষতিকর। কেননা যখন আমরা একবার নিষেধজ্ঞা প্রয়োগ শুরু করি তখন তা অভ্যাসে পরিণত হয়। তার মানে কি কখনই আমরা কোনো কিছু নিষিদ্ধ করব না? প্রকারান্তরে আমাদের চলচিত্রের উপরও ছাড়পত্রের ব্যবস্থা আছে। ছাড়পত্রের ব্যাপারটিও কি নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে পড়ে না, যেখানে পুরো চলচিত্রকে না হলেও তার কিছু অংশকে নিষিদ্ধ করা হয়? যে প্রশ্নটির উপরে প্রায়ই বিতর্ক হয় সেটি হল যে কোন্ প্রেক্ষাপটে কোনো কিছু নিষিদ্ধ করা উচিত বা উচিত নয়? তবে কখনোই কি প্রতিবন্ধকতা লাগু করা উচিত নয়? মজার ব্যাপার হল, ইংল্যান্ডে রাজ পরিবারের নিয়োজিত কর্মচারীরা চুক্তির মাধ্যমে এমনভাবে বাধ্য থাকে (বাধ্যকতা?) যেখানে তারা রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো কিছু ব্যক্ত করতে পারে না। সুতরাং রাজপরিবারের কর্মরত কোনো ব্যক্তি চাকুরি ছাড়ার পর তারা কোনো সাক্ষাৎকার দিতে পারবে না। রাজ পরিবারের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উপরে বই কিংবা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে পারবে না। এটা কি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপরে একটি অযাচিত বাধা নয়?

এভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমরা সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হই। এই প্রেক্ষাপটগুলো চর্চা করলে আমরা এটা বুঝতে পারি যে সীমাবদ্ধতাগুলো সবসময় সংঘবদ্ধ সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব অথবা রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সমর্থিত হয় এবং তারা এমনভাবে

মত প্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Expression)

ঊনবিংস শতাব্দীর ব্রিটেনের একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল মত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা চিন্তা ও আলোচনার স্বাধীনার উপর তাঁর আবেগময় ভাব ব্যক্ত করেছেন। নিজের লেখা 'অন লিবারর্টি (On Liberty) নামক গ্রন্থে তিনি মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে চারটি যুক্তি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যারা সমাজে এমন মতাদর্শ প্রচার করে যা বর্তমানে ভুল এবং বিপথগামী তাদেরও মতপ্রকাশর স্বাধীনতা থাকতে পারে।

প্রথমত কোনো ধারণাই পুরোপুরি মিথ্যা নয় । যা আমাদের কাছে মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয় তার মধ্যেও কিছু সত্যের উপাদান থাকতে পারে। যদি আমরা প্রতীয়মান ভুল ধারণাগুলো নিষিদ্ধ করি তাহলে সত্যের সেই উপাদানগুলো হারিয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় যুক্তিটি প্রথমটির সাথে সম্পর্কিত। সত্য নিজে নিজেই আবির্ভূত হয় না। সত্য সবসময় দুটি বিপরীতধর্মী মতামতের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। বর্তমানে প্রতীয়মান ভুল ধারণাগুলো সময়ের প্রেক্ষাপটে খুব মূল্যবান মনে হতে পারে, তখন এইগুলিকেই আমরা সঠিক বলে মনে করব।

তৃতীয়ত মতাদর্শগত সংঘর্ষ শুধু অতীতে মূল্যবান ছিল এমনটি নয়, সব সময়ের জন্যই এটা সমান ভাবে মূল্যবান। সত্যের সাথে সবসময়ই ঝুঁকি থাকে, যেখানে সত্য তাৎক্ষণিকভাবে অনাবিষ্কৃত থেকে যায় এবং এটা তখন উন্মোচিত হয় যখন বিপরীতমুখী মতাদর্শের সংঘর্ষ হয় এবং আমরা নিশ্চিত এই যে এই ধারণাটি সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য।

পরিশেষে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে যাকে আমরা সত্য বলে মনে করেছি সেটাই প্রকৃত সত্য। বিশেষ প্রেক্ষাপটে প্রায়ই একটি ধারণাকে সমগ্র সমাজ অসত্য বলে মনে করে এবং দমিয়ে রাখে, যা পরবর্তিতে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। যে সমাজ বর্তমানে অগ্রহণযোগ্য বলে সকল মতাদর্শকেই উপেক্ষা করার চেষ্টা করে সে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করে, কারণ বর্জিত ধারণাগুলির কোনটি যদি পরবর্তিতে সত্য বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে তার উপকার থেকে সে সমাজ বঞ্চিত হবে।

আমাদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কষ্টসাধ্য। যাই হোক যদি আমরা আমাদের আকাঙ্খা এবং লক্ষ্যকে সত্যিকার অর্থে পূরণ করতে আগ্রহী হই তাহলে কিছু সীমাবদ্ধতা আমাদের মেনে নিতে হবে এবং এতে আমাদের স্বাধীনতা খুব একটা খর্ব হবে না। যে-কোন পরিস্থিতিতে কিছু সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি বল প্রয়োগ করা না হয় তাহলে এটা আমরা বলতে পারি না যে আমাদের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে।

একথাগুলো বলে আমরা শুরু করেছিলাম যে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবস্থাই হল স্বাধীনতা। এখন এটা আমরা অনুধাবন করছি যে প্রয়োজন অনুসারে বিকল্প নির্বাচন করার সামর্থই হল স্বাধীনতা এবং যখন আমরা পছন্দ নির্বাচন করি তখন কর্ম এবং কর্মফলের দায়িত্বও আমাদের নিতে হবে। এই যুক্তিতে স্বাধীনতার অধিকাংশ প্রচারকারীরা বলেছেন যে শিশুদেরকে তাদের মা-বাবার যত্ন ও তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। আমাদের সঠিকভাবে পছন্দ নির্বাচন, যুক্তিগ্রাহ্য বিকল্প গ্রহণ এবং কর্ম ও কর্মফলের প্রতি দায়িত্ববান হওয়ার সামর্থ থাকতে হবে যা অর্জন করতে হবে শিক্ষা ও বিচার ক্ষমতা অনুশীলনের মাধ্যমে। যা সঠিকভাবে লালিত হতে পারে রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস করার মধ্য দিয়ে।

অনুশীলনী

১. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ব্যক্তির জন্য স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের জন্য স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি?

২. নেতিবাচক ও ইতিবাচক স্বাধীনতার মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে।

৩. সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য কোন্ ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজনীয়তা আছে কী?

৪. জনগণের স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

৫. মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর কী ধরনের যুক্তি সংগত বিধি নিষেধ আরোপ করা যায় বলে তুমি মনে কর? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো?

অধ্যায়-৩

সাম্য (Equality)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হল সাম্য। সাম্য হল এমন একটি আদর্শ যা ভারতের সংবিধানে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। সাম্যের ধারণা সংক্রান্ত আলোচনায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে ঃ

- সাম্য কী? আমরা কীভাবে এই নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত?
- সাম্যের আদর্শ কি সবসময় বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় প্রত্যেকের প্রতি একইভাবে আচরণ করে?
- সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং অবস্থায় কীভাবে সাম্য নীতি অনুসরণ করা যায় এবং বৈষম্যের মাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস করা যায়?
- বিভিন্ন ধরনের সাম্যের ধারণা যেমন-সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করা যায়?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সমকালীন মতাদর্শ যেমন সমাজবাদ মার্কসবাদ, উদারনীতিবাদ এবং নারীবাদ এর মত তত্ত্বগুলোর পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এই অধ্যায়ে সামাজিক বৈষম্যের বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনা ও তথ্যের বহুমুখী আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সামাজিক বৈষম্যের বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্যাবলি মনে রাখার চাইতে এর প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্যের ধারণা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? (Why does Equality Matter)

সমাজে সাম্য হল সেই বলিষ্ঠ নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ যা বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর মানুষকে উদ্দীপ্ত করে আসছে এবং দিশা নির্দেশ করছে। মানব সমাজের ইতিহাসে সকল ধর্মই বিশ্বাস করে যে সমস্ত মানুষই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে সাম্যের ধারণা এটা উপলব্দি করে যে, এই পৃথিবীতে জাতি, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা সংস্কৃতি, বংশ ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষই সমাজে সমানভাবে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ তার স্বাভাবিক মানবতাবোধ থেকে মনে করে যে, সকল মানুষই সমমর্যাদা ও সমআচরনের যোগ্য। এই আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়েই 'বিশ্বজনীন মানবাধিকার' অথবা 'মানবতার বিরুদ্ধে সহিংসতা'-এর মত বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় শ্লোগানগুলো তৈরি হয়েছে।

আধুনিককালে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে সাম্যের আদর্শকে যুগান্তকারী আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে সাম্যের আদর্শ হল রাষ্ট্র শক্তি এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান যারা সাম্য নীতির বিরোধী এবং যারা সমাজে বংশ, মর্যাদা, সম্পদ, বিশেষাধিকার ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য বজার রাখার পক্ষপাতী, তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক আপোষহীন সংগ্রাম। ফরাসি বিপ্লবীদের মূল স্লোগান ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা যার মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি জনগণ সেখানকার রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে এক যুগান্তকারী আন্দোলন সংগঠিত করে। বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামগুলোতেও সাম্যের দাবিটি উত্থাপিত হয়।

চলো এটা করি

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ থেকে এমন কতগুলো পঙ্‌ক্তি বা শ্লোক সংগ্রহ করো যেগুলোতে সাম্যের আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। এই সমস্ত পঙ্‌ক্তিগুলো নিয়ে শ্রেণিকক্ষে মতামত বিনিময় করো।

তাছাড়া সমাজে অবহেলিত দলিত সম্প্রদায় এবং নারীদের পরিচালিত আপোষহীন সংগ্রামেও একই দাবি উত্থাপন করা হয়। বর্তমানে সাম্য নীতি হল সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন একটি আদর্শ যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান এবং রাষ্ট্রীয় আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

বস্তুত পক্ষে সাম্যের চেয়ে বৈষম্যের পরিবেশই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এবং আমাদের সমাজে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের মতো দেশে বিভিন্ন শহরে আধুনিক বহুতল বাড়ির পাশাপাশি অজস্র

সমাজে প্রতিটি মানুষেরই কোনো না কোন ধর্ম বা বিশ্বাস রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মই সাম্য নীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। তাহলে সামাজে এত বৈষম্য কেন?

ঝুপড়িও দেখা যায়, বিশ্বমানের সর্বসুবিধাভুক্ত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ের পাশাপাশি এখন বহু সরকারি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে পর্যাপ্ত পানীয় জলের সুবিধা বা শৌচালয়ের অভাব রয়েছে। একটু ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় কল্যাণকামী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশ ও সমাজে কী ধরনের চূড়ান্ত বৈষম্য বর্তমান রয়েছে। সাম্যর ব্যাপারে আইন প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও আমাদের চারপাশের বাস্তবতার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

বিশ্ব ও ভারতের চলমান বৈষম্য সম্পর্কিত নীচে দেওয়া সারণি ও তথ্য বৃত্তান্তটি পর্যালোচনা করো।

বিশ্বব্যাপী বৈষম্যের বাস্তব চিত্র

১) পৃথিবীর প্রথম সারির ৫০ জন ধনী ব্যক্তির মোট আয়ের পরিমাণ, পৃথিবীর চল্লিশ (৪০) কোটি দরিদ্র লোকের মোট আয়ের পরিমাণের চেয়েও বেশি।

২) পৃথিবীর দরিদ্রতম চল্লিশ (৪০) শতাংশ জনগণ সমগ্র পৃথিবীর মোট আয়ের মাত্র পাঁচ (৫) শতাংশ অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে পৃথিবীর মাত্র দশ (১০) শতাংশ ধনী লোক সমগ্র পৃথিবীর মোট চুয়ান্ন (৫৪) শতাংশ আয়ের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে থাকে।

৩) উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পৃথিবীর সমগ্র জনগণের মাত্র পঁচিশ (২৫) শতাংশ বসবাস করে, তারাই সমগ্র পৃথিবীর ছিয়াশি (৮৬) শতাংশ শিল্প ও কলকারখানার মালিক এবং তারা সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদিত শক্তির প্রায় আশি (৮০) শতাংশ ব্যবহার করে থাকে।

৪) মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ হিসাব করলে দেখা যায় যে শিল্পোন্নত দেশগুলোর একজন নাগরিক ভারত ও চিনের মত অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উন্নয়নশীল দেশের একজন নাগরিকের চেয়ে তিনগুণ বেশি জল, দশগুণ বেশি শক্তি, তেরোগুণ বেশি লৌহ-ইস্পাত এবং চৌদ্দগুণ বেশি কাগজ ব্যবহার করে।

৫) গর্ভাবস্থায় মৃত্যুর ঝুঁকির পরিমাণ বিচার করলে দেখা যায়, যেখানে নাইজেরিয়ার মত উন্নয়নশীল দেশে প্রতি ১৮ জনে ১ জন মৃত্যুবরণ করে সেখানে কানাডার মত শিল্পোন্নত দেশে প্রতি ৮৭০০ জনের মধ্যে মাত্র ১ জনের মৃত্যু ঘটে।

৬) প্রথম বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে জ্বালানির দ্বারা উৎপাদিত কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরনের পরিমাণ বিশ্বের মোট দুই-তৃতীয়াংশ। এই দেশগুলো সমগ্র বিশ্বের সালফার এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড নিঃসরণের তিন চতুর্থাংশের জন্য দায়ী। এই সালফার এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড নিঃসরণের ফলে অম্ল (অ্যাসিড) বৃষ্টি হয়। যে সমস্ত শিল্প কারখানাগুলো সবচেয়ে বেশি দূষণের জন্য দায়ী সেইগুলোকে উন্নত দেশ থেকে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশে স্থানান্তর করা হয়েছে।

উৎস ঃ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০০৫, ইউ.এন.ডি.পি

ভারতের অর্থনৈতিক বৈষম্য

ভারতে ২০০১ সালে সংগঠিত জনগণনা সম্পর্কিত প্রতিবেদন থেকে এমন কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরা হল যেখানে পরিবার ভিত্তিক সুযোগ সুবিধার ও সম্পদের হিসাব দেওয়া হয়েছে। এখানে গ্রাম-শহরের তফাতও তুলে ধরা হয়েছে। মুখস্থ না করে এগুলো তুমি পড়ো এবং এর মাধ্যমে তোমার পরিবারের অবস্থান নির্ণয় করো।

পরিবার দ্বারা ভোগ করা উপকরণ	গ্রামীণ পরিবার	শহুরে পরিবার	বাড়ির অবস্থান অনুসারে ✗ অথবা ✓ দাও
বৈদ্যুতিক সংযোগ	৪৪%	৮৮%	
জলের পাইপ	১০%	৫০%	
স্নানাগার (বাড়িতে)	২৩%	৭০%	
টেলিভিশন সেট	১৯%	৬৪%	
দু-চাকার মোটর সাইকেল	০৭%	২৫%	
চার চাকার যান	০১%	০৬%	

বৈশ্বিক কিংবা জাতীয় ক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা বলে কী লাভ যখন আমাদের চারপাশে এত বঞ্চনা অথচ এর প্রতি কারো কোনো মাথা ব্যাথা নেই। শুধু আমার বাবার দিকে তাকাও যিনি আমার থেকে আমার ভাইকে বেশি প্রাধান্য দেন।

সুতরাং আমরা এমন এক অবস্থার মুখোমুখি যা আপাতসত্য বিরোধী: এখানে প্রত্যেকেই সাম্যের আদর্শ অনুসরণ করে অথচ প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে বৈষম্যের শিকার। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য বর্তমান। আমরা এমন একটি জটিল সামাজিক অবস্থায় বসবাস করি, যেখানে সম্পদের মালিকানার, সুযোগ সুবিধার,কাজের পরিবেশ এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে বৈষম্য বর্তমান রয়েছে। আমরা কি এই সমস্ত বৈষম্যের দ্বারা প্রভাবিত হই? সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বৈষম্যগুলো কি স্থায়ী বা অবশ্যম্ভাবী যা সমাজে অবস্থিত মানুষের মেধার, কাজ করার ক্ষমতা, আর্য সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রগতির ক্ষেত্রে বৈষম্যকে আরও বিস্তৃত করে? এই বৈষম্যগুলো কি মানুষের সামাজিক নিয়মকানুনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে? বহু বৎসর যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই সমস্ত প্রশ্নগুলো মানুষের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করে আসছে।

এই জাতীয় প্রশ্ন থেকে সাম্যের আদর্শটি বর্তমানে সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সাম্যনীতি সংক্রান্ত বহুমুখী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, সাম্য নীতির ব্যাখ্যা কী? যখন স্বাভাবিক ভাবে মানুষে মানুষে পার্থক্য বর্তমান তখন "সকল মানুষই সমান এই কথার মানে কী?" সাম্যনীতির আদর্শের দ্বারা

সাম্য

সাম্য

মানুষ কোনো ধরনের লক্ষ্যপূরণ করতে চায়? আমরা কি অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বৈষম্যের পুরোপুরি অবসান চাই? অন্য কথায়, আমরা কী ধরনের সাম্যের প্রত্যাশা করি এবং তা কাদের জন্য? সাম্যের ধারণা সংক্রান্ত আরও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত উত্থাপন ও বিবেচনা করার চেষ্টা করি, তাহলে সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকলের প্রতি কি আমরা একই আচরণ করব? সমাজ এটা কীভাবে নিশ্চিত করবে যে কোনো ধরনের সামাজিক আচরণ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বা বর্জনীয় হবে? কোন্ ধরনের নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করলে একটি সমাজ আরও বেশি সাম্যবাদী সমাজে পরিণত হবে?

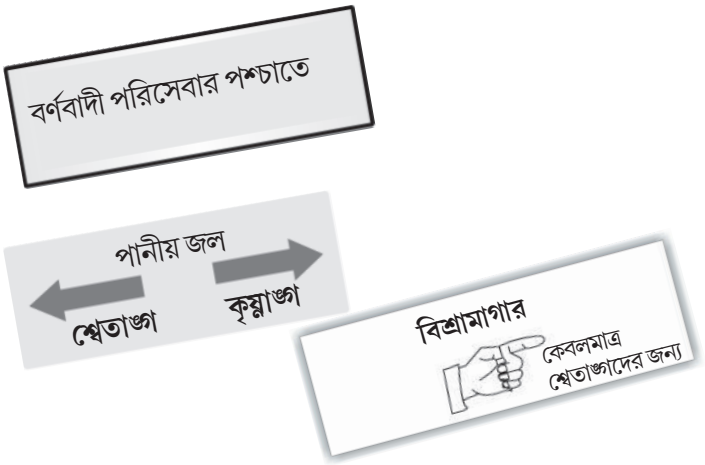

৩.২ সাম্য কী? (What is Equality ?)

নীচে দেওয়া ছবিগুলো ভালো করে লক্ষ করো।

প্রদর্শিত ছবিগুলো প্রত্যেকটিই মানুষকে জাতি ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে পৃথক করেছে। যা সাধারণভাবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই সমান মর্যাদা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক মানুষই সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো মানুষের অন্তর্নিহিত মানবসত্তায় আঘাত করে।

বস্তুতপক্ষে, সমাজে সকলের প্রতি সমান মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থা করার অর্থ এই নয় যে, মানুষ সবসময় ছোটো বড়ো সকলের প্রতি একই ধরনের ব্যবহার করবে। কোন সমাজেই সকলের প্রতি সর্বাবস্থায় একই ধরনের মর্যাদা প্রদর্শন করে না। যে কোনো সমাজের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে শ্রম বিভাজন অত্যন্ত জরুরি এবং সমাজের প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে এবং তাদের কাজের প্রকৃতি অনুসারে পুরস্কৃত করাও উচিত। কখনো কখনো বিভিন্ন

ধরনের মানুষের প্রতি এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেশের প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর প্রধান বা কোনো প্রশাসনিক আধিকারিকের জন্য বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মানুষ একে সাম্যনীতির পরিপন্থি বলে মনে করে না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই এটা আশা করেন যাতে এই সকল ব্যক্তি তাদের জন্য প্রদত্ত বিশেষাধিকারের অপব্যবহার না করে। অন্যদিকে সমাজে এমন কতগুলো বৈষম্য রয়েছে যা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন বস্তিবাসীর শিশু সন্তান বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজের কোনো মানুষই এই ধরনের বৈষম্য সহজে মেনে নিতে চায় না।

সুতরাং এই ধরনের প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, সমাজে কোন্ ধরনের বৈষম্যগুলো সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌গুলো গ্রহণযোগ্য নয়। সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো মানুষের প্রতি স্বতন্ত্র আচরণ করলে কেউ সেটা সহজে মেনে নেয় না। সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের প্রতিটি মানুষের কতগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু সকল ক্ষেত্রে মানুষ এগুলো পূরণ করতে সমানভাবে সক্ষম নাও হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত সুযোগ সুবিধাগুলো আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক বলে প্রতীয়মান হয় ততক্ষণ মনে করা হয় না যে সাম্য নীতির লঙ্ঘন করা হয়েছে। কোনো একজন সংগীত বিশারদ হতে পারেন, কিন্তু অন্যজন সেই মানের সংগীতজ্ঞ নাও হতে পারে। একজন খুব বড় বিজ্ঞানী হতে পারেন, আবার আরেকজন বিজ্ঞানের বাইরে অন্য কোনো কাজে মহান হতে পারেন কঠোর পরিশ্রম এবং অদম্য চেতনার কারণে। সাম্য নীতি অনুসরণ করার অর্থ এই নয় যে সমাজ থেকে সকল বৈচিত্রতার অবসান হয়েছে। সাম্য নীতি সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করে যে আমাদের প্রাপ্য এবং উপভোগ্য সুযোগ সুবিধাগুলো যেন পূর্ব থেকেই ধর্ম-বর্ণ-জন্ম বা অন্য কোনো সামাজিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে নির্ধারিত না হয়।

সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য (Equality of opportunities)

সাম্যের ধারণা এটা ব্যাখ্যা করে যে সামাজিক জীব হিসাবে প্রত্যেক মানুষ সমান সামাজিক সুযোগ/সুবিধা এবং অধিকার আশা করে যেখানে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে এবং তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সার্থক করতে পারে। একথার অর্থ হল, একটি সমাজে জনগণ পছন্দ এবং অগ্রাধিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে একে অপর থেকে ভিন্ন হতে পারে। মেধা এবং দক্ষতার ক্ষেত্রেও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য থাকে যার ফলে স্বনির্ধারিত পেশা বা বৃত্তির ক্ষেত্রেও একজন অন্যজন থেকে অধিক সফল হন। কিন্তু কিছু ব্যক্তি ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় কিংবা সফল আইনজীবী হওয়ার অর্থ এই নয় যে সমাজে বৈষম্য বর্তমান। অন্যভাবে বলা যায় যে সম্পদ, মর্যাদা বা সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও খাদ্য, শিক্ষা,

বাসস্থান, ও স্বাস্থ্যের মত মৌলিক চাহিদাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে চলমান বৈষম্য একটি সমাজকে সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণহীন করে তোলে।

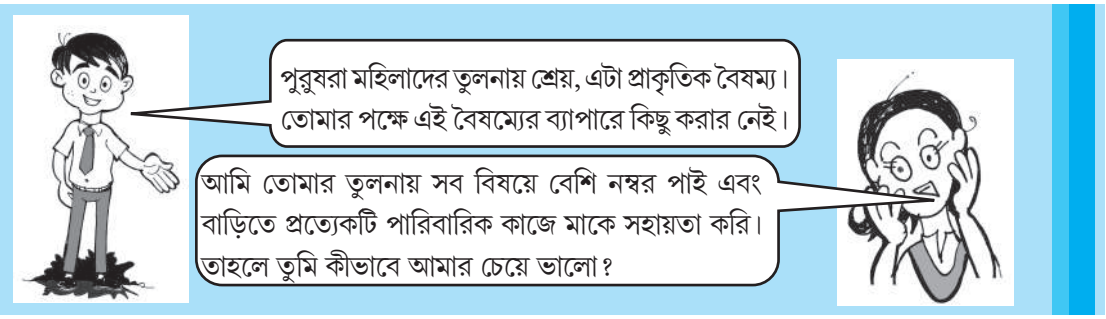

প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈষম্য (Natural and Social Inequalities)

রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক সময় এই ধরনের পার্থক্য নিরূপণ করার চেষ্টা হয় যে, প্রাকৃতিক বৈষম্য এবং সমাজ সৃষ্ট বৈষম্যের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান রয়েছে। প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বৈষম্য বলতে সেই ধরনের বৈষম্যগুলোকে বোঝায় যা ব্যক্তির নিজস্ব কাজ করার ক্ষমতা বা বুদ্ধিমত্তার জন্য সৃষ্টি হয়। এই ধরনের বৈষম্যগুলো সমাজ সৃষ্ট বৈষম্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সামাজিক বৈষম্যগুলো সৃষ্টি হয় ব্যক্তির সামাজিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং সমাজ কর্তৃক কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের ফলস্বরূপ।

স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বৈষম্য বলতে বোঝায় সেই সব বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য যা ব্যক্তি জন্মগত ভাবে অর্জন করে থাকে। সাধারণভাবে এটা মনে করা হয় যে, এই ধরনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই। সামাজিক বৈষম্য হল সেগুলো যা সমাজ দ্বারা সৃষ্টি হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কিছু সমাজ কায়িক শ্রমের পরিবর্তে বৌদ্ধিক শ্রমের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয় এবং সেই অনুসারে তাকে স্বতন্ত্র সম্মান প্রদান করে। সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতি তার জন্ম, বংশ পরিচয়, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ-জাতি ইত্যাদির ভিত্তিতে পৃথক পৃথক আচরণ করা হয়। এই ধরনের ভিন্ন আচরণ সমাজের বিশেষ মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে এবং এর কিছু অংশ আমাদের কাছে অন্যায় বলে প্রতীয়মান হয়।

এই ব্যবস্থা আমাদেরকে গ্রহণযোগ্য ও বর্জনীয় বৈষম্যমূলক আচরণগুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সহায়তা করে, যদিও সব সময় তা সুস্পষ্ট কিংবা স্বতসিদ্ধ হয় না। উদাহরণস্বরূপ দীর্ঘদিন ধরে চলমান কিছু বৈষম্যমূলক আচরণ এদের বেশির ভাগই মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে যা সে সহজে পরিবর্তন করতে পারে না। যেমন নারীদের ক্ষেত্রে মনে করা হয় তারা দুর্বল জাতি, পুরুষের তুলনায় ভীতু এবং কম মেধাসম্পন্ন। ফলে তাদের বিশেষ সুরক্ষা প্রয়োজন। সুতরাং অনেকে মনে করেন নারীদের সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত করা যুক্তিসঙ্গত। আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ

ঔপনিবেশিক শাসকরা মনে করত কৃষ্ণাঙ্গারা কম মেধাসম্পন্ন, শিশু সুলভ, মানসিক পরিশ্রমের তুলনায় শারীরিক পরিশ্রম, খেলাধুলা ও গান বাজনাতে ভালো। এই ধরনের বিশ্বাস থেকে ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা দাস প্রথার মতো প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যকে ন্যায়সংগত বলে মনে করত। কিন্তু বর্তমানে এধরনের অনুমাননির্ভর মূল্যায়ন প্রশ্নের মুখে। এখন এই ধরনের বৈষম্যগুলোকে মনে করা হয় সমাজের ক্ষমতালোভী ব্যক্তি ও জাতির দ্বারা সৃষ্ট এবং এগুলো কখনোই মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি।

এক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হল প্রাকৃতিক বৈষম্য বা জন্মসূত্র অর্জন করা বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্যগুলোকে অপরিবর্তনযোগ্য বলে মনে করা। উদাহরণস্বরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি অনেক শারীরিক দিক থেকে দিব্যাঙ্গ মানুষদের সমাজে সফলভাবে কর্ম সম্পাদন ও জীবনযাপন করতে সহায়তা করে আসছে। বর্তমানে কম্পিউটার দৃষ্টিহীনদের সহায়তা করে চলছে, হুইল চেয়ার ও কৃত্তিম অঙ্গের সাহায্যে শারিকীকভাবে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিরা উপকৃত হচ্ছে, এমনকি বিশেষ শৈল্য চিকিৎসার মাধ্যমে ব্যক্তি তার অবয়বের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারে।

পৃথিবীর বিখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং শারীরিকভাবে নড়াচড়া কিংবা কথা বলতে সক্ষম না হয়েও বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রেখে যেতে পেরেছেন। বর্তমানে অনেকের কাছে এটা অন্যায় বলে প্রতীয়মান হয় যদি দিব্যাঙ্গারা তাদের অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে সমাজ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা না পায়, অথবা প্রকৃতিগতভাবে কম সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও তাদের সফলতার জন্য বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা না হয়।

এতসব জটিলতা সামনে রেখে প্রাকৃতিক ও সমাজ সৃষ্ট বৈষম্যকে মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে সামাজিক আইন ও নীতিসমূহকে মূল্যায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। একারণেই বর্তমানে অনেক তাত্ত্বিকরা পছন্দজনিত বৈষম্য এবং পারিবারিক বা জন্মকালীন পরিবেশ জনিত বৈষম্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। এখানে বৈষম্যের দ্বিতীয় উৎসটি সাম্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা রাষ্ট্র তাত্ত্বিকরা কমিয়ে আনার বা দূর করার আশা করেন।

সাম্যের তিনটি দিক (Three Dimensions of Equality)

বর্জনীয় সামাজিক বৈষম্যগুলো বিবেচনার পাশাপাশি আমাদের এটা জানা প্রয়োজন যে, সাম্যের বিভিন্ন দিকগুলো কী কী যা আমরা সমাজে প্রত্যাশা ও অর্জন করার চেষ্টা করি। বিভিন্ন ধরনের চলমান সামাজিক বৈষম্যগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র চিন্তাবিদ ও মতাদর্শ সাম্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক । সাম্যের এই তিনটি ভিন্ন দিকের স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আমরা ন্যায় ও সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণের পথে অগ্রসর হতে পারি।

সাম্য

রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality)

একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সাম্য বলতে রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গণ্য করাকেও বোঝায়। যেমন তোমরা নাগরিকতা বিষয় নিয়ে আলোচ্য অধ্যায়ে জানতে পারবে যে সম-নাগরিকতা ভোট প্রদানের, মত প্রকাশের, চলাফেরার, সংগঠন করার এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার মত মৌলিক কিছু অধিকারকে অর্ন্তভুক্ত করে।

এই সমস্ত অধিকারগুলোকে মনে করা হয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এগুলো হল আসলে আইনগত অধিকার যা কোনো একটি দেশের সংবিধান বা আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। আমরা জানি যে কিছু পরিমাণ বৈষম্য ওই সকল দেশেও রয়েছে যারা দেশের সকল নাগরিককে সম-অধিকার প্রদান করেছে। এই সমস্ত বৈষম্য সৃষ্টির পেছনে সমাজস্থ নাগরিকদের আর্থিক ক্ষমতা, সম্পদের অসমবণ্টন বা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশেষভাবে দায়ী। একারণে সমান অধিকার সুযোগের বা 'সমস্তরীয় খেলার মাঠ' এর দাবিটি প্রায়ই সামনে চলে আসে। যদিও আমরা মনে করি যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কিংবা আইনগত সাম্য একটি ন্যায়পরায়ণ ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবে এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সামাজিক সাম্য (Social Equality)

রাজনৈতিক বা আইনগত সমতা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও তা সুযোগসুবিধা জনিত সাম্যের দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথম পদক্ষেপটি আইনগত বাধা যেমন সরকারি সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করা ও সামাজিক সুবিধাগুলো প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণের অধিকারকে অস্বীকার ইত্যাদি নির্মূলের জন্য অপরিহার্য, পাশাপাশি সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে ওই সকল সুবিধাগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমান সুযোগ লাভ করে সেই ব্যবস্থা করাও গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বৈষম্যগুলোর কুপ্রভাব হ্রাস করা এবং সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের সুস্থ জীবন যাপনের নিমিত্তে স্বাস্থ্য পরিসেবা, গুণগত শিক্ষার সুযোগ,পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য এবং মজুরির ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা প্রদান করা। এসকল সুযোগসুবিধাগুলোর অনুপস্থিতিতে সমতার ভিত্তিতে সকল নাগরিকের সমানভাবে সমাজে জীবনযাপন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। যেখানে সুযোগসুবিধার সমতা নেই, সেই সমাজে বিশাল সংখ্যক মেধাবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।

ভারতের মতো দেশে সমান সুযোগ জনিত বিশেষ একটি সমস্যা প্রয়োজনীয় সুবিধার অভাবে নয় বরং দেশের বিভিন্ন অংশে অথবা নানাহ জাতিগোষ্ঠীতে চলমান কু-অভ্যাস ও কুপ্রথার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নারীরা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করে না। বিশেষ ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে তাদের উপর সামাজিক বিধিনিষেধ থাকে

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য
(Inequalities in Educations)

নীচের সারণিতে দেওয়া শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা কি গুরুত্বপূর্ণ? এই সমস্ত পার্থক্যগুলো কি সমাজে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়েছে? নাকি এই সমস্ত পার্থক্যগুলো সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার ফল? এই জাতিভেদ প্রথা ছাড়া আর কী কী উপাদান এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলে তুমি মনে কর?

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের শহরাঞ্চলে অবস্থিত জাতি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক বৈষম্য।

জাতি/সম্প্রদায়	প্রতি হাজারে স্নাতক ব্যক্তির সংখ্যা
তপশিলি জাতি	৪৭
মুসলিম	৬১
হিন্দু-অন্যান্য পশ্চাদপদ গোষ্ঠী	৮৬
তপশিলি উপজাতি	১০৯
খ্রিস্টান	২৩৭
শিখ	২৫০
হিন্দু উচ্চবর্ণ	২৫৩
অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়	৩১৫
সর্বভারতীয় গড়	১৫৫

উৎস জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থান, ৫৫তম নমুনা সমীক্ষা, ১৯৯৯-২০০০।

যে, এর সাহায্যে অন্তত কিছু ব্যক্তি নিজেদের অবস্থাকে ভালো বা উন্নত করতে পারবে যাদের দৃঢ় সংকল্প এবং প্রতিভা রয়েছে। সমান সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য বা অসমানতা বজায় থাকতে পারে।

কিন্তু এর মধ্যে এই সম্ভাবনাও লুকিয়ে আছে যে কোনো ব্যক্তি পর্যাপ্ত প্রয়াসের মাধ্যমে সমাজে নিজের অবস্থানকেও অধিকতর উন্নত করতে পারে।

অথবা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। নারীদের প্রতি বৈষম্য, রাস্তাঘাটে কিংবা কর্মস্থলে শ্লীলতাহানি ইত্যাদি রোধে এবং শিক্ষা ও কিছু পেশার ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ প্রোৎসাহনের ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করার পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবস্থাও নিতে হবে। তবে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরাও অধিকার প্রত্যাশী মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিও তাদের সহায়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

অর্থনৈতিক সাম্য
(Economic Equality)

সহজভাবে আমরা বলতে পারি যে সমাজে ব্যক্তি বা শ্রেণির মধ্যে ধন, সম্পত্তি বা আয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান থাকে কোনো সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা পরিমাপের একটি উপায় হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রতম গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করা। অন্য আরেকটি উপায় হতে পারে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা যাচাই করা, অবশ্য সম্পদ বা আয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা সম্ভবত কোনো সমাজেই বিদ্যমান ছিল না। বর্তমানে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যক্তিকে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে এই আশার

চলো বিতর্ক করি

মহিলাদের সামরিক বাহিনীর সম্মুখ সমর ইউনিটে যোগদান এবং সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়া উচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান বর্ণবৈষম্য

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো।

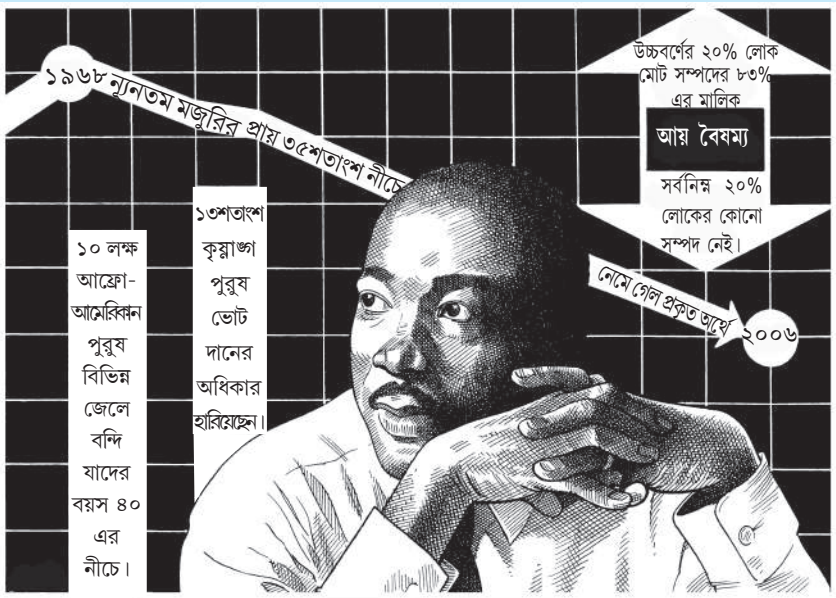

একটি বিলম্বিত স্বপ্ন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলমান বর্ণবাদ বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহ করও। আমাদের দেশে কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা কি আমেরিকার মতো বৈষম্যবাদের শিকার? এই সমস্ত বৈষম্য দূর করার জন্য মার্কিন সরকার কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে? মার্কিনিদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কি শিক্ষনীয় কিছু আছে? তারা কি আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিক্ষা নিতে পারে?

© R.J. Matson, Cagle Cartoons Inc. (13.1.2006)

সমাজের মূলে প্রোথিত বৈষম্যগুলো যা তুলনামূলকভাবে বহু প্রজন্ম ধরে পর্যালোচনার বাইরে রয়ে গেছে, সেগুলো সমাজের অন্য আরও বেশি বিপজ্জনক। কোনো সমাজে যদি নির্দিষ্ট শ্রেণির লোকেরা বিশাল সম্পদ ও ক্ষমতা বহুকাল ধরে উপভোগ করে তাহলে ওই সমাজ ধনী এবং দরিদ্র শ্রেণিতে বিভাজিত হয়। যুগ যুগ ব্যাপী চলতে থাকা এধরনের শ্রেণিবৈষম্য প্রবল সামাজিক বিক্ষোভ ও সহিংসতার জন্ম দেয়। কারণ সমাজের সম্পদশালী ও ক্ষমতাধর শ্রেণির প্রভাবের ফলে সংস্কারের মাধ্যমে মুক্ত ও সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ অত্যন্ত কষ্টকর।

বর্তমান সময়ে প্রচলিত রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হল মার্কসবাদ ও উদারনীতিবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত রাষ্ট্র দার্শনিক কার্ল মার্কস মনে করেন, সমাজে সমস্ত ধরনের বৈষম্যের উৎস নিহিত রয়েছে সমাজের অর্থনৈতিক উপাদান যেমন ভূমি, বন এবং খনিজ তৈল এর মতো প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা। মার্কসের মতে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা শুধুমাত্র একটি শ্রেণি গোষ্ঠীকে আর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী করে না, তাদের রাজনৈতিক ভাবেও ক্ষমতাশালী করে তোলে।

নারীবাদ (Feminism)

পুরুষ ও মহিলাদের সমান অধিকারের ক্ষেত্রে নারীবাদ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মতাদর্শ, নারীবাদী বলতে সেই সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের বোঝায় যারা মনে করেন, সমাজে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে চলমান যে বৈষম্যের ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে তা প্রয়োজনীয় কিংবা প্রকৃতি নির্দিষ্ট নয়। এই ধরনের লিঙ্গাগত বৈষম্য দূর করে এমন একটি স্বাধীন সমাজ গড়ে তোলা যায় যেখানে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই সমানাধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে।

নারীবাদীদের মতে যে কোনো সমাজে নারী পুরুষের মাঝে যে আপাত বৈষম্য লক্ষ করা যায় তা হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফল। পিতৃতন্ত্র বলতে এমন এক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বেশি এবং মহিলাদের উপর পুরুষদের ক্ষমতার প্রভাব স্বীকৃত। এর ভিত্তি হল এমন এক ধারণা যা প্রকৃতিগতভাবে নারী ও পুরুষকে আলাদা মনে করে, যার ফলে সমাজে নারী পুরুষের মধ্যেকার বৈষম্যকে বৈধ বলে গণ্য করে। কিন্তু নারীবাদীরা পিতৃতান্ত্রিক মতবাদীদের ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং লিঙ্গাগত ও জৈবিক পার্থক্য নিরূপণের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষদের স্বতন্ত্র ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জৈবিক কারণে একমাত্র মহিলারাই গর্ভধারণ করে এবং সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে, তাই বলে শিশুদের লালন পালন করার একমাত্র দায়িত্ব মহিলাদের এরকম যুক্তি ঠিক নয়। নারীবাদীরা মনে করে থাকেন সমাজে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে গড়ে উঠা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের জন্য দায়ী হল সমাজ, এই ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে দায়ী করা যায় না।

লিঙ্গাগত বৈষম্যভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মনে করে যে মহিলারা 'ব্যক্তিগত ও পারিবারিক' কাজের জন্য এবং পুরুষরা 'বাহ্যিক' ও পরিবারের বাইরে 'বৃহত্তর পরিসরে' কাজ করার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। কিন্তু নারীবাদীরা এই সমস্ত যুক্তি মানতে রাজী নন, তাদের মতে বর্তমানে বৃহত্তর পরিসরে পুরুষদের মত নারীরাও সমানভাবে সক্রিয়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহিলারা পরিবারের বাইরেও সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

একই সঙ্গে মহিলারা সংসারের সমস্ত কাজও অত্যন্ত সফলভাবে করে চলেছেন। কিন্তু এই দ্বিমুখী দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও মহিলারা সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার ভূমিকা রাখতে পারছে না, পারলেও তা যৎসামান্য। নারীবাদীরা বলে থাকেন পরিবার কিংবা পরিবারের বাইরের চলমান যে কোনো প্রকারের লিঙ্গ বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে।

এই ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ফলে তারা সরকারি সিদ্ধান্তকে ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে, যা গণতন্ত্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ। মার্কসবাদী ও সমাজবাদীরা মনে করেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে অন্যান্য ধরনের সামাজিক বৈষম্য যেমন সুবিধা ও বিশেষাধিকারের ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিদ্যমান সমান সুযোগসুবিধার বাইরেও আমাদের উচিত বিভিন্ন প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের উপর সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু তারা সামাজিক বৈষম্যের উৎস হিসাবে যে সমস্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সেগুলোকে নিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত।

চলো চর্চা করি

সকল ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য যা তোমার বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে লক্ষ করা যায় সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

অবশ্য মার্কসবাদ বিরোধী একটি ধারণাও পাওয়া যায় উদারবাদী তত্ত্বের মধ্যে উদারবাদীদের মতে সমাজের সহায় সম্পদের বণ্টন এবং সামাজিক সুযোগসুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে মুক্ত প্রতিযোগীদের বিকাশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের মতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মানুষের নূন্যতম জীবনধারণের নিশ্চয়তা বিধান এবং সকলের সমান সুযোগসুবিধার অধিকারও সুনিশ্চিত করতে পারে। জনগণের মধ্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকা ন্যায়পূর্ণ এবং দক্ষ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী এবং দেশের জাতীয় সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে সহায়ক। তাদের মতে সমাজের মানুষ এই সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বৈষম্য দূর করতে সমর্থ হবে এবং নিজেদের মেধা ও কর্মের ভিত্তিতে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে।

উদারনীতিবাদীদের মতে, সরকারি চাকুরির প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অত্যন্ত ন্যায়সংগত ও কার্যকরী মাধ্যম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষে বহু ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ধরনের পেশাদারি পাঠ্যক্রমে ভর্তি হতে চায় কিন্তু স্থান সংকুলানের জন্য তাদেরকে একটি চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই সমস্ত পাঠ্যক্রমে ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করতে হয়। সময়ে সময়ে দেশের সরকার এবং আদালত এই ভর্তি পরীক্ষা নির্ভুল ও নিরপেক্ষ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাছাই প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ করে থাকে যাতে দেশের সকল অংশের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। অনেক ছাত্র ছাত্রীই এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে পারে না কিন্তু এটা ঠিক যে সীমিত সংখ্যক আসন বণ্টনের জন্য এই প্রক্রিয়াকেই নিরপেক্ষ পথ বলে মনে করা হয়।

সমাজবাদ (Socialism)

রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনায় সমাজবাদ হল এমন কতগুলো রাজনৈতিক দর্শনের সমষ্টি যা সমাজে বিদ্যমান ও শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্বারা সৃষ্ট বৈষম্য অপসারণের জন্য গড়ে উঠেছে। সমাজবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত বৈষম্যকে দূর করা এবং সম্পদের সুষমবণ্টন নিশ্চিত করা। যদিও সমাজবাদের প্রবক্তারা সম্পূর্ণভাবে বাজার অর্থনীতির বিরোধী নন,তবে তারা উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারের অংশগ্রহণ এবং ন্যূনতম সামাজিক সুযোগসুবিধা যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবায় সরকারি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী।

বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ রাম মনোহর লোহিয়া ভারতীয় সমাজে প্রচলিত পাঁচ ধরনের বৈষম্য শনাক্ত করেছেন, যেগুলোর বিরুদ্ধে একসাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। এগুলি হল— নারী-পুরুষে বৈষম্য, বর্ণ ভিত্তিক বৈষম্য, জাতি ভিত্তিক বৈষম্য, উপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা দুর্বল জাতিগুলোর উপর আরোপিত এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য। বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ধারণা বলে বিবেচিত। কিন্তু লোহিয়ার সময়কালে সমাজবাদীরা বৈষম্য বলতে শুধু শ্রেণি-শোষণ ও শ্রেণিগত বৈষম্যকে বোঝাতে চেয়েছেন এবং এই শ্রেণি-বৈষম্য দূর করার জন্য শ্রেণি সংগ্রামের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে সমাজে প্রচলিত অন্যান্য বৈষম্যগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য অবসান হলে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য বৈষম্যগুলোও দূর হয়ে যাবে। লোহিয়ার মতে প্রত্যেক বৈষম্যরই একটি স্বতন্ত্র উৎস রয়েছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পন্থায় এক সাথে লড়তে হবে। তাত্ত্বিকভাবে আবার লোহিয়া 'সশস্ত্র বিপ্লবের' পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে এই পাঁচ ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে পাঁচ প্রকারের বিপ্লব পরিচালনা করা প্রয়োজন। এই তালিকার সাথে তিনি আরও দুটি বি প্লব সংযুক্ত করেছেন। যেমন ব্যক্তিগত জীবনের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ও নাগরিক স্বাধীনতার স্বপক্ষে বিপ্লব এবং অন্যটি হল অহিংসা যা একটি নিরস্ত্র সত্যাগ্রহের স্বপক্ষে বিপ্লব। লোহিয়ার মতে সমাজবাদের আদর্শ হল এই সাত প্রকারের বিপ্লব বা 'সপ্তক্রান্তি'।

সমাজতন্ত্রীদের মতে উদারবাদীরা এটা বিশ্বাস করেন না যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে। উদারবাদীদের মতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে সামাজিক বৈষম্যগুলোকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বস্তুত পক্ষে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রাজনৈতিক সাম্যের নিশ্চয়তা বিধান করে তবে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলোকে মোকাবিলা করতে হবে। বস্তুত পক্ষে উদারনীতিবাদীরা কোনো প্রকার বৈষম্যকে বিশেষ সমস্যা বলে মনে করে না। তাদের কাছে মূল সমস্যা হল ওই সকল অন্যায় ও গভীরভাবে গ্রথিত সামাজিক বিভাজন, যার ফলে সামর্থ্য বিকাশের মধ্য দিয়ে জনগণের স্বাভাবিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৩.৪ কীভাবে আমরা সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি ?
(How can we promote Equality)

সাম্যের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যাশিত উপায় অবলম্বনের ক্ষেত্রে উদারবাদী এবং সমাজবাদীদের মধ্যে আমরা কিছু মৌলিক পার্থক্য খুঁজে পেয়েছি। উভয় ধরনের মতবাদেরই

সাম্য

ভালো দিক ও সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্ক চলছে, তা সত্ত্বেও কোন্ ধরনের যুক্তি ও নীতি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তা নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে এটা বিবেচনা করা দরকার কী ধরনের সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই প্রশ্নটি সাম্প্রতিককালে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, যা আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করব।

আনুষ্ঠানিক সাম্য প্রতিষ্ঠা (Establishing Formal Equality)

সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হল অবশ্যই সমস্ত ধরনের আনুষ্ঠানিক বৈষম্য ও প্রথাগত সুযোগসুবিধা অবসান করা; বিশ্বব্যাপী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যগুলো বিভিন্ন কুপ্রথা ও আইন ব্যবস্থার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আসছে, যার ফলে সমাজের কিছু অংশ বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশাল সংখ্যক দেশে গরিব মানুষদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হত না। মহিলাদের বিভিন্ন পেশা ও কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হত না। ভারতে জাতিভেদ প্রথার কারণে নীচুজাতের মানুষদের দৈহিক পরিশ্রম ছাড়া অন্য কোনো পেশায় যুক্ত হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হত না। অনেক রাষ্ট্রে কেবলমাত্র বনেদি পরিবারের সদস্যরাই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারতো।

সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সকল প্রকারের বিধিনিষেধ ও প্রথাগত সুযোগ সুবিধার অবসান। যেহেতু চলমান বৈষম্যগুলো আনুষ্ঠানিক আইন দ্বারা সুরক্ষিত, সেহেতু সরকার এবং সংবিধান এসবের অবসানকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমাদের দেশের সংবিধানও তাই করছে। ভারতের সংবিধান ধর্ম,বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সকল প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে। আমাদের সংবিধান অস্পৃশ্যতার মতো কুপ্রথারও অবসান ঘটিয়েছে। বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক সরকার ও আধুনিক সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে সাম্যের নীতিকে গ্রহণ করেছে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্যই সেটিকে অভিন্ন আইন হিসাবে সংবিধানে যুক্ত করেছে।

স্বতন্ত্র ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা (Equality through differential treatment)

পূর্বেও এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আধুনিক কিংবা আইনগত সমতা সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট নয়। কখনো কখনো মানুষের সাথে স্বতন্ত্র আচরণ করা প্রয়োজন যাতে তাদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জন্য মানুষের মধ্যে বিদ্যমান স্বাভাবিক পার্থক্যগুলোকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, দিব্যাঙ্গধারী ব্যক্তিগণ যুক্তিসঙ্গতভাবেই সামাজিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ সিঁড়ি বা র‍্যাম্প এর ব্যবস্থা করার দাবি জানাতে পারে, যাতে তারা দালান বাড়িগুলোতে সকলের সাথে প্রবেশের সমান সুযোগ ভোগ করতে

চলো এটা করি

বিভিন্ন ধরনের দিব্যাঙ্গ শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের মত শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায় সেজন্য তাদের কী কী সুবিধা থাকা প্রয়োজন? তার একটি বিশদ তালিকা প্রস্তুত করো। তোমার বিদ্যালয়ে এই সুবিধাগুলোর মধ্যে কোন্‌টি রয়েছে?

পারে। কল সেন্টারে কর্মরত মহিলারাও কর্মস্থলে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুরক্ষার দাবি জানাতে পারে যাতে তারা কাজের অধিকার ভোগ করতে পারে। এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলো সাম্যের পথে মোটেই বাধা নয় বরং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক।

বর্তমানে প্রায় সব সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোনো ধরনের বৈষম্যগুলো সমান সুযোগসুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় স্বরূপ এবং এই সমস্ত বৈষম্য অতিক্রম করার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অনেক দেশই সকলের জন্য সমান সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সদর্থক কার্যকলাপের নীতি গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে এই ক্ষেত্রে সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে আমরা সদর্থক কার্যকলাপের ধারণা এবং এই কাঠামোর মধ্যে নির্দিষ্ট নীতিগুলোর দ্বারা উত্থাপিত কিছু বিষয় বোঝার চেষ্টা করব।

সদর্থক কার্যকলাপ (Affirmative Action)

সদর্থক কার্যকলাপ যে ধারণার উপর গড়ে উঠেছে সেটি হল, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজে সাধারণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই পর্যাপ্ত নয়। সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা অসাম্য এবং বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যকে দূর করার জন্য কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সদর্থক কার্যকলাপের বেশিরভাগ নীতিগুলো অতীত বৈষম্যের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে সংশোধন করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

এই ধরনের সদর্থক কার্যকলাপগুলোর বিভিন্ন রূপ থাকে যেমন, সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলোর উন্নতির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা, বৃত্তি প্রদান ও ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য প্রদান ইত্যাদি। আমাদের দেশে পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত গোষ্ঠীদের সমান সুযোগসুবিধা প্রদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে কোটা বা সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও এ নিয়ে বিরোধ এবং বিতর্ক রয়েছে। এ নীতির স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে বলা হয় যে, এই সকল গোষ্ঠী সামাজিক কুসংস্কার বর্জন, পৃথক্‌করণ ও বৈষম্যের শিকার। এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলো যারা অতীতে শোষিত এবং সমান সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তারা অচিরেই অন্যান্যদের সঙ্গে সমান শর্তে প্রতিযোগিতা করবে তা প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব, সামাজিক ও ন্যায়পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বার্থে তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ এবং সহায়তা প্রদান করা আবশ্যক।

সদর্থক কার্যকলাপ হিসাবে এই সমস্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলো হল সাময়িক এবং নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক। ধারণা করা হয় যে এই ধরনের বিশেষ সুযোগ সুবিধার ফলে পিছিয়ে পরা শ্রেণিগুলোও বিদ্যমান বঞ্চনাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে এবং তার পরেই অন্যদের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হয়ে উঠবে। যদিও সদর্থক কার্যকলাপের নীতি সমাজকে আরও সাম্যভিত্তিক করার পক্ষে। কিন্তু অনেক তাত্ত্বিকরাই এর বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করেন। তারা প্রশ্ন তুলেন যে মানুষের সাথে ভিন্ন আচরণ কি বৃহত্তর সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায় কিনা।

সদর্থক বৈষম্যনীতি বিশেষ করে সংরক্ষণ নীতির সমালোচকগণ এই সব নীতির বিরুদ্ধে তর্ক করার জন্য সাম্যের নীতির আশ্রয় নেন। তারা যুক্তির সাহায্যে এটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যে, পিছিয়ে পড়াদের জন্য উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ ও চাকুরিতে সংরক্ষণ বা কোটা ব্যবস্থা অযৌক্তিক, কারণ এটি ইচ্ছাকৃতভাবে সমাজের অন্যবর্গকে সমান আচরণ পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সমালোচকদের মতে, সংরক্ষণ নীতি এক ধরনের বিপরীত বৈষম্য কারণ সাম্যের প্রত্যাশা হল সকলের প্রতি সম আচরণ করা। সাম্য নীতি অনুসারে সমাজের সকলের প্রতি একই ধরনের আচরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু যখন আমরা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জাতি

বা বর্ণের ভিত্তিতে পার্থক্য করি তখন আমরা পুনরায় জাতি ও বর্ণ ভিত্তিক কুসংস্কারকে শক্তিশালী করে তুলি। তাত্ত্বিকদের মতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমাজকে বিভক্ত করে এমন সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে সমাপ্ত করা।

এই বিতর্কের প্রেক্ষাপটে এটা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ব্যক্তির সমান অধিকার ও রাষ্ট্রের পথ নির্দেশক নীতি হিসাবে সাম্যের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করা। প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং সরকারি চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান অধিকার রয়েছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। কখনো কখনো কম সংখ্যক আসনের কারণে বা চাকুরির জন্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে পারে। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী যাদের মাতা পিতা বা পূর্বপুরুষ নিরক্ষর, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিস্থিতি অন্য শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভিন্ন। দলিত, মহিলা, বঞ্চিত শ্রেণি অথবা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিবর্গ বিশেষ সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। এটি প্রদানের জন্য রাষ্ট্রকে অবশ্যই সামাজিক নীতি তৈরি করতে হবে যা ওইসকল ব্যক্তিবর্গকে সাম্য প্রদান করবে এবং অন্যদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যায্য সুযোগ দেবে।

চলো বিতর্ক করি

তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সদর্থক কার্যকলাপ গ্রহণ করা উচিত।

প্রকৃত সত্য হল এই যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারত তার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনের চেয়েও অনেক কম কাজ করেছে। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় চলমান বৈষম্য হল এই যে, প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার অথবা শহুরে বস্তিবাসী অনেক ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যারা বিদ্যালয়ে কোনোমতে প্রবেশ করে তারাও বেসরকারি বনেদী বিদ্যালয়ের তুলনায় নূন্যতম সুযোগ সুবিধাও ভোগ করতে পারে না। যে সফল বিদ্যমান বৈষম্যের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে, সে সকল বৈষম্য তাদের প্রত্যাশিত যোগ্যতামান অর্জন কিংবা কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও বাধার সৃষ্টি করে। কিছু ক্ষেত্রে এসকল ছেলেমেয়েরা পেশাভিত্তিক বনেদী বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়, কারণ অর্থের অভাবে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিতে পারে না। তাছাড়া ওই সকল বিদ্যালয়ের বৃত্তিমূলক কোর্সগুলোতে ভর্তি কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রবেশমূল্যও বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের নাগালের বাইরে। ফলশ্রুতিতে এরা কখনোই বিশেষভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের সাথে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে না।

এই ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সমান সুযোগসুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। বর্তমানে বেশিরভাগ রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরাই এই সত্যটি স্বীকার করে। তারা সমান সুযোগের লক্ষ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করে না বরং তা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। রাষ্ট্রের কি উচিত

বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আসন সংরক্ষণ করা, অথবা তাদের কি বিশেষ সুবিধা পাওয়া উচিত যাতে ছোটো বেলা থেকেই তারা মেধা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে? কারণ বঞ্চিত এটা আমরা কীভাবে নির্ধারণ করব? বঞ্চিতদের চিহ্নিত করতে আমরা কি কোনো অর্থনৈতিক মানদণ্ড ব্যবহার করব? অথবা আমরা কি জাতিভেদ প্রথার দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীদের চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করব? সামাজিক নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট এই প্রশ্নগুলো নিয়ে বর্তমানে বিতর্ক চলছে। সর্বোপরি সমাজকে আর বেশি সাম্যবাদী কিংবা সর্বজনগ্রাহ্য করতে হলে রাষ্ট্র দ্বারা প্রণীত নীতিগুলোকে তাদের সফলতার নিরিখে বিচার করতে হবে।

সাম্য বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রত্যেকের সাথে অভিন্ন আচরণ করা এবং প্রত্যেকের সাথে সমআচরণ করার মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটা বুঝতে হবে। এখানে পরবর্তী আচরণটি স্থান-কালভেদে ভিন্ন হতে পারে, তবে এই সবক্ষেত্র মৌলিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সাম্যের বিকাশ। কারোর প্রতি বিশেষ আচরণ করার ক্ষেত্রে সাম্যের লক্ষ্যটি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং এই ধরনের আচরণের প্রেক্ষিতে বৈধতা এবং বিশেষ সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেহেতু সম্প্রদায়ভিত্তিক ভিন্ন আচরণ জাতিভেদ কিংবা বর্ণবাদী প্রথার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল তাই উদারবাদী রাষ্ট্র চিন্তাবিদগণ অভিন্ন আচরণের নিয়ম থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

চলো চিন্তা করি

নীচের অবস্থাগুলো বিবেচনা করো। নিম্নোক্ত কোনো অবস্থাতে বিশেষ কিংবা ভিন্ন আচরণ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়?

- কর্মরত মহিলাদের মাতৃত্বাকালীন ছুটি পাওয়া উচিত।
- একটি বিদ্যালয়ের উচিত দু-জন দৃষ্টিগত দিব্যাঙ্গ বিদ্যার্থীর জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি ক্রয় করার নিমিত্তে অর্থ ব্যয় করা।
- গীতা বাস্কেট বল খেলতে দক্ষ। সুতরাং বিদ্যালয়ের উচিত একটি বাস্কেট বল কোর্ট নির্মাণ করা যাতে সে তার দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে।
- জিৎ এর বাবা মা চায় সে বিদ্যালয়ে পাগড়ি পরিধান করুক এবং ইরফানের বাবা মা চায় সে শুক্রবারে বিশেষ নামাজ বা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করুক। সুতরাং ক্রিকেট খেলার সময় হেলমেট পরার জন্য জিৎকে বাধ্য করা উচিত নয় এবং ইরফানের শিক্ষকের উচিত নয় শুক্রবারে অতিরিক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য তাকে বাধ্য করা।

সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীবাদী আন্দোলনকারীরা এই ধরনের অনেক বিশেষ উত্থাপন করেন। উনিশ শতাব্দীতে নারী সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বহু সংগ্রাম পরিচালনা করে। তাদের দাবিগুলো ছিল যেমন— ভোটদানের অধিকার, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার অধিকার এবং পুরুষদরে মতো কর্ম সংস্থানেও সম অধিকার। বস্তুত কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর মহিলারা অনুধাবন করতে লাগলেন যে এই অধিকার ভোগ করতে গেলে তাদের বিশেষ সুবিধার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, মাতৃত্বকালীন ছুটি বা কর্মস্থলে শিশুর যত্ন সুরক্ষার ব্যবস্থা। এই ধরনের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছাড়া তারা পেশাদারি কিংবা পারিবারিক জীবনে সফল হতে পারবে না। অন্য কথায়, পুরুষের মতো সফল কিংবা সমঅধিকার ভোগী হতে গেলে কখনো কখনো তাদের প্রতি বিশেষ আচরণ প্রদর্শন করা প্রয়োজন। যেহেতু আমরা সাম্য বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহী এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন আচরণ অপরিহার্য কিনা সে ব্যাপারে পর্যালোচনা করি সেহেতু প্রতিনিয়তই আমাদের উচিত নিজেদের জিজ্ঞাসা করা যে, সমাজে নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠী বাকি অংশের সাথে সমঅধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে এই বিশেষ আচরণ সত্যিকার অর্থেই আবশ্যক কিনা। বস্তুত এক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে বিশেষ বা ভিন্ন আচরণ প্রাধান্য বিস্তার কিংবা নিপীড়নের নতুন কোনো কাঠামো সৃষ্টি না করে। অথবা এই সুযোগে প্রভাবশালী কোনো জনগোষ্ঠী সমাজে অযাচিত ক্ষমতা ও সুবিধার মালিক না হতে পারে। ভিন্ন আচরণের প্রত্যাশা এবং এর বৈধতা হল ন্যায়পূর্ণ ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সাম্য

অনুশীলনী

১) সমাজে কিছু মানুষ মনে করেন বৈষম্য হল প্রকৃতি নির্দিষ্ট, আবার কিছু মানুষ মনে করেন সাম্যই হল স্বাভাবিক, সমাজে যে বৈষম্য দেখা যায় তা সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট। কোনো যুক্তিকে তুমি সমর্থন করো এবং কেন, তার কারণ দর্শাও?

২) একটি ধারণা মতে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা কখনো সম্ভব নয় এবং এটা কাম্যও নয়। তাদের যুক্তি হল একটি সমাজ খুব বেশি হলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান ক্রমশ হ্রাস করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। তুমি কি এই মত সমর্থন করো?

৩) নীচে দেওয়া ধারণাগুলোর সাথে যথাযথ উদাহরণগুলো মেলাও—

ক) সদর্থক কাজ	১) প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে।
খ) সুযোগের ক্ষেত্রে সাম্য	২) বয়স্ক নাগরিকের জন্য ব্যাংক বেশি সুদ প্রদানের ঘোষণা করে।
গ) সমান অধিকার	৩) প্রত্যেক শিশুর জন্য অবৈতনিক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৪) সরকারি একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা বাজার থেকে তাদের ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় না। সুতরাং ওই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে ফসলের পর্যাপ্ত মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা করবে। এই সুপারিশ কি সাম্য নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ?

৫) নীচে দেওয়া কোন্ বক্তব্যগুলো সাম্য নীতির পরিপন্থী?

ক) বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে প্রত্যেক শিশু পালা করে নাটকের অংশটি পাঠ করবে।

খ) কানাডার সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের সে দেশে স্থানান্তর হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে।

অনুশীলনী

সাম্য

অনুশীলনী

গ) রেল বিভাগ কর্তৃক বয়স্ক নাগরিকদের জন্য পৃথক সংরক্ষিত কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘ) কিছু কিছু বনাঞ্চলে প্রবেশের অধিকার নির্দিষ্ট কিছু উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।

৬) নীচে মহিলাদের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে কিছু যুক্তি দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনটি সাম্যনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও?

ক) মহিলারা হল মাতৃজাতি, সুতরাং ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে আমরা তাদের অসম্মান করব না।

খ) সরকারি সিদ্ধান্তগুলো পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও প্রভাবিত করে। সুতরাং সরকার গঠনে তাদেরও নিজস্ব মতামত থাকা উচিত।

গ) মহিলাদের ভোটাধিকার না দেওয়া হলে পারিবারিক সংহতি বিনষ্ট হবে।

ঘ) মানবজাতির অর্ধেক হল মহিলা, ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে সুদীর্ঘকাল ধরে তুমি তাদের দমিয়ে রাখতে পারো না।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক ন্যায় (Social Justice)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সহমর্মিতা কিংবা স্নেহের বিভিন্ন রূপ রয়েছে আর এগুলোর ব্যাখ্যা করা খুব একটা সহজ নয়। কিন্তু আমরা সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি, একইভাবে ন্যায়ের ক্ষেত্রে আমাদের একটি সহজাত বোধ থাকে, যদিও আমরা একে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি না। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ন্যায় এর ধারণাকে অনেকটা সহমর্মিতার ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রসঙ্গত, সহমর্মিতা এবং ন্যায় উভয়ের প্রবক্তারাই এই বিষয় সম্পর্কে আবেগপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। সহমর্মিতার মতো ন্যায় সম্পর্কে সকলেই সদর্থক ধারণা পোষণ করে থাকেন। সকলে আশা করেন যাতে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকেই নিজের জন্য এবং সমাজের সকলের জন্য ন্যায় চান। কিন্তু সহমর্মিতা সীমিত থাকে শুধুমাত্র ব্যক্তি মানুষ যার সঙ্গে পরিচয়জনিত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ন্যায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তা সমগ্র সমাজের মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত । ন্যায়ের ধারণাটি সমাজের মানুষের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন এবং সেই সমস্ত নিয়ম-নীতির সমষ্টি যার সাহায্যে সমাজের সকলের মঙ্গল সাধিত হয় ও যার দ্বারা সমাজের মানুষ তার দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় এবং ব্যক্তি মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়। সেজন্যই ন্যায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়।

এই অধ্যায়টি বিস্তৃতভাবে পাঠ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা যাবে:

- ন্যায় সম্পর্কে এমন কিছু সাধারণ নীতি অনুসন্ধান করা যাবে যেগুলো বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- বণ্টনমূলক ন্যায় বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা ।
- জন রল্‌স (John Rawls) এর যুক্তিটির ব্যাখ্যা, সেখানে বলা হয়েছে যে সমাজের সকল সদস্যের স্বার্থেই একটি সুস্থ ও ন্যায়পরায়ণ সমাজের প্রয়োজন, যে সমাজে স্বার্থগুলো যুক্তির উপর ভিত্তি করে সুরক্ষিত হয়।

সামাজিক ন্যায়

৪.১ ন্যায় বিচার কী ? (WHAT IS JUSTICE?)

সমস্ত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য ন্যায় এর ধারণাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে থাকে, যদিও বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্নভাবে ন্যায়ের ধারণাটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন ভারতে ন্যায় বলতে ধর্মকে বোঝানো হয়েছে, অথবা একটি ন্যায়ভিত্তিক সামাজিক শৃঙ্খলাকে বোঝানো হয়েছে। প্রাচিন ভারতে মনে করা হত রাজার প্রাথমিক দায়িত্ব হল ধর্মভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা। চীনের বিখ্যাত দার্শনিক কনফুসিয়াস (Confucius), যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে, রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মধ্য দিয়ে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন। খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে এথেন্সের (গ্রিস) বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো "দি রিপাবলিক' (The Republic) গ্রন্থে ন্যায় সংক্রান্ত ধারণাটি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সক্রেটিস এবং তাঁর তরুণ বন্ধুরা যেমন গ্লাকোন (Glaucon) এবং এ্যাডিমেন্টাস (Adeimantus) এর মধ্যে দীর্ঘ আলাপচারিতার মাধ্যমে প্লেটো পরীক্ষা করেছিলেন কেন আমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। সক্রেটিসের কাছে তাঁর তরুণ বন্ধুরা জানতে চেয়েছেন আমাদের ন্যায়পরায়ণ কেন হতে হবে ? তারা এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে সমাজে যারা দুষ্টলোক এবং ন্যায় বিরোধী তারা সমাজের ন্যায়পূর্ণ সৎ ব্যক্তির চাইতে ভালো জীবন-যাপন করতে পারে। যারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন পরিবর্তন করে, কর প্রদান থেকে বিরত থাকে এবং মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তারা ন্যায়পরায়ণ ও সৎ ব্যক্তিদের থেকে প্রায়ই সফল হয়। যদি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে রাষ্ট্রের আইনকে ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধার করা যায় তাহলে মনে হতে পারে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার চাইতে অসৎ ও দুষ্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়া অনেক বেশি মঙ্গালজনক। বর্তমান সময়েও অনেক মানুষের মধ্যে অনুরূপ ধারণা লক্ষ করা যায়।

> তারা এইটা বলে থাকেন যে অন্যায় করা প্রকৃতিগতভাবে ভালো, অন্যায়ের জন্য কষ্ট ভোগ করা মন্দ। কিন্তু এই মন্দ ভালো থেকেও মহান। এইজন্য ব্যক্তি যখন অন্যায় করে ও অন্যায় সহ্য করে পাশাপাশি উভয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং যখন একটিকে এড়াতে কিংবা অন্যটিকে অর্জন করতে পারে না, তখন তারা চিন্তা করে দুটির মধ্যে কোনোটিরই অভিজ্ঞতা না পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে ভালো হত। আর এখান থেকেই সৃষ্টি হয় আইন এবং পারস্পরিক চুক্তি। সুতরাং যা কিছু আইনের মাধ্যমে করা হয় তাকেই আইনসঙ্গাত ও ন্যায়পূর্ণ বলা হয়। (গ্লাকোন ও সক্রেটিসের কথোপকথন দি রিপাবলিক)।

সক্রেটিস এই তরুণদের এটা স্মরণ করিয়ে দেন যে, যদি সমাজে প্রত্যেকেই অসৎ ও অন্যায়কারী হয় এবং এরা যদি নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য রাষ্ট্রীয় আইনকে অমান্য করার চেষ্টা করে, তাহলে সমাজে প্রকৃত পক্ষে কেউই এই অন্যায়ের দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। ফলে কেউ নিরাপদে থাকবে না এবং সবার ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং দীর্ঘকালীন স্বার্থ সুরক্ষার জন্য প্রত্যেককেই ন্যায়পরায়ণ হওয়া ও আইন মেনে চলা প্রয়োজন। সক্রেটিস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে, মানুষের এইটা স্পষ্ট

সামাজিক ন্যায়

ভাবে বোঝা দরকার ন্যায় কী এবং ন্যায়পথে চলার প্রয়োজনীয়তা কী। তাঁর মতে ন্যায় শুধুমাত্র বন্ধুদের প্রতি উপকার করা এবং শত্রুর ক্ষতি সাধন করা নয়। অথবা নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা নয়। ন্যায় সমাজস্থিত সকল মানুষের কল্যাণের চিন্তা করে, যেমনভাবে একজন ভালো চিকিৎসক সবসময় তার রোগীদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে থাকেন তেমনি একজন ভালো শাসক বা সরকার সবসময় তার অধীনস্থ সকলের কল্যাণের কথা চিন্তা করবেন। সমাজস্থ সকল মানুষের কল্যাণ বলতে বোঝায়, সমাজের প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দেওয়া। ন্যায় হল প্রত্যেক মানুষকে তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দেওয়া যা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটেও অনেকে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেকের যা প্রাপ্য তার ধারণাটি প্লেটোর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে মানুষের ন্যায় সম্পর্কিত ধারণাটি সমাজের প্রত্যেক মানুষের পাওনা সম্পর্কিত। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতে, মানব সমাজ কতকগুলো মর্যাদার অধিকারী যদি সকলকে ওইসব মর্যাদা প্রদান করা হয় তখনই বোঝা যাবে যে সমাজের কাছে প্রত্যেকের 'পাওনা' কথাটির অর্থ হল নিজেদের মেধা বিকাশ এবং ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া।

সমকক্ষ লোকের প্রতি সম আচরণ (Equal Treatment for Equals)

যদিও এব্যাপারে একটা সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত হল এই যে বর্তমান সমাজের সকল মানুষের সমান গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। এই বিষয়টি নির্ণয় করা সহজ নয় যে, প্রত্যেক মানুষকে তার ন্যায্য প্রাপ্য কীভাবে প্রদান করা হবে। এই ব্যাপারে রাজনৈতিক তত্ত্বে বিভিন্ন নীতি প্রচলিত রয়েছে। এরূপ একটি নীতি হল সমকক্ষ লোকেদের প্রতি সমান আচরণ করা। মনে করা হয় যে ..... মানুষের মধ্যে কতকগুলো সমান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। যার কারণে তারা সমান অধিকার এবং সমান মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। বর্তমান উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিছু অধিকার ও স্বাধীনতা অনুমোদন করা হয়। প্রথমত, পৌর অধিকার যেমন -বাঁচার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার, দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অধিকার যেমন- ভোটদানের অধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার এবং তৃতীয়ত বিভিন্ন সামাজিক অধিকার যেমন- সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার, সমান মর্যাদা লাভের অধিকার, সামাজিক বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার ইত্যাদি।

সমানাধিকারের পাশাপাশি সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সম মর্যাদার অধিকার রক্ষার জন্য এইটা প্রয়োজন যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে যাতে মানুষে মানুষে বৈষম্য না করা হয়। প্রত্যেক মানুষকেই তার কাজ এবং পেশার ভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং কখনোই কোন ব্যক্তিকে তার বংশ পরিচয়ের সাহায্যে বিবেচনা করা উচিত নয়। সুতরাং যদি দুটি ভিন্নজাতির দুজন ব্যক্তি একই কাজ করে থাকেন যেমন পাথর ভাঙা বা পিজা সরবরাহ করা তাহলে দুজনকেই

এই কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান করা উচিত। যদি এক্ষেত্রে দেখা যায় একই কাজের জন্য দুটি পৃথক জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় একজনকে (১০০) একশো টাকা এবং অন্যজনকে (৭০) সত্তর টাকা মজুরি প্রদান করা হয়েছে, তবে এই কাজটি অত্যন্ত অনুচিত এবং অন্যায় হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। অনুরূপভাবে যদি কোনো বিদ্যালয়ে একজন পুরুষ শিক্ষকের মজুরি একজন মহিলা শিক্ষিকার থেকে বেশি হয় তাহলে সেটাও সাম্য নীতির পরিপন্থী এবং অন্যায় বলে ধরে নিতে হবে।

সমানুপাতিক ন্যায় (Proportionate Justice)

সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সমান আচরণের নীতিই ন্যায়ের একমাত্র সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। সমাজস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কিছু অবস্থা বিরাজমান রয়েছে যেখানে প্রত্যেক মানুষের প্রতি একই ধরনের আচরণ করা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই সমান নম্বর দেওয়া হবে, এই কারণে যে তারা সবাই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণিতে পড়ে এবং একই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তাহলে তখন তোমাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে ? এক্ষেত্রে দেখা যায়, ন্যায় তখনই হবে যখন প্রত্যেক ছাত্রকে তার পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা ওই পরীক্ষার জন্য কী ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে তা যাচাই করা হয়। অন্য কথায় যদি কেউ সমান অধিকারের একই রেখা থেকে শুরু করে তখন ন্যায় এর অর্থ দাঁড়াবে জনগণকে তাদের প্রচেষ্টার গুণগতমান অনুসারে পুরস্কৃত করা। যদিও বেশিরভাগ মানুষই মনে করে যে সম কাজের জন্য সমবেতন পাওয়া উচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজের ধরন, এর জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা, পারদর্শিতা, ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে এবং এর শ্রেণি বিভাগ করে সেই অনুপাতে যদি বিভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণে মজুরি নির্ধারণ করা হয় তাহলে তা ন্যায়পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। আমরা যদি এই ধরনের মানদণ্ড ব্যবহার করি, তাহলে দেখতে পাব যে সমাজে কোনো বিশেষ শ্রমিকদের নির্ধারিত কাজের জন্য প্রাপ্য মজুরি প্রদান করা হয় না, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন খনি শ্রমিক বা দক্ষ কারিগর কিংবা একজন মিস্ত্রিকে অনেকটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। একজন পুলিশ কর্মী দিন-রাত খেটেও সমাজের অন্যান্য পেশার লোকদের মত ন্যায্য বেতন পান না বা সেই পরিমাণ বেতন দাবি করতে পারেন না। তাই সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সম আচরণের নীতির পাশাপাশি সমানুপাতিক নীতির সামঞ্জস্য বিধান করা একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষ চাহিদার স্বীকৃতি (Recognition of Special Needs)

ন্যায় সম্পর্কিত তৃতীয় নীতিটি হল ব্যক্তির ন্যায্য পাওনা ও কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজস্থিত মানুষের বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করার স্বীকৃতি। এই নীতিকে সামাজিক ন্যায় কার্যকর করার

সামাজিক ন্যায়

সামাজিক ন্যায়

একটি বিশেষ উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমাজের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা এবং অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায় তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সমাজস্থিত সকল মানুষের প্রতি সমান আচরণ করা হবে। কিন্তু সমাজে মানুষের প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ না করা বা মানুষের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা অনুসারে তার ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করাই

চলো চিন্তা করি

নীচের পরিস্থিতিগুলো যাচাই করো এবং আলোচনা করো এগুলো ন্যায় ভিত্তিক কিনা। প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তির সাহায্যে বিচার করার চেষ্টা কর যে এই সব পরিস্থিতিতে ন্যায় এর কোন্ সিদ্ধান্তটি গ্রহণযোগ্য।

- সুরেশ একজন দৃষ্টিজনিত দিব্যাঙ্গাধারী ছাত্র, তাকে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় প্রদান করা হয়েছে তার অংক পরীক্ষার উত্তর সম্পূর্ণ করার জন্য, যেখানে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল তিন ঘন্টা।
- গীতা খুঁড়িয়ে হাঁটে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় সিদ্ধান্ত নিলেন যে গীতাকে তার অংক পরীক্ষার উত্তর সম্পূর্ণ করার জন্য সাড়ে তিন ঘন্টা সময় বরাদ্দ করা হবে।
- একজন শিক্ষক সিদ্ধান্ত নিলেন যে শ্রেণি কক্ষের দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবল বৃদ্ধি করা জন্য কিছু অতিরিক্ত নম্বর প্রদান করা হবে।
- একজন অধ্যাপক শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীকে ভিন্ন ভিন্ন মানের প্রশ্নপত্র প্রদান করলেন।
- এই ধরনের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে যে সংসদের উভয় কক্ষে ৩৩ শতাংশ আসন শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে।

সামাজিক ন্যায়ের জন্য যথেষ্ট নয়। এই ধরনের সমাজকে ন্যায় ভিত্তিক সমাজ বলা যায় না। সমাজস্থিত মানুষের বিশেষ চাহিদা পূরণের নীতি সম আচরণের নীতির সঙ্গে সবসময় এতটা বিরোধপূর্ণ হয় না যতটা মনে করা হয়। কারণ সমপর্যায়ভুক্ত লোকদের প্রতি সম আচরণের নীতিটি এটাও ব্যাখ্যা করে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে যদি কোনো লোক সমপর্যায়ভুক্ত না হয়, তাহলে তার প্রতি ভিন্নভাবে আচরণ করা যাবে।

শারীরিক দিক থেকে অন্যভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ চাহিদার প্রয়োজন রয়েছে। এই অবস্থা বিবেচনা করে তাদের জন্য বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে সবসময় একটা বিতর্ক থেকে যায় যে, ব্যক্তির কোন্ কোন্ বিশেষ অক্ষমতার জন্য কী ধরনের সাহায্য প্রদান করা উচিত। পৃথিবীর অনেক দেশেই শারীরিক অক্ষমতা, বয়স, শিক্ষালাভের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকা বা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যের সুবিধা না পাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একদিকে মানসম্মত ও বিপুল সুযোগ সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে কল্যাণকর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলোকে সর্বক্ষেত্রে যদি সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে সেই সমাজ বৈষম্যমূলক ও ন্যায় পরায়ণহীন সমাজে পরিণত হতে বাধ্য।

সামাজিক ন্যায়

আমাদের দেশে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব বা উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিসেবা বা এই ধরনের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অভাব প্রায়শই বর্ণভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে জড়িত থাকে। সুতরাং ভারতের সংবিধানে তফশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সরকারি কর্মসংস্থান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

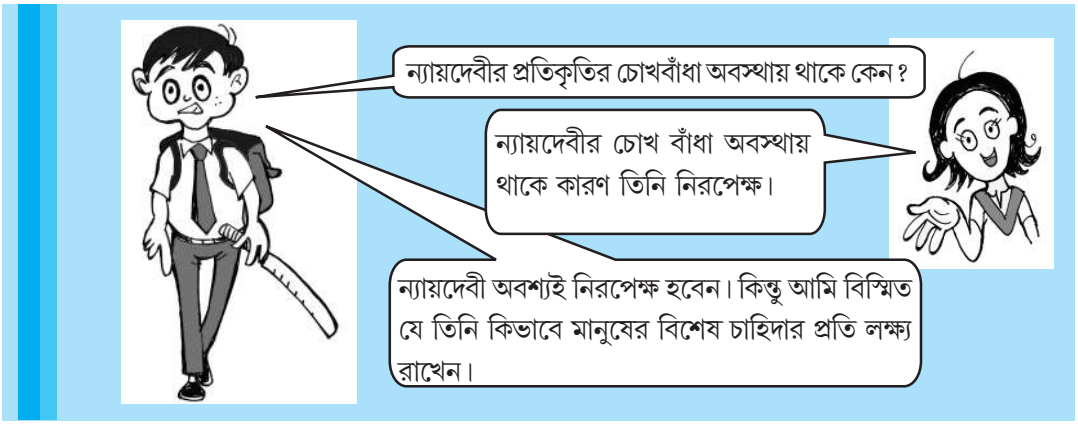

উপরে সামাজিক ন্যায় সংক্রান্ত বিশ্লেষিত নীতিগুলো এটাই ইঙ্গিত করে যে, অনেক সময় সরকারের পক্ষে উল্লেখিত তিন প্রকারের নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রায় অসম্ভব। এই নীতিগুলো হল - সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সম আচরণ করা, কোনো ব্যক্তির ন্যায্য প্রাপ্য বা মূল্য প্রদান করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব যোগ্যতা বা পারদর্শিতা ইত্যাদি বিচার করা এবং দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়াদের জন্য একটি ন্যূনতম জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও তাদের জন্য সমান সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান করা ইত্যাদি। সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সম আচরণের নীতি অনুসরণ করতে গেলে অনেক সময় তা মেধাভিত্তিক যোগ্যতা ও সম্মান প্রদানের নীতির বিরোধী হয়ে ওঠে। যদি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করা ন্যায়ের মূল সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় পিছিয়ে পড়া মানুষদের অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা, কারণ তারা উন্নত পরিবেশ ও শিক্ষার মতো সুযোগ সুবিধাগুলো পায় না। একটি দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী তাদের পছন্দ অনুযায়ী ন্যায় সম্পর্কিত নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমর্থন কিংবা গ্রহণ করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের দায়িত্ব হল ন্যায় সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালাগুলোর সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে একটি ন্যায় সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৪.২ ন্যায্য বণ্টন (Just Distribution)

যে কোনো সমাজে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারকে লক্ষ রাখতে হয় যাতে দেশের প্রচলিত আইন এবং নিয়ম-নীতিগুলো সমাজে সকল ব্যক্তির প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য হয়। এর জন্য সমাজস্থিত সকল ব্যক্তির মধ্যে বস্তু ও সেবার ন্যায্য বণ্টন করাও প্রয়োজন। এই বন্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রভিত্তিক সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগতও হতে পারে। যদি কোনো সমাজ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত

সামাজিক ন্যায়

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বর্তমান থাকে, তাহলে সমাজের যে প্রয়োজনীয় সম্পদ রয়েছে তা এমনভাবে পুণর্বণ্টন করা প্রয়োজন যাতে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নাগরিকরা সমান সুযোগ-সুবিধার অংশীদার হতে পারে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যেকোনো দেশ বা রাষ্ট্রেসামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করাই পর্যাপ্ত নয়, বরং দেশের প্রচলিত আইন তথা নিয়ম কানুনও সমানভাবে বলবৎ হওয়া প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, তার জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ন্যূনতম জীবন যাত্রার মান বজায় রাখার পর্যাপ্ত সুযোগ । প্রত্যেকেই তার উদ্দেশ্যগুলো অনুসরণ এবং নিজেকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে যাতে সক্ষম হয়, সেই জন্যই এটি খুব প্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ ভারতের সংবিধানের কথা বলা যায়, যেখানে সমস্ত ধরনের অস্পৃশ্য আচরণকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নবর্ণের লোকদের মন্দিরে প্রবেশ, সরকারি চাকুরি এবং মৌলিক প্রয়োজনীয়তা যেমন-পানীয় জল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন অঙ্গারাজ্যগুলোও ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাতে ওই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে।

সমাজস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোথায়, কীভাবে দেশের সম্পদের বণ্টন বা পুণর্বণ্টন করা হবে এবং সমাজে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করা হবে বা সরকারি চাকুরির বণ্টন করা হবে এই নিয়ে ভিন্ন মতের উদ্ভব ঘটে এবং কখনো কখনো তা সমাজস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চূড়ান্ত আবেগের সৃষ্টি করে যা অনেক সময় সমাজে তা হিংসাত্মক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করে, আর এই ধরনের একটা ভয়ানক পরিস্থিতিতে মানুষ এটা বিশ্বাস করতে থাকে যে তাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের প্রথমেই এটা মনে হতে পারে যে, কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বা সরকারি চাকুরিতে সংরক্ষণের বিরোধিতা করে দেশে হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল। রাজনৈতিক তত্ত্বের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে ন্যায় এর সিদ্ধান্তের ধারণার নিরিখে এই বিষয়টি অত্যন্ত শান্তভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করতে হবে। অনগ্রসর শ্রেণির সহায়তার জন্য যে প্রকল্প রয়েছে সেগুলো কি ন্যায়তত্ত্বের ভিত্তিতে ন্যায় সঙ্গত বলে বিচার করা যায়? এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে এটা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে যে কীভাবে কোনো একটি সমাজে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যায় । এই ব্যাপারে বিখ্যাত দার্শনিক জন রল্‌স তার ধারণা ব্যক্ত করেছেন। রল্‌স এর মতে, সমাজের ন্যূনতম সুবিধাভোগী সদস্যদের সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার পেছনে যুক্তিসঙ্গত বৈধতা থাকতে হবে।

৪.৩ জন রল্‌সের ন্যায় তত্ত্ব (John Rawls' Theory of Justice)

যদি কোনো ব্যক্তিকে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয় যে তিনি কোনো ধরনের সমাজে বাস করতে পছন্দ করেন, তখন অনেকেই বলবে, যে সমাজ তার নিয়মকানুন ও সংগঠন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগসুবিধা প্রদান করে, সেই সমাজই তারা বেশি পছন্দ করেন। এরকম একটি সমাজ আশা করা যায় না সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র সমাজের স্বার্থকেই

অগ্রাধিকার দেবে, বিশেষত বেশিরভাগ মানুষই এটা আশা করেন যে তাদের বর্তমান সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে তাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বস্তুতপক্ষে মানুষ এটা বলে থাকে যে অভিভাবকদেরই তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য চিন্তা ও সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে ন্যায়ের তত্ত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনো ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারে না। সুতরাং আমরা কীভাবে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো যেটা নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সম্মত?

জন রল্‌স এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে একটি নিরপেক্ষ ও ন্যায় সঙ্গত সমাজ গড়ে তোলার জন্য এমন একটি ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা যায় যেখানে সমাজস্থিত মানুষ এমন কতগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যার মধ্যে দিয়ে সমাজকে সুসংগঠিত করা যায়, যদিও তারা জানেননা ওই কল্পিত সমাজে তাদের অবস্থান কোথায় হবে। অর্থাৎ আমরা জানি না যে, কোন্ ধরনের পরিবারে জন্মগ্রহন করব, আমরা উচ্চ বর্ণ বা নিম্ন বর্ণ, ধনী বা দরিদ্র, নাকি কোনো সুবিধাভোগী বা সুবিধাহীন পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করব, রল্‌স এর মতে কল্পিত সমাজে আমাদের পরিচয় কী হবে, আমাদের বিকল্পই বা কী ইত্যাদি সম্পর্কে যদি আমরা অজ্ঞাত হই, তাহলে ভবিষ্যৎ সমাজ ওই সকল আইন, সিদ্ধান্ত কিংবা নীতিমালাকে সমর্থন করব যা সমাজের সকলের জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর হবে।

রল্‌স এই ধরনের চিন্তাকে অজ্ঞতার আবরণ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আশা করেন যে, এই ধরনের 'অজ্ঞতার আবরণ' যেখানে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ সমাজে তার অবস্থান বা সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সুনিশ্চিত নয়, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভবিষ্যৎ সমাজে তার স্বার্থ সুরক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু যেহেতু কেউ তার ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কে জানে না এবং কোন্‌টি তার জন্য লাভজনক সে সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই এর জন্য প্রত্যেককেই একটি সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে সমাজের কল্পনা করতে হবে। যারা সুবিধাভোগী শ্রেণিতে জন্মগ্রহণ করে তারা স্বাভাবিকভাবে বিশেষ সুযোগ উপভোগ করবে এবং এই বিষয়টি যুক্তিবাদী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু যৎসামান্য সুবিধাভোগী কিংবা বঞ্চিত দুর্ভাগা লোকেদের ক্ষেত্রে তাহলে কী হবে? স্বভাবতই প্রত্যেকের মধ্যে এমন ধারণা গড়ে উঠা উচিত যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব সত্তা ও স্বার্থের জন্য কাজ করতে পারেন। তাদের এমন ধরনের সামাজিক নিয়মকানুন ও সংগঠনের নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার যাতে সমাজের সবচেয়ে দুর্বলতর অংশের ব্যক্তিও যুক্তিসঙ্গত সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারে। এমন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে সমাজের প্রয়োজনীয় পরিবেশ যেমন— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদির মত বিষয়গুলো প্রত্যেকেই ভোগ করতে পারে। এখানে ব্যক্তিকে উচ্চবর্ণের হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধ্যকতা থাকবে না।

অবশ্যই আমাদের পরিচয়কে মুছে ফেলা এবং অজ্ঞতার আবরণের মধ্যে থাকার বিষয়টি কল্পনা

সামাজিক ন্যায়

সামাজিক ন্যায়

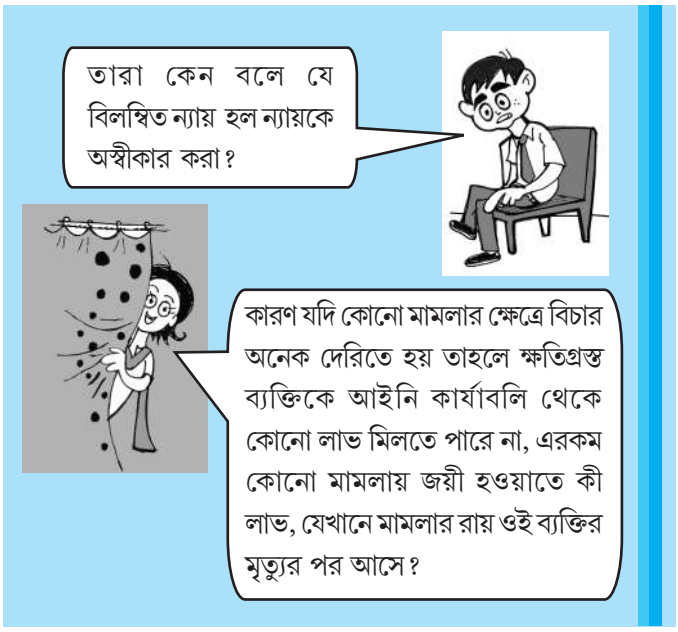

করা কারোর পক্ষেই এত সহজ নয়, কিন্তু তখন অধিকাংশ লোকের জন্য এটাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে যে তারা আত্মত্যাগী হবে কিংবা অন্যকে তাদের প্রাপ্য সুবিধার অংশীদারি করবে। এই কারণেই আমরা অভ্যাসগতভাবে আত্মত্যাগকে বীরত্বের সঙ্গে যুক্ত করি। এই মানবীয় দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতার নিরিখে আমাদের জন্য এরকম একটি কাঠামোর কথা চিন্তা করা ভাল হবে, যেখানে অসাধারণ কোনো কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। 'অজ্ঞতার আবরণ' এর অবস্থানের সবচেয়ে ভাল দিকটি হল এই যে, ব্যক্তির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিবেকবান মানুষ হওয়ার আশা জাগ্রত হয়। ফলে তারা নিজেদের জন্য চিন্তা ও মঙ্গলজনক কাজ করতে সচেষ্ট হবে। এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যে, ব্যক্তি যখন নিজেকে 'অজ্ঞতার আবরণে' রেখে নির্ণয় করেন তখন তার পক্ষে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেও স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে চিন্তা করা সম্ভবপর হয়ে উঠে। অজ্ঞতার 'কল্পিত আবরণ' ধারণ করা ন্যায্য আইন ও নীতিগুলোর একটি পদ্ধতিতে পৌঁছানোর প্রথম পদক্ষেপ। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, যুক্তিবাদী কোনো ব্যক্তি কখনোই সমাজের সবচেয়ে খারাপ অবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শুধুমাত্র সমাজকে বিশ্লেষণ করে না বরং তারা এটাও নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন যাতে নীতিগুলো সমাজের সকলের কল্যানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই উভয় ধারণাই পাশাপাশি অবস্থান করে। কারন এব্যাপারে কোনো ব্যক্তিই নিশ্চিত নয় যে, ভবিষ্যতে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান কী হবে, প্রত্যেকেই এমন কতগুলো সামাজিক নিয়ম-নীতির কথা চিন্তা করেন যাতে সমাজের সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেও সমস্ত ধরনের সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারেন। কিন্তু তারা এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা চেষ্টা করবে যে তাদের দ্বারা নির্বাচিত নীতিগুলো ভাল পরিস্থিতিতে অবস্থানকারীদের যেন দুর্বল না করে, কারণ এইখানে এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে তারাও ভবিষ্যত সমাজে সুবিধা সম্পন্ন পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করতে পারে। সুতরাং যদি নির্ধারিত নিয়ম ও নীতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে তা সমাজের কোনো একটি বিশেষ অংশের স্বার্থকেই রক্ষা না করে সকলের স্বার্থকেই রক্ষা করবে। এই ধরনের স্বচ্ছতা কোনো মহানুভবতা বা দানশীলতার ফসল নয় বরং যুক্তিসংগত কার্যকলাপের সুফল বলা যায়।

সুতরাং রল্‌স যুক্তি দিয়েছেন যে নৈতিকতা নয়, বরং যুক্তিবাদী চিন্তাই আমাদের সামাজিক লাভ - ক্ষতির সম অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত করবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন, আগে থেকেই নৈতিকতার কোনো লক্ষ্য বা নিয়ম আমাদের স্থির করে দেওয়া হয়নি, তাই এক্ষেত্রে আমরা মুক্তমনে সর্বজনীনভাবে কল্যাণকর নীতিসমূহ প্রণয়ন করতে পারি। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই রল্‌স এর তত্ত্বকে নিরপেক্ষ এবং ন্যায়ের প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়।

৪.৪ সামাজিক ন্যায় অনুসরণ (Pursuing Social Justice)

যদি কোনো একটি সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে চূড়ান্ত বৈষম্য বিদ্যমান থাকে, সেখানে কিছু মানুষ প্রচুর পরিমাণ সম্পদ ও অর্থের মালিক হওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন এবং অন্যদিকে একটি বিশাল অংশের মানুষ এই ধরনের সম্পদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়, তাহলে সহজেই এটা বলা যায় যে ওই সমাজে সামাজিক ন্যায়ের অভাব রয়েছে। এখানে আমরা শুধুমাত্র ন্যূনতম জীবন ধারণের উপযোগী এমন একটি অবস্থার কথা বলছি না যা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি ভোগ করেন। সামাজিক ন্যায় কখনোই মনে করে না যে জীবন ধারণের জন্য সমাজে চূড়ান্ত সাম্যাবস্থা বা একই ধরনের সমতা প্রয়োজনীয়, কিন্তু একটা সমাজকে কখনোই ন্যায় সংগত বলা যাবে না যদি সেখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিশাল ব্যবধান বর্তমান থাকে এবং যেখানে ধনী ও দরিদ্র অংশের মানুষকে দুটো পৃথক পৃথিবীর আধিবাসী বলে মনে হয়। আপেক্ষিক ভাবে দরিদ্র অংশের জনগণ যত কঠোর পরিশ্রমই করুক না কেন কোনো দিনই তারা ধনীদের সমকক্ষ হওয়ার সুযোগ পাবে না। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, একটা ন্যায় ভিত্তিক সমাজ বলতে এমন একটি সামাজিক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি ন্যূনতম জীবন ধারণের উপযোগী সহায় সম্পদের ব্যবস্থা করতে পারে, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে পারে। মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন করতে পারে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করার চেষ্টা করতে পারে।

চলো এটা করি

বিভিন্ন সরকারি এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংস্থাগুলো খাদ্য, আয় ও জলের মত বিষয়ের সুবিধাগুলোর ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার উপর বিভিন্ন হিসাব করেছে। এই হিসাবগুলো সম্পর্কে তোমার বিদ্যালয়ের পাঠাগার অথবা ইন্টারনেট এর সাহায্যে অনুসন্ধান করো।

একজন ব্যক্তির ন্যূনতম জীবন ধারণের মান কীভাবে নির্ধারণ করা যায়? বিভিন্ন ধরনের সরকারি সংস্থা এবং রাষ্ট্রসংঘের অধীনস্থ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো বিভিন্নভাবে ন্যূনতম জীবন ধারণের মান নির্ণয় করেছেন, কিন্তু সাধারণভাবে সবাই একমত হওয়ার চেষ্টা ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য, বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শিক্ষা এবং প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। জনগণকে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো সরবরাহ করা যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে আবশ্যকীয় দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। ভারতের মতো দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশ যেখানে বিশাল সংখ্যক জনগণ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে, তাদের সকলের জন্য ন্যূনতম জীবন যাত্রার মানের নিশ্চয়তা বিধান করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ এবং এটি সরকারের একটি বিশাল দায়িত্ব।

সামাজিক ন্যায়

সামাজিক ন্যায়

যদিও এই ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত যে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অংশের মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য চেষ্টা করবে, যাতে তারা অন্যদের সাথে সমতা উপভোগ করতে পারে। কিন্তু এই লক্ষ্যে কীভাবে পৌঁছানো যায় তার সর্বোত্তম পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। বর্তমানে আমাদের সমাজের মধ্যে এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে বিতর্ক বলছে যে, মুক্ত বাজারের মাধ্যমে অবাধ প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা কি সমাজের অবস্থা সম্পন্ন সদস্যদের ক্ষতি না করে অনগ্রসর শ্রেণির সাহায্য করার সর্বোত্তম উপায় হবে, না কি গরিবদেরকে ন্যূনতম সুবিধা প্রদান করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে, প্রয়োজনে সম্পদের পুণর্বণ্টনের মধ্য দিয়ে সরকার এটা করবে। আমাদের দেশে এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোকে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী সমর্থন করছে যারা গ্রামীণ ও শহরের গরিব এবং প্রান্তিক জনগণকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করে। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এইসব আলোচনা পর্যবেক্ষণ করবো।

> ন্যায়পূর্ণ সমাজ হল এরকম একটি সমাজ যেখানে মর্যাদার ঊর্ধ্বমুখী ভাবনা এবং অপমানের নিম্নমুখী ভাবনা মিলে মিশে একটি সহানুভূতিশীল সমাজের নির্মাণ করে।
>
> *ড. বি আর আম্বেদকর*

মুক্ত বাজার বনাম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ
(Free Markets versus State Intervention)

মুক্ত বাজার অর্থনীতির সমর্থকরা মনে করেন যে যতটা সম্ভব ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং মূল্য মজুরি ও মুনাফা সম্পর্কিত বিষয়ে অন্যের সঙ্গে চুক্তি অথবা সন্ধি করার স্বাধীনতা থাকতে হবে। সবচেয়ে বেশি মুনাফা লাভের জন্য তাদের একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এটি মুক্ত বাজারের একটি সহজ সংজ্ঞা। মুক্ত বাজারের সমর্থকরা বিশ্বাস করেন যে যদি বাজারগুলোকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বাইরে রাখা যায়, তাহলে সামগ্রিক লেনদেন সামাজিক সুবিধা ও কর্তব্যের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করবে। যাদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে তারা তাদের পরিশ্রমের অনুপাতে মুনাফা পাবে এবং যারা

অযোগ্য তারা অপেক্ষাকৃত কম মুনাফা পাবে। তারা মনে করেন যে, বাজার বণ্টন ব্যবস্থার ফলাফল যাই হোক না কেন তা ন্যায়সঙ্গতই হবে।

যদিও বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সকল সমর্থকরা সম্পূর্ণভাবে অনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি সমর্থন করেন না। অনেকেই বর্তমানে বাজার অর্থনীতির উপর বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপকে সমর্থন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাষ্ট্র প্রত্যেক মানুষের ন্যূনতম জীবন যাত্রার মান বজায় রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে যাতে তারা সমাজের অন্যান্য শ্রেণির সাথে প্রতিযোগিতায় সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারা এবিষয়ে যুক্তি দিতে পারে যে বুনিয়াদি পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং এরকম অন্যান্য পরিসেবার বিকাশের ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বেসরকারি সংস্থাগুলোকে মানুষের কাছে এই সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা উচিত এবং রাষ্ট্রীয় নীতিগুলো এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে মানুষ এই সুবিধাগুলো ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। একই সঙ্গে এটাও দেখা প্রয়োজন যে, যারা বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত, সমাজের অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম তাদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করবে। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রের ভূমিকা হল শুধুমাত্র আইন ও রীতিনীতির কাঠামো বজায় রাখা এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতাকে সকল প্রকার বাধা বিপত্তি থেকে মুক্ত রাখা। তারা মনে করেন যে মুক্ত বাজার নীতি নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজের মূল ভিত্তি। বাজার অর্থনীতি কোনো ব্যক্তির জাতি বা ধর্মের প্রতি গুরুত্ব দেয় না। বাজার অর্থনীতি এটাও যাচাই করে না যে ব্যক্তি পুরুষ কিংবা নারী। বাজার অর্থনীতি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রতিভা ও দক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। যদি কোনো ব্যক্তির উপযুক্ত মেধা থাকে তাহলে কোনো কিছুর জন্য তাকে বিচলিত হতে হয় না।

বাজার বণ্টন ব্যবস্থার পক্ষে আরেকটি যুক্তি হল এই যে, এটি আমাদের আরো বেশি পরিমাণে বিকল্প বা পছন্দের সুযোগ করে দেয়। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে বাজার ব্যবস্থা মানুষকে একজন ভোক্তা হিসাবে বেশি পরিমাণ বিকল্প বা পছন্দের সুযোগ করে দেয়। আমরা খাবারের জন্য পছন্দসই চাল কিনতে পারি আবার পছন্দমত স্কুলেও যেতে পারি এই শর্তে যে এর মূল্য দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থের সংস্থান আমাদের কাছে আছে।

কিন্তু প্রয়োজনীয় পণ্য এবং পরিসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, উন্নত গুণমানসম্পন্ন বস্তু এবং পরিসেবা ব্যক্তির ক্রয় করার সামর্থ্য অনুযায়ী উপলব্ধ থাকবে। যদি বেসরকারি সংস্থাগুলো মনে করে যে তাদের কাছে এই সমস্ত পরিসেবা প্রদান করা লাভজনক হবে না তাহলে এই বাজার থেকে তারা যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করবে, অথবা সস্তা এবং নিম্নমানের পরিসেবা প্রদান করবে। যার জন্য দেখা যায় প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে খুব কম বেসরকারি বিদ্যালয় রয়েছে আর যেগুলো রয়েছে সেগুলো খুবই নিম্নমানের । স্বাস্থ্য পরিসেবা বা বাসস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই ধারণাটি সত্য, এই অবস্থায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সরকারি সংস্থাকেই মানুষের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করতে হয়।

সামাজিক ন্যায়

আবার প্রায়ই মুক্ত বাজার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে এমন যুক্তিও উপস্থাপন করা হয় যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত পরিসেবার মান সরকারি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রদত্ত পরিসেবার তুলনায় অধিকতর উন্নত। কিন্তু বেসরকারি পরিসেবার উচ্চমূল্য তাদের গরিব অংশের জনগণের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। বেসরকারি উদ্যোগ বা পরিসেবা যেখানেই প্রদান করা হয় সেখানে অধিক মুনাফা অর্জন করার সুযোগ থাকে এবং তা ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের স্বার্থে কাজ করে, যার পরিণামে সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ এই সকল সুবিধা পাওয়ার পরিবর্তে বঞ্চিত থেকে যায়।

যদিও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করা হয়, তা সত্ত্বেও মুক্ত বাজার আগে থেকেই সুবিধা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুকূলে কাজ করে আসছে। সেজন্য অনেকেই এই ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন যে, সামাজিক ন্যায়ের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য রাষ্ট্রকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

গণতান্ত্রিক সমাজে বণ্টন ব্যবস্থা ও ন্যায়ের বিষয়ে মতবিরোধ অনিবার্য,তবে তার প্রয়োজনও আছে। কারণ এই মতবিরোধ আমাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে যাচাই করতে এবং সুচিন্তিতভাবে নিজেদের পছন্দ অনুসারে বিকল্প নির্বাচন করতে সাহায্য করে। রাজনীতির মূল কাজই হল এই ধরনের বিভিন্ন মতভেদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বর্তমান এবং এগুলো হ্রাস করার জন্য আরও অনেক কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে। ন্যায় সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিগুলোর অধ্যয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে অনুধাবন আমাদের করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সহমতে পৌঁছতে সহায়তা করে।

ন্যায় শুধু কী করা উচিত বা কী উচিত নয় তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, ন্যায় এমন একটি বিষয় যাকে ব্যক্তি তার নৈতিক অধিকার হিসেবে দাবি করতে পারে।

জন স্টুয়ার্ট মিল

Justice implies something which it is not only right to do and wrong not to do; but which some individual person can claim from us as his moral right.

– *J. S. Mill*

সামাজিক ন্যায়

অনুশীলনী

১) প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য প্রদান করা বলতে কী বোঝায়? কীভাবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে "যার যা প্রাপ্য তা প্রদান করা" -এই কথাটির অর্থও পরিবর্তিত হয়েছে?

২) এই অধ্যায়ে বর্ণিত ন্যায় সংক্রান্ত যে তিনটি নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করো? প্রত্যেকটি নীতির সমর্থনে উপযুক্ত উদাহরণ দাও।

৩) ব্যক্তির বিশেষ চাহিদা পূরণের নীতির সাথে কি সকলের প্রতি সম আচরণের নীতির কোনো বিরোধ রয়েছে?

৪) নিরপেক্ষ ও ন্যায়পূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত আধারের ভিত্তিতে সমর্থন করার জন্য জন রল্‌স কীভাবে তাঁর "অজ্ঞতার আবরণের" ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন?

৫) সাধারণত কোন্ বিষয়গুলোকে মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা হিসাবে গণ্য করা হয়? একটি দায়িত্বশীল সরকারের উপর সকলের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলো নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কী ধরনের দায়িত্ব রয়েছে?

৬) নীচে দেওয়া যুক্তিগুলোর মধ্যে কোন্‌টি নাগরিকদের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যাবলিকে বৈধতা প্রদান করে?

ক) দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে পরিসেবা প্রদান করাকে সরকারের উদারমূলক কাজ বলে সমর্থন করা হয়।

খ) সকল নাগরিকের জীবনধারণের ন্যূনতম মান প্রদান করা হল সকলের জন্য সমান সুযোগের অধিকারটি সুনিশ্চিত করার অন্যতম উপায়।

গ) কিছু লোক স্বভাবতই অলস, সুতরাং তাদের প্রতি আমাদের সদয় হওয়া প্রয়োজন।

ঘ) সকলের জন্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং জীবনধারনের ন্যূনতম মানের নিশ্চয়তা বিধান করাকে মানবাধিকার এবং মানবতাবাদের স্বীকৃতি বলে মনে করা হয়।

অনুশীলনী

পঞ্চম অধ্যায়

অধিকার (Rights)

দৈনদিন জীবনে আমরা প্রায়শই অধিকারের কথা বলে থাকি। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সদস্য হিসাবে আমরা এমন কতগুলো অধিকার যেমন ভোটাধিকার, রাজনৈতিক দল গঠন করার অধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার,সরকারি কাজে অংশগ্রহণ করার অধিকার ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করে থাকি। সাধারণভাবে স্বীকৃত রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ছাড়াও মানুষ বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অধিকার যেমন - তথ্য জানার অধিকার, বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়ার অধিকার, নির্মল বায়ু পাওয়ার অধিকার ইত্যাদির দাবি জানিয়ে থাকে। অধিকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রেক্ষিতেই দাবি করা হয় না, বরং মানুষ সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিরিখে অধিকার দাবি করে থাকে। উপরন্তু অধিকার শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্যই নয়, বরং শিশুদের জন্য, মাতৃজঠরে থাকা ভ্রুণের জন্য এবং এমনকি জন্তু জানুয়ারের অধিকার নিয়েও মানুষ আলোচনা করে থাকে। সুতরাং অধিকার সংক্রান্ত তত্ত্বকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হবে।

- অধিকার বলতে আমরা কী বোঝাতে চাই?
- অধিকার দাবি করার মূল ভিত্তিগুলো কী কী?
- অধিকার দ্বারা কী উদ্দেশ্য সাধিত হয়? এই উদ্দেশ্যগুলো কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

৫.১ বিভিন্ন ধরনের অধিকারগুলো কী কী ? (What are Rights?)

সাধারণভাবে অধিকার বলতে কতকগুলো ন্যায়সংগত সুযোগ সুবিধা বা স্বত্বকে বোঝায়। এর অর্থ একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে, একজন ব্যক্তি হিসাবে বা একজন মানুষ হিসাবে যার যা প্রাপ্য তা প্রদান করা। পাশাপাশি এগুলো এমন বিষয় যার বৈধতার প্রতি সমাজের অন্যান্য অংশের স্বীকৃতি থাকে। কিন্তু এই কথার অর্থ কখনও এটা নয় যে, প্রত্যেক মানুষ যেটা প্রয়োজনীয় বা আবশ্যিক বলে মনে করবে, সেটাকেই অধিকার বলে বিবেচনা করা হবে। যদি কোন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক পরতে না চায়, তবে তার পছন্দমতো পোশাক পরার স্বাধীনতাকে কখনোই অধিকার বলে বিবেচিত করা যায় না। কোনো ব্যক্তি অধিক রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে অবস্থান করতে চাইলে সেটাকেও অধিকার বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং নিজের পছন্দমতো বিদ্যালয়ের পোশাক পরিধান করা বা যে কোনো সময়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করা এর কোনোটাই অধিকার বলে বিবেচিত হয় না। মানুষ কী চায়, মানুষের যা কিছু প্রাপ্য এবং মানুষের যে সমস্ত বিষয়ে অধিকার রয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য থাকা প্রয়োজন।

প্রাথমিকভাবে অধিকার বলতে সেই সমস্ত ন্যায়সংগত দাবিকে বোঝায় যেগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সৃষ্ট সুন্দর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। সভ্য সমাজের নাগরিক হিসাবে মানুষ সেই সকল অধিকারের দাবি করতে পারে যেগুলো ব্যক্তির সমমর্যাদা ও সম্মানের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জীবিকার অধিকারকে মানুষের সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। লাভজনক জীবিকা কোনো ব্যক্তিকে স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবনযাপনে সাহায্য করে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি তার ন্যূনতম চাহিদাগুলো মেটাবার সুযোগ পান, তখন সেই ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং উদ্দেশ্যপূরণের জন্য কাজ করতে পারেন এবং যে কোনো বিষয়ে তিনি তার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। ব্যক্তির এই ধরনের স্বাধীনতা ব্যক্তিকে কোনো নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর ফলে ব্যক্তি কোনো সৃষ্টিশীল রচনা, খেলাধূলা, গান বাজনা বা অন্য কোনো শিল্প কর্মে নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। কারণ এই স্বাধীনতা ব্যক্তিকে তার নিজস্ব বিশ্বাস ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করে। সুতরাং সমাজে বসবাসকারী সকল নাগরিকের কাছে জীবন-জীবিকা ও মত প্রকাশের অধিকার একান্ত অপরিহার্য কারণ এই অধিকারগুলো প্রকৃতিগত ভাবে সর্বজনীন ও চিরন্তন।

অন্য আরেকটি মূল কারণ হল এই সমস্ত অধিকারগুলো ব্যক্তির জীবনের সঠিক উন্নতি বিধানের জন্য একান্ত জরুরি। এই সমস্ত অধিকারগুলো ব্যক্তির প্রতিভা ও নৈপুণ্য বিকাশের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। যেমন শিক্ষার মতো অধিকার মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে তার ব্যক্তিগত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটায় এবং উপযুক্ত সময়ে যথাযথ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার অধিকারকে একটি সর্বজনীন অধিকার

হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যদিও কোনো বিপজ্জনক কাজ যা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং উন্নতির বিরোধী তাকে কখনোই অধিকার বলে গণ্য করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে নিষিদ্ধ মাদক সেবন করা যে কোনো ব্যক্তির স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং এগুলোর সেবন ব্যক্তিকে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং কোনো ব্যক্তিকেই নিষিদ্ধ মাদকের ব্যবহার করা বা তামাকের ধোঁয়া গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। বিড়ি, সিগারেটের মতো তামাক সেবনের ক্ষেত্রে ধূমপায়ীর চারপাশে যারা থাকেন তারাও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিষিদ্ধ মাদক শুধুমাত্র মানুষের স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি করে না, মানুষের আচরণগত পরিবর্তন ঘটায় যা সমাজের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং অধিকারের সংজ্ঞা অনুসারে ধূমপান করা বা নিষিদ্ধ মাদক ব্যবহার করার অধিকারকে কখনোই অধিকার বলে দাবি করা যায় না।

এই কাজটি করা যাক

সাম্প্রতিক কালে সংবাদ পত্রগুলোতে প্রকাশিত মানুষের বিভিন্ন ধরনের অধিকারের প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন গণআন্দোলনের সংবাদগুলি সংগৃহীত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

৫.২ অধিকারের উৎস কী ? (Where do Rights Come from?)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ মনে করতেন যে অধিকারের উৎস প্রকৃতি বা ঈশ্বর। প্রাকৃতিক নিয়মকানুন থেকেই মানুষের অধিকারের সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হল মানুষের অধিকার কোনো রাষ্ট্র, সমাজ বা শাসকের দ্বারা সৃষ্ট নয়। মানুষ এই সমস্ত অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং সত্যি কথা বলতে গেলে মানুষের অধিকারগুলো অ-হস্তান্তরযোগ্য — কেউই ব্যক্তির এই অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে না। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন লক মানুষের তিন ধরনের প্রাকৃতিক অধিকারের কথা বলেছেন — এগুলো হল জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার। ব্যক্তির অন্যান্য অধিকার এই অধিকারগুলো থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। রাষ্ট্র বা সরকার এই সমস্ত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কারণ এগুলো মানুষের জন্মগত অধিকার। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর রাষ্ট্র ও সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধিতার জন্য স্বাভাবিক স্বাধীনতার অধিকারের এই তত্ত্বটি বহুল ব্যবহৃত।

বর্তমান সময়ে প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণার চেয়ে মানবাধিকারের ধারণাটি অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর মূল কারণ হল অধিকার প্রাকৃতিক আইন বা প্রকৃতি নির্দিষ্ট কতকগুলো নিয়ম কানুন বা ঈশ্বর সৃষ্ট কোনো নিয়মকানুন এরূপ ধারণা বর্তমানে মানুষের কাছে বিশেষ গ্রহণ যোগ্য নয়। বর্তমানে মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও সুষ্ঠু জীবন যাপনের মূল ভিত্তি হিসাবে এই অধিকারগুলোকে গণ্য করা হয়।

মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মানুষ কতকগুলো অধিকার বা স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারী। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয় এবং প্রত্যেকেই সমানভাবে মূল্যবান। এই কথার অর্থ হল প্রত্যেক মানুষই সমান এবং কেউই এই পৃথিবীতে অন্য কারোর সেবা বা দাসত্ব

মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে কান্ট এর ধারণা (Kant on Human Dignity)

এই জগতের সবকিছুরই একটা মূল্য বা মর্যাদা রয়েছে। মর্যাদা হল সবকক্ষের তুলনায় এমন কতগুলো বিশেষ গুণাবলি যা প্রচলিত মূল্যমানের উর্ধ্বে যাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

মানবজাতি অন্য সকলের তুলনায় একটি ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী। এ কারণে তাদের কাছে এই মর্যাদার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক স্যার ইমানুয়েল কান্ট এই সহজ তত্ত্বটির গভীর অর্থ ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা রয়েছে এবং প্রত্যেকের সাথে মনুষ্যোচিত আচরণ করা উচিৎ। একজন ব্যক্তি অশিক্ষিত হতে পারেন বা দরিদ্র বা ক্ষমতাহীন হতে পারেন অথবা তিনি মিথ্যবাদী বা অসৎ হতে পারেন। তা সত্ত্বেও যে কোনো ব্যক্তি এই মানব সমাজের অংশ এবং সেজন্যই তাকে ন্যূনতম মর্যাদা প্রদর্শন করা উচিত।

কান্টের মতে, যে কোনো মানুষের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করার অর্থ হল সেই ব্যক্তির সাথে নৈতিকতাপূর্ণ ব্যবহার করা। কান্টের এই ধারণা যারা শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা মানবাধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছেন তাদের কাছে একটা পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

কান্ট তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে অধিকারের নৈতিক ধারণা বলতে কী বোঝায় তা ব্যক্ত করেছেন। এই ধারনা দুটি যুক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রথমত প্রত্যেক মানুষেরই অন্যের প্রতি এমনভাবে আচরণ করা উচিত, যেটা স্বাভাবিকভাবে মানুষ অন্যের কাছ থেকে আশা করেন। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক মানুষেরই আচরণের ক্ষেত্রে এটা সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যাতে কোনো ব্যক্তিকেই নিজের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। যার অর্থ হল শুধু স্বার্থ উদ্ধারে প্রয়োজনীয় বলে কোন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত নয়, বরং মানুষকে মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

করার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি।

প্রত্যেক মানুষই একটি নিজস্ব অন্তর্নিহিত মূল্যের অধিকারী। প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ থাকা প্রয়োজন যাতে প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। যেকোনো ব্যক্তির স্বাধীন ও সমান মর্যাদা সম্পন্ন উপলব্ধি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য অবসানের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণাপত্র এই নীতিকে সমর্থন করে এবং এই ঘোষণাপত্র সেই সমস্ত মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় যাকে বিশ্বজনীন সমাজ সামগ্রিকভাবে স্বকৃতি প্রদান করে। পাশাপাশি এগুলো মানুষের জন্য একটা মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য বিশেষভাবে জরুরি বলে স্বীকৃত।

সমগ্র বিশ্বের শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষ মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণার ধারণাকে নিজেদের স্বার্থেও প্রয়োগ করে। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন মানুষ ও গোষ্ঠির সংগ্রামের ফলে মানুষের অধিকার সংক্রান্ত ধারণা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মনুষ্য সমাজ থেকে দাস প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু মানুষের আরও অন্যান্য অধিকার রয়েছে যেগুলো এখনো পূর্ণ হয় নি। এমনকি বর্তমান সময়েও এমন অনেক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী রয়েছে যাদের কাছে মানবিকতা বা মানবিক মূল্যবোধ এখনও পৌঁছায় নি।

বিগত বছর গুলোতে সম্প্রসারিত অধিকারের প্রতি বিভিন্ন ধরনের হুমকি ও আগ্রাসন প্রতিরোধ করেই মানুষ নতুন নতুন অধিকার সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে মানুষ

অধিকার

এই বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন যে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করতে চায় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত ধারণা থেকেই মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য মুক্ত বাতাস, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ধারাবাহিক উন্নয়নের মতো বিভিন্ন দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। আরও এক ধরনের সচেতনতা যা সাম্প্রতিক কালে গড়ে উঠেছে তা হল বিশেষ করে মহিলা, শিশু এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পর্যাপ্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করা। ঠিক একইভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কতগুলো দাবি উত্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন জীবনের অধিকার, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, পানীয় জল বা স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই সমস্ত দাবিগুলো মানব সমাজের সুরক্ষার জন্য এবং মর্যাদার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর সমস্ত অংশের মানুষ যাতে সমানভাবে এই সমস্ত অধিকারগুলো ভোগ করতে পারে, তার জন্য মানুষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কোনো মানুষই এই ধরনের অধিকারের ব্যাপ্তি বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না। অনেক সময় এই অধিকার রক্ষার জন্য সর্ব্বব্যাপী সমর্থন আদায় করা হয়। অনেকেই হয়তো অবগত যে বিখ্যাত পপ তারকা বব গেল্ডফ আফ্রিকার দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সকলের নিকট আবেদন করেন এবং দূরদর্শনের প্রতিবেদন অনুসারে দেখা যায় তিনি সমগ্র বিশ্ব থেকে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেন।

৫.৩ রাষ্ট্র এবং ন্যায় সঙ্গত অধিকার (Legal Rights and the state)

মানুষ নৈতিকতার দাবি অনুসারে মানবাধিকার দাবি করে থাকে। এই সমস্ত মানবাধিকারের সার্থকতা নির্ভর করে অনেকগুলো বিষয়ের উপর। যেমন এই সমস্ত অধিকারের প্রতি জনগণের সমর্থন এবং সরকারি আইনের সমর্থন। সেজন্য বর্তমানে অধিকারের আইনগত স্বীকৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানে অধিকার সংক্রান্ত আইন সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। যে কোনো দেশের সংবিধান হল দেশের আইনের সর্বোচ্চ আধার। সুতরাং সংবিধান স্বীকৃত অধিকারের

যথেষ্ট মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে। ভারতবর্ষে সংবিধান স্বীকৃত অধিকার গুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। দেশের অন্য সমস্ত আইন এবং নীতিগুলি স্বাভাবিকভাবে সংবিধান সংক্রান্ত অধিকারকে সম্মান এবং মর্যাদা প্রদান করে থাকে। ভারতের সংবিধানে সেই সমস্ত অধিকারগুলোকেই প্রাথমিকতা ও অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে সেগুলোকে মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের কতকগুলো ন্যায় সংগত দাবিকে ঐতিহাসিক কারণে বা ঐতিহ্যগত কারণে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এই অস্পৃশ্যতা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন রীতি হিসাবে ভারতীয় সমাজে চলে আসছিল। সুতরাং মানুষের অধিকার সংক্রান্ত দাবিগুলি দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন তাত্ত্বিকেরা অধিকারকে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত আইন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অধিকারের এই আইন সংগত অনুমোদন অধিকারকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। অধিকার সংক্রান্ত ধারনা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে এবং পুরানো স্বীকৃত অধিকারগুলো নতুন ভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে, যাতে করে সাম্প্রতিক কালে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য অধিকারগুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বস্তুতপক্ষে, অনেক ক্ষেত্রে স্বীকৃত অধিকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি কতগুলো নির্দেশিকা। সেই কারণেই এই সমস্ত অধিকারগুলোর দ্বারা মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি কতগুলো দাবি উত্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি অধিকারই এটা নির্দেশ করে যে, রাষ্ট্র অধিকার রক্ষার জন্য কী করতে পারবে এবং কী কী করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকার এটা নিশ্চিত করে যে, রাষ্ট্র এরকম আইন প্রণয়ন করবে যাতে অন্য ব্যক্তি ওই ব্যক্তিকে আঘাত করতে না পারে। যদি কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে আঘাত করে বা ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করবে। যদি কোন সমাজ এটা মনে করে যে, বেঁচে থাকার অর্থ হল ন্যূনতম জীবন যাত্রার মান বজায় রাখা, তাহলে সমাজে সকলে এটা আশা করে যে রাষ্ট্র এমন ধরনের নীতি নির্ধারণ করবে যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজস্থিত ব্যক্তি সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে অধিকারের স্বীকৃতি মানেই হল এমন কিছু বাধ্যবাধকতা যা রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হয়।

অধিকার শুধুমাত্র এটাই নির্দেশ করে যে রাষ্ট্র কী কী করতে পারবে এবং কী কী করতে পারবে না। যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অর্থ হল, রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছেমতো গ্রেপ্তার করতে পারে না। যদি রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে রাষ্ট্রকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে এবং একমাত্র আদালতের নির্দেশেই কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। যেমন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পূর্বে পুলিশের পক্ষে আদালতের সম্মতি নিতে হয়। সুতরাং ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্রের উপর অনেকগুলো বাধা নিষেধ আরোপ করে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে মানুষের অধিকার এটা নিশ্চিত করে যে,

ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী এবং রাষ্ট্র প্রণীত আইন বল প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকরী হয়। কিন্তু রাষ্ট্র শুধুমাত্র রাষ্ট্রের জন্যই অবস্থান করে না বরং রাষ্ট্র ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই অবস্থান করে। যে কোনো রাষ্ট্রেই ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। নির্বাচিত সরকারকে ব্যক্তির কল্যাণের জন্য কাজ করতে হয়। শাসকবর্গ সবসময় তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে এবং সরকারকে এটা ভুলে গেলে চলবে না যে রাষ্ট্রীয় আইন ব্যক্তির সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য প্রণীত হয়।

চলো এটা করি

বিগত কয়েকদিনের দৈনিক সংবাদ পত্রগুলো পাঠ করো এবং এটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো কোথাও কোনো অধিকার হননের ঘটনা ঘটেছে কি না। এরকম ক্ষেত্রে সরকার এবং নাগরিক সমাজের কী করা উচিৎত

৫.৪ অধিকারের প্রকারভেদ (Kinds or Rights)

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই বর্তমানে কতগুলো রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। রাজনৈতিক অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে। রাজনৈতিক অধিকার বলতে মতদানের অধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, জন প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার। রাজনৈতিক অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতার সহযোগী হিসাবে কাজ করে। ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার বলতে বোঝায়, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার পাওয়ার অধিকার, ব্যক্তির নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার অধিকার, প্রতিরোধ ও অসম্মতি জ্ঞাপনের অধিকার। সামগ্রিকভাবে, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অধিকারের লক্ষ্য হল ব্যক্তির সুখী ও সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা। ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রকে নাগরিকদের নিকট দায়বদ্ধ করে তোলে এবং ব্যক্তির অধিকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বস্তুতপক্ষে, মানুষ তখনই রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকারটি সুনিশ্চিত করতে পারে যখন সে তার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাগুলো যেমন, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, স্বাস্থ্য বা পানীয় জল ইত্যাদি যথাযথভাবে ভোগ করতে পারে। কোনো একজন ব্যক্তি যিনি রাস্তার ধারে ফুটপাতে বাস করেন এবং জীবনের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেন । তার কাছে রাজনৈতিক অধিকারের কোন মূল্য নেই। তাদের পক্ষে প্রয়োজন হল ন্যূনতম মজুরি অর্জন করা যাতে সেই মজুরির বিনিময়ে কোনো রকমে জীবন ধারণ করতে পারে। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজ মানুষের এমন কতগুলো ন্যূনতম সুযোগ সুবিধার স্বীকৃতি দেয় যার দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হয়। কোনো কোনো দেশে যে সমস্ত নাগরিকরা দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে, সরকার তাদের জন্য বাসস্থান ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। আবার কোনো কোনো দেশে বেকারদের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা

রয়েছে যাতে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। ভারত সরকার বর্তমানে গ্রামীণ মানুষের কাজের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য এম জি এন রেগা আইন চালু করেছে।

উপরন্তু, বর্তমানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই শিক্ষা সংস্কৃতির মত দাবিগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার, বিভিন্নভাষা ও সাংস্কৃতিক জাতি গোষ্ঠীর নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অধিকার বর্তমানে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকারের তালিকা দিন দিন দীর্ঘায়িত হচ্ছে। কতগুলো অধিকার যেমন বেঁচে থাকার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, মর্যাদা পাওয়ার অধিকার এবং সরকারি কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করার অধিকারকে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার আবশ্যিক বলে বিবেচনা করে।

আবার এমন কতগুলো ন্যায্য দাবি বা অধিকার রয়েছে যেগুলো কোন ব্যক্তির সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য সহায়ক বলে গণ্য করা হয়।

চলো বিতর্ক করি

সাংস্কৃতিক অধিকার বলতে কখনোই এটা বোঝায় না যে কোনো ব্যক্তি অন্য ধর্ম সম্প্রদায় বা সাংস্কৃতিক বিন্যাসে আঘাত করে কোন ছায়াছবি নির্মাণ করতে পারে।

নিম্নলিখিত বিষয়ে চিন্তা করা যাক

নীচে দেওয়া নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগত ও সম্প্রদায়গত অধিকারগুলো কতটা ন্যায় সংগত - তা আলোচনা করো।

- ☐ কোন একটি শহরে জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নিজস্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেই বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র ঐ সম্প্রদায়ের ছাত্রদেরই ভর্তির সুযোগ দিল।
- ☐ হিমাচল প্রদেশের অধিবাসীদের উপর ওই রাজ্যে জমি বা সম্পত্তিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয়েছে।
- ☐ একটি যৌথ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এমন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন যেখানে ছাত্রীদের পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ করা হল।
- ☐ যদি কোনো ছেলে ভিন্ন জাতির মেয়েকে বিবাহ করে, তাহলে তারা ওই গ্রামে বসবাস করতে পারবে না বলে হরিয়ানা রাজ্যের একটি পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

৫.৫ অধিকার এবং দায়বদ্ধতা (Rights and Responsibilities)

অধিকার শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কার্যকলাপের উপরই শুধু কতগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করে না বরং সমাজের প্রতিটি মানুষের উপরই কতগুলো বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে

পৃথিবীতে টিকে থাকার মতো উন্নয়নের কথা চলা যায়। প্রথমত স্থিতিশীল উন্নয়ন সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যেমন চিন্তা করে না, তেমনি সকলের কল্যাণের জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েও আলোচনা করে। যেমন ওজোন স্তরের সংরক্ষণ করা, বায়ু দূষণ ও জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা, বেশি করে গাছ লাগানোর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে সবুজায়ন সৃষ্টি করা; বনজ সম্পদের ধ্বংস প্রতিরোধ করা এবং বিশ্বের জৈব বৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রাখা এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের সকলের জন্য প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত বিষয়গুলোকে বলা হয় সাধারণ কল্যাণ জনক বিষয় যা রক্ষার জন্য সকল মানুষকে সমানভাবে কাজ করা প্রয়োজন এবং এই বিষয়গুলো মানুষের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, যারা জন্মগতভাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল ও বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়ার অধিকারী এবং এগুলো ছাড়া পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষেরই নিজ নিজ অধিকার ভোগের পাশাপাশি অন্যের অধিকারের প্রতিও শ্রদ্ধাবান হওয়া প্রয়োজন। যদি কোনো ব্যক্তি কোন বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশের অধিকারী হয় তাহলে সমাজে সকল মানুষেরই একই রকম অধিকার থাকা প্রয়োজন। আবার প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব কিছু পছন্দ বা অপছন্দ থাকতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক পরবে বা কী ধরনের সঙ্গীত শুনবে সে বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকা আবশ্যক। অন্য কোনো ব্যক্তির এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। কোনো একজন ব্যক্তি কথা বলার স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে তার প্রতিবেশীকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। কোনো ব্যক্তি বিশেষের অধিকার ভোগের অর্থ এই নয় যে তা অন্য ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি বিশেষের অধিকার সমাজের অন্য সকলের দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে।

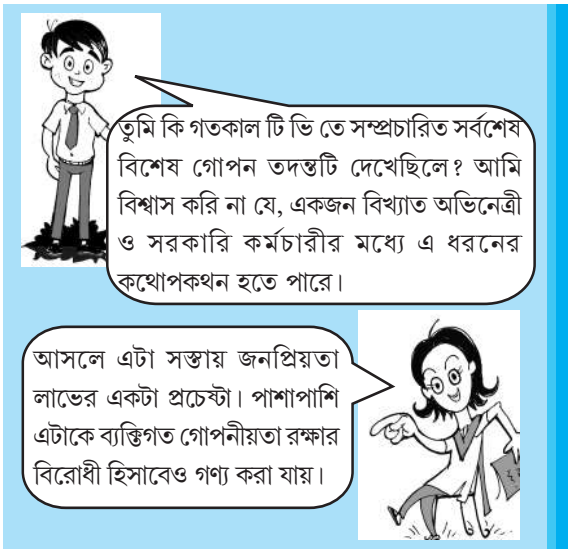

তৃতীয়ত, মানুষের অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তা সমাধানের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা করা উচিৎ। যেমন কোন একজন ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, সে অন্য কোনো ব্যক্তির স্নান করার দৃশ্যের ছবি তুলে তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে যদি ওই ব্যক্তির সম্মতি না থাকে তা হলে তা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার যে অধিকার তার বিরোধী বলে গণ্য করা হবে।

চতুর্থত, সমাজের সমস্ত নাগরিকদের তাদের অধিকারের উপর যে সমস্ত সীমাবদ্ধতাগুলো রয়েছে সে গুলোর প্রতি সজাগ থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত বিষয় হল, সরকার জাতীয় নিরাপত্তার কারণে ব্যক্তির অধিকারের উপর বিভিন্ন ধরনের বাধানিষেধ আরোপ করে থাকে। দেশের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টি মানুষের অধিকার সংরক্ষণের মতই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো পর্যায়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চত করার জন্য আরোপিত সীমাবদ্ধতাগুলোই জনগণের অধিকারের উপর হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হয়? সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা সম্ভাব্য বোমা আক্রমের হুমকির মুখোমুখি হলে কোনো রাষ্ট্র কি তখন তার নাগরিকদের অধিকার হ্রাস করতে পারে? এক্ষেত্রে সরকার কি কাউকে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার করতে পারে? সরকার কি ওই সকল ব্যক্তির টেলিফোনে আড়ি পাতার বৈধতা পেতে পারে? সরকার কি তাদের উপর দমন পীড়ন চালাতে পারে?

উপযুক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা করলে যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা হল ওই ব্যক্তি কি সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকারক? যদি এই ধরনের কোন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে তাকেও নিজের পছন্দমত উকিলের পরামর্শ গ্রহণ করার এবং নিকটস্থ আদালতের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ দিতে হবে। নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ তার থাকা উচিত। সরকার বা পুলিশ প্রশাসনকে এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কেউ সরকারি ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহার করতে না পারে। একটি সরকার কর্তৃত্ববাদী হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেই সমাজে কোনো ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তার অধিকার ভোগেরই সুযোগ পাবে না। সুতরাং মানুষের কোনো অধিকারই চূড়ান্ত নয়। সমাজের সকলের সঙ্গেই মিলিতভাবে অধিকার ভোগ করতে হয়। কারণ অধিকার, স্বাধীনতা এবং দায়বদ্ধতা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

চলো বিতর্ক করি

একজন ব্যক্তির অধিকার তখনই ক্ষুণ্ণ হয় ,যখন অন্য কেউ তার উপর হস্তক্ষেপ শুরু করে।

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণা পত্রটি প্রকাশ এবং অনুমোদন করে। এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা তার সমস্ত সদস্য দেশের কাছে এই ঘোষণাপত্র ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করার জন্য আহ্বান রাখে এবং সকল প্রকার বৈষম্য বর্জন করে পৃথিবীর সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র এবং বিশেষ করে তার বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ঘোষণাপত্র পাঠ করা, প্রদর্শন করা এবং ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করার আহ্বান রাখে।

প্রস্তাবনা

মানবজাতির সকল সদস্যের স্বাভাবিক ও সমান মর্যাদা এবং অবিচ্ছিন্ন মানবীয় অধিকার স্বীকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে স্বাধীনতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বশান্তি।

মানুষের অধিকার উপেক্ষিত হলে পশুশক্তির উদ্ভব ঘটে যা মানবজাতির কাছে এক ভয়ঙ্কর আঘাতস্বরূপ। এই আদিম পশুবৃত্তিকে জয় করে আগামী পৃথিবী এমনভাবে গড়ে উঠবে যেখানে সকল মানুষ মত প্রকাশের, বিশ্বাসের, ভয়মুক্ত পরিবেশের ও প্রত্যাশা পূরণের অধিকার ভোগ করবে। ভয় ও অভাবের পীড়ন থেকে মুক্তির স্বাধীনতা থাকবে। আইনের মাধ্যমে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ স্বীকৃত হবে। তার ফলে মানুষকে অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শেষ উপায় হিসাবে বিদ্রোহের পথে এগোতে হবে না।

এর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করা অত্যন্ত জরুরি। সার্বিক স্বাধীনতায় সামাজিক অগ্রগতি ও জীবনের মানোন্নয়ন, নারী ও পুরুষের সমানাধিকার, প্রতিটি মানুষের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শন ইত্যাদি মানবজাতির মৌলিক অধিকারগুলো মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলো জাতিপুঞ্জের সনদে গৃহীত বিশ্বজনীন মানবাধিকারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে এবং মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিটি রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার অঙ্গীকার করে।

পৃথিবীর সকল জাতির প্রতিটি মানুষের মর্যাদাসম্পন্ন জীবন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্ব ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়। এই ঘোষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হল এই বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সম্প্রসারিত করার জন্য ব্যাপক শিক্ষা ও প্রচারের ব্যবস্থা করা, যাতে প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র এবং তাদের শাসনাধীন অঞ্চলের বসবাসকারী সকল নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা যায়।

অনুশীলনী

অনুশীলনী

১) অধিকার বলতে কী বোঝায়? প্রত্যেকের নিকট অধিকার কেন গুরুত্বপূর্ণ? কীসের ভিত্তিতে মানুষের বিভিন্ন দাবি দাওয়াগুলো অধিকারে পরিণত হয়?

২) কীসের ভিত্তিতে কতগুলো অধিকারকে বিশ্বজনীন অধিকার বলে মনে করা হয়?

৩) বর্তমানে ভারতবর্ষে যে সকল নিত্য নতুন দাবি ও অধিকার সামনে এসেছে সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করো। উদাহরণস্বরূপ — আদিবাসীদের জীবন, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষা করার অধিকার, শিশুদের অধিকার বিশেষ করে রেগার শিশু-শ্রমিকের অধিকার।

৪) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। প্রত্যেক ধরনের অধিকারের উদাহরণ দাও।

৫) অধিকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর কতগুলো সীমাবদ্ধতা আরোপ করে — উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাগরিকতা (Citizenship)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নাগরিকতা বলতে রাজনৈতিক সমাজের পূর্ণ এবং সমান সদস্যতাকে বোঝায়। এই অধ্যায়ে নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। ৬.২ এবং ৬.৩ এই দুই অনুচ্ছেদে পূর্ণ এবং সমান সদস্যতা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে কিছু বিতর্ক ও সংঘাতের বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। ৬.৪ অনুচ্ছেদে নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন দেশে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। নাগরিকতা সংক্রান্ত গণতান্ত্রিক তত্ত্ব এটা দাবি করে যে নাগরিকতা সর্বজনীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার অর্থ কি এটা দাঁড়ায় যে পৃথিবীর সকল মানুষের কোনো না কোনো দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া প্রয়োজন? তাহলে পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্রহীন বহু মানুষ রয়েছে তাদের কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এই সমস্ত বিষয়গুলো ৬.৫ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। সবশেষে ৬.৬ অনুচ্ছেদে বিশ্ব নাগরিকতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে। বিশ্ব নাগরিকতা বলতে কি কিছু আছে? তা কি জাতীয় নাগরিকতার কোনো বিকল্প হতে পারে?

এই অধ্যায়টি ভালো করে পাঠ করলে তুমি যা করতে সমর্থ হবে, তাহল —

- নাগরিকতার অর্থ ব্যাখ্যা করা এবং
- নাগরিকতা সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাপকতা ও তার প্রতি বিভিন্ন অভিযোগগুলো নিয়ে আলোচনা।

নাগরিকতা

রাজনৈতিক তত্ত্ব

৬.১ ভূমিকা (Introduction)

নাগরিকতার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে, নাগরিকতা হলো যে কোনো রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ ও সমান সদস্যতা। সমসাময়িক বিশ্বে রাষ্ট্র সকল নাগরিকদের একটি সমষ্টিগত পরিচিতি এবং সকলের জন্য কতগুলো অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। যার কারণে আমরা নিজেদের ভারতীয়, জাপানি, জার্মান ইত্যাদি হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকি। যদিও এটা নির্ভর করে আমরা কোন্ দেশে বসবাস করি তার ওপর। যেখানেই ভ্রমণ করুক না কেন, প্রত্যেক নাগরিক আশা করে যে রাষ্ট্র তাদের জন্য কিছু অধিকার, সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা প্রদান করবে।

কোনো দেশের পূর্ণ সদস্যতা প্রাপ্তি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যাবে যখন আমরা পৃথিবীর সকল দুর্ভাগা মানুষের কথা ভাবি যারা কোনো জায়গায় উদ্বাস্তু অথবা অবৈধ শরণার্থী হিসাবে বসবাস করতে বাধ্য হয়। কারণ কোনো রাষ্ট্র তাদের নাগরিকতা প্রদানে আগ্রহী হয় না। কোনো রাষ্ট্রই এসকল মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়না, যার ফলে তারা অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে বসবাস করে। এসকল মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে নিজ পছন্দ মতো কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন, যার জন্য তারা ক্রমাগত সংগ্রাম করে যাচ্ছে, যেমনটা আমরা দেখি মধ্য প্রাচ্যে বসবাসকারী ফিলিস্তিনীয় উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে।

নাগরিকদের দেওয়া অধিকারের মৌলিক প্রকৃতিগুলো বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন হয়। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে যেসকল অধিকারগুলো স্বীকৃত তাহল — ভোটদানের অধিকারের মতো রাজনৈতিক অধিকার, বিশ্বাস ও মতামত প্রকাশের অধিকারের মতো পৌর অধিকার এবং ন্যূনতম মজুরি ও শিক্ষার অধিকারের মতো আর্থ সামাজিক অধিকার। সমতা ও মর্যাদার অধিকার হল নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম।

নাগরিকতা

রাজনৈতিক তত্ত্ব

বর্তমানে নাগরিকদের দ্বারা উপভোগ্য প্রত্যেকটি অধিকার সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলে অর্জিত হয়েছে। পূর্বেকার অনেক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, যেখানে মানুষ তার স্বতন্ত্রতা এবং অধিকার দাবি করেছে। ইউরোপের অনেক দেশেরও এইরকম সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আছে। যেমন ১৭৮৯ সালের সশস্ত্র ফরাসি বিপ্লব। এশিয়া এবং আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতে শাসকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কারণ ছিল সমান নাগরিকতা অর্জনের দাবি। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন সমান নাগরিকতা অর্জনের জন্য। ১৯৯০ এর দশকের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এখনও সমান সদস্যতা এবং অধিকারের সংগ্রাম ক্রমাগত চলছে। আমাদের দেশেও তোমরা নারী ও দলিতদের বিভিন্ন আন্দোলনের কথা জেনেছ। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল নিজেদের দাবির অনুকূলে জনমত গঠন করা এবং সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা, যাতে সমান অধিকার এবং সুযোগের বিষয়টি তাদের জন্য নিশ্চিত হয়।

চলো চিন্তা করি

সপ্তদশ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের শ্বেতাঙ্গারা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের উপর তাদের শাসন কায়েম করে। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় যে নীতিগুলো কার্যকর হয় সে সম্পর্কিত বর্ণনাটি পড়ো।

শ্বেতাঙ্গারা ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার এবং সরকার নির্বাচনের অধিকার ভোগ করত। সম্পদ ক্রয় এবং রাষ্ট্রের যে কোনো জায়গায় ভ্রমণের স্বাধীনতাও তারা ভোগ করত। কৃষ্ণাঙ্গদের এরূপ কোনো অধিকার ছিলনা। শ্বেতাঙ্গা এবং কৃষ্ণাঙ্গাদের জন্য পৃথক পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। শ্বেতাঙ্গা বসবাসকারী এলাকায় কাজ করতে গেলে কৃষ্ণাঙ্গাদের বিশেষ অনুমতি পত্রের প্রয়োজন হত। কৃষ্ণাঙ্গারা তাদের পরিবার নিয়ে শ্বেতাঙ্গা এলাকায় যাওয়ার অনুমতি পেতনা। বিভিন্ন বর্ণের জন্য পৃথক বিদ্যালয়েরও ব্যবস্থা ছিল।

- তোমার কি মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গাদের পূর্ণ এবং সমান সদস্যতা ছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
- দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে উপরে উল্লেখিত বর্ণনাটি আমাদের কী উপদেশ দেয়?

চলো চর্চা করি

এমন কতগুলো কার্যক্রমের উদাহরণের কল্পনা করো যে গুলোর সাহায্যে তোমার এলাকার কিছু নাগরিক অন্যদের সাহায্য করে। অথবা এলাকা উন্নয়ন কিংবা পরিবেশ সুরক্ষা করে। একাজগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করে সে গুলোর ব্যাপারে তোমার সমবয়সী লোকেরাও উদ্যোগী হতে পারে।

যাই হোক নাগরিকতা বলতে রাষ্ট্র এবং তার সদস্যসমূহের মধ্যেকার সম্পর্কের থেকেও বেশি কিছুকে বোঝায়। এটা মূলত নাগরিকে -নাগরিকে সম্পর্ক এবং পরস্পর ও সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ববোধকেই বোঝায়। এই দায়িত্ববোধগুলো কেবলমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারা আরোপিত আইনগত বাধ্য বাধকতাকেই বোঝায় না, পাশাপাশি নীতিগত বাধ্যবাধকতাকেও বোঝায়। যার মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক জীবনে অংশগ্রহণ করা ও অবদান রাখা যায়। এইজন্যই নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এবং রক্ষাকারী হিসাবে গণ্য করা হয়।

কোনো একটি রাজনৈতিক ধারণাকে অনুধাবন করার সহজ পথ হল এমন কতগুলো অবস্থার অনুসন্ধান করা যেখানে তার গ্রহণযোগ্য অর্থকে কিছু মানুষ প্রশ্ন করে। কারণ তারা মনে করে যে তাদের প্রয়োজন এবং আশা আকাঙ্খা এই রাজনৈতিক ধারনায় প্রতিফলিত হয়নি।

৬.২ পূর্ণ এবং সমান সদস্যতা (Full And Equal Membership)

যদি কখনো তুমি ভিড়ে ঠাসা বাস অথবা রেলে ভ্রমণ করে থাক তাহলে দেখেছ যে কীভাবে লোকেরা ভিতরে প্রবেশ করার জন্য একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, একবার ভিতরে প্রবেশ করার পর প্রত্যেকেই চেষ্টা করে কীভাবে অন্যকে বের করে দেবে। তখন 'ভিতরের' এবং 'বহিরাগতদের' মধ্যে বিভাজন শুরু হয় যেখানে 'বহিরাগতদের' হুমকিস্বরূপ মনে করা হয়।

অনুরূপভাবে কোনো দেশে, অঞ্চলে অথবা শহরে আমরা একই ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পাই। যদি কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শিক্ষার মতো সুবিধাসমূহ, জল অথবা মাটির মতো প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে 'বহিরাগতদের' প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি উঠে। যদিও এই 'বহিরাগতরা' ওই দেশেরই নাগরিক। তোমার মনে থাকতে পারে যে, 'মুম্বাই শুধু মুম্বাইবাসীদের' এই স্লোগানটি উল্লেখিত বক্তব্যেরই উদাহরণ। পৃথিবীর ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এইধরনের আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে।

এই ঘটনাগুলো অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়, যেমন, পূর্ণ এবং সমান সদস্যতা' বলতে কী বোঝায়? এর অর্থ কি এই যে, রাষ্ট্রের যে কোনো প্রান্তেই বসবাস, অধ্যয়ন কিংবা কাজ করুক না কেন নাগরিকদের সমান অধিকার ও সুযোগের ব্যবস্থা থাকা উচিত? এর অর্থ কি এই যে ধনী কিংবা দরিদ্র সকল নাগরিকেরই কিছু মৌলিক অধিকার ও সুবিধা থাকা উচিত?

উল্লিখিত প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখেই এই অধ্যায়ে আমরা নাগরিকতার অর্থ ব্যাখ্যা করব। আমাদের দেশ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে নাগরিকদের দেওয়া অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম হল আন্দোলনের স্বাধীনতা। এই অধিকারটি শ্রমিকদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিজের জায়গায় সুযোগ না পেলে শ্রমিকরা কর্ম সংস্থানের খোঁজে অন্যত্র চলে যায়। এমনকি কিছু মানুষ কাজের সন্ধানে নিজ দেশ ছেড়েও চলে যায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য আলাদা বাজারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তথ্য ও প্রযুক্তির সাথে জড়িত কর্মীরা সাধারণত ব্যাঙ্গালোরের মত শহরের দিকে ধাবিত হয়। সারা দেশেই কেরল রাজ্যের সেবিকাদের (Nurse) পাওয়া যায়। শহরের ক্রমবর্ধমান ভবন নির্মাণ

মার্টিন লুথার কিং

১৯৫০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তার বিরুদ্ধে বিশাল গণঅধিকার আন্দোলন গড়ে উঠে। ওই রাজ্য সমূহে এধরনের বৈষম্যগুলো পরিচালিত হত এমন কিছু আইনের দ্বারা যাদের বলা হত বিভাজন আইন, (segregation Laws) এই আইনের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। এসকল আইনের সাহায্যে বিশেষ অঞ্চল তৈরি করা হতো যেখানে শ্বেতাঙ্গারা রেস্তোরাঁ, হোটেল, আবাসন, বিনোদন, বাস ও রেলের মতো নাগরিক সুবিধাগুলো উপভোগ করত।

এধরনের বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ছিলেন মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র)। লুথার কিং চলমান বৈষম্যমূলক আইনগুলোর বিরুদ্ধে নানা প্রকারযুক্তি তুলে ধরেন। প্রথমে, তিনি মনে করেন আত্মসম্মান এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে বর্ণ এবং সম্প্রদায়ভেদে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান। দ্বিতীয়ত, তিনি যুক্তি দেন যে, বিভাজন আইন রাজনৈতিক সত্তায় "সামাজিক কুষ্ঠরোগের' মতো, যা ওই আইনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মানসিকতায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে।

লুথার কিং আরও যুক্তি দেন যে, বিভাজন আইনের প্রচলন শ্বেতাঙ্গ মানুষের জীবনযাত্রার মানকেও ধ্বংস করে। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গারা কৃষ্ণাঙ্গদের উদ্যানে (পার্ক) প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে সেটি বন্ধ করে দেয় এবং এতে তারা নিজেরাও বিনোদন থেকে বঞ্চিত হয়। অনুরূপভাবে কিছু বেস বল খেলার দল বন্ধ হয়ে যায়, কারণ কর্তৃপক্ষ সে দলে কৃষ্ণাঙ্গদের অংশ গ্রহণ অস্বীকার করে। তৃতীয়ত, বিভাজন আইন মানুষের মধ্যে এক ধরনের কৃত্রিম দেওয়াল তৈরি করে যার ফলে সার্বিক স্বার্থ রক্ষায় পরস্পরকে সহায়তা করতে পারত না। এসকল কারণে লুথার কিং বিভাজন আইন বাতিল করতে চেয়েছিলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে তিনি শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস প্রতিবাদের ডাক দেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, "আমরা আমাদের সৃজনশীল প্রতিবাদী আন্দোলনকে সহিংস আন্দোলনের রূপ নিতে দেব না"।

শিল্প সারা দেশের নির্মাণ শ্রমিকদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে। রাস্তা নির্মাণের মতো পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। বিদ্যালয় কিংবা বাড়ির আশেপাশে ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এমন শ্রমিকদের সাথে হয়তো তোমার দেখা হয়।

বহিরাগত শ্রমিকরা যখন অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে কাজ করে তখন তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা প্রতিবাদী হয়ে উঠে। এমন দাবিও করা হয় যে কর্মসংস্থানের কিছু ক্ষেত্র শুধুমাত্র নিজ রাজ্যের অধিবাসী অথবা স্থানীয় ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। রাজনৈতিক দল এই বিষয়গুলোকে সহজে কাজে লাগায়। বহিরাগতদের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রতিবাদ সঙ্ঘবদ্ধ সহিংস আন্দোলনেও পরিণত হয়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়।

এরূপ আন্দোলনকে কি বৈধ বলা যায়? আমরা সকলে ব্যথিত হই যখন দেখি যে ভারতীয় শ্রমিকরা অন্য কোনো দেশে স্থানীয় লোকদের দ্বারা নিপীড়িত হয়। আমরা অনেকে এটাও ভাবি যে কাজের সন্ধানে দক্ষ ও শিক্ষিত শ্রমিকদের অন্যত্র যাওয়ার অধিকার আছে। অনেক রাষ্ট্র এ ধরনের দক্ষ শ্রমিকদের নিজ দেশের প্রতি আকৃষ্ট করে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু যদি কোনো এলাকায় কাজের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে সেখানকার স্থানীয়রা বহিরাগত শ্রমিকদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে। তাহলে প্রশ্ন উঠে, দেশের যেকোনো স্থানে পছন্দমত বসবাসের অথবা কাজের অধিকার কি স্বাধীন চলাফেরার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত?

আরেকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন । তাহল, কখনো কখনো দরিদ্র এবং দক্ষ অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতি আমাদের আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। যে সকল বহিরাগত দরিদ্র শ্রমিক আমাদের এলাকায় কাজের সন্ধানে আসে, আমরা তাদের সবসময় অভ্যর্থনা জানাই না, যা আমরা দক্ষ এবং বিত্তশালী কর্মীদের প্রতি করে থাকি। এই বিষয়টি যে প্রশ্নের জন্ম দেয়, তাহল দেশের যেকোনো প্রান্তে দক্ষ শ্রমিকরা যেভাবে বসবাসের কিংবা কাজের অধিকার পেয়ে থাকে, অদক্ষ কিংবা দরিদ্র শ্রমিকরাও কি অনুরূপ অধিকার পায়? দেশের সকল নাগরিকের জন্য 'পূর্ণ এবং সমান সদস্যতা' সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিনিয়ত বিতর্ক হয়।

যাই হোক, গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় এসকল তর্ক বিবাদ মাঝে মাঝে দেখা যায়। কীভাবে বিতর্কগুলোর সমাধান হবে? আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের দেওয়া মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্যতম হল প্রতিবাদের অধিকার। তবে শর্ত হল— এই অধিকার যেন দেশের ও জনগণের জীবন এবং সম্পত্তির কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না করে। দল গঠন, প্রতিবাদ সভার আয়োজন, গণমাধ্যমের ব্যবহার, রাজনৈতিক দলের প্রতি নিবেদন অথবা আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকরা বৃহত্তর জনমত এবং সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এ সকল ব্যাপারে আদালত যেকোনো রায় প্রদান করতে পারেন অথবা সরকারকে বিষয়টির যথাযথ সমাধানের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। যদিও এটি একটি ধীর পদ্ধতি কিন্তু

বহিরাগত শ্রমিকহীন ভারতীয় নগর জীবনের মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি দিন

এর মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রায় কখনো কখনো সফলতা আসে। যদি সকল নাগরিকদের পূর্ণ এবং সমান সদস্যতা প্রদানের নির্দেশাত্মক নীতিগুলো অনুসরণ করা হয়, তাহলে বিভিন্ন সময়ে ওঠে আসা সামাজিক সমস্যাগুলোর গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব। গণতন্ত্রের একটি মৌলিক নীতি হল সমাজের চলমান সমস্যাগুলোকে বল প্রয়োগের পরিবর্তে সালিশি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা। এটি নাগরিকতার অন্যতম দায়িত্ব।

চলো চিন্তা করি

- দেশব্যাপী নাগরিকদের স্বাধীন চলাফেরা এবং পেশার অধিকারের পক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলোকে পর্যালোচনা করো।
- কোনো এলাকায় কর্মসংস্থান এবং সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন ধরে বসবাসকারীদের কি প্রাধান্য থাকা উচিত?
- অথবা পেশা ও বৃত্তিমূলক মহাবিদ্যালয় সমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কি বহিরাগত ছাত্রদের জন্য কোটা নির্ধারণ করতে পারে?

৬.৩ - সমান অধিকার (Equal Rights)

এই পরিচ্ছেদে আমরা নাগরিকতার অন্য একটি দিক সম্পর্কে পর্যালোচনা করব। তাহল রাষ্ট্র ধনী অথবা দরিদ্র সকল নাগরিককেই কিছু মৌলিক অধিকার ও বেঁচে থাকার একটি ন্যূনতম মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেবে। আর এটাই সম্ভবত পূর্ণ এবং সমান সদস্যতার অর্থ। আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একদল মানুষের প্রতি লক্ষ রাখবো যারা হল শহুরে দরিদ্র। বর্তমান সরকার যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মোকাবিলা করছে তাহল শহুরে দরিদ্রদের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যা।

ভারতের প্রতিটি শহরে বিশাল সংখ্যক বস্তিবাসী এবং অবৈধ দখলকারীরা বসবাস করে। যদিও তারা খুব কম মজুরিতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কাজ করে, তবুও শহরের বাকি জনগণের চোখে তারা বহিরাগত ও অসমাদৃত। শহরের সম্পদ-সংকোচন, অপরাধ ও রোগ-ব্যাধি ছড়ানোর দায়ে তাদের অভিযুক্ত করা হয়।

শহরের বস্তিগুলোর অবস্থা খুবই বেদনাদায়ক। অনেক মানুষ ছোটো ছোটো ঝুপড়িতে গাদাগাদি করে থাকে, যেখানে ব্যক্তিগত শৌচাগার, পরিশ্রুত পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃ নিষ্কাশন ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থা নেই। বস্তিগুলোতে জীবন ও সম্পত্তির কোনো নিরাপত্তা নেই।

তথাপি শহুরে অর্থনীতিতে বস্তিবাসীরা শ্রমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে সকল পেশায় তারা নিয়োজিত থাকে তাহল ফেরিওয়ালা, সাফাই, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহস্থালির কাজ, পাইপ মিস্ত্রি, দিন-মজুর ইত্যাদি। ক্ষুদ্র ব্যবসা যেমন, সেলাই, বোনা - কাপড়, বাঁশ-বেতের কাজ, দর্জি ইত্যাদিও বস্তি এলাকায় বর্তমানে গড়ে উঠেছে। বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতা ও পরিশ্রুত জল বিতরণের মতো পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শহরগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক কম ব্যয় করে।

সরকার, এন জি ও এবং অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শহুরে দরিদ্রদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা পূর্বের থেকে বেড়েছে, তাছাড়া বস্তিবাসী নিজেরাও এ ব্যাপারে আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে শহুরের ফেরিওয়ালাদের ব্যাপারে একটি জাতীয় নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। বড়ো বড়ো শহরগুলোতে লক্ষাধিক ফেরিওয়ালা প্রায়ই পুলিশ এবং নগর অধিকারিকদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। ঘোষিত জাতীয় নীতিমালাটি ফেরিওয়ালাদের স্বীকৃতি প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তারা কোনো প্রকার হয়রানি ছাড়া নিজেদের পেশা চালিয়ে যেতে পারে।

বস্তির অধিবাসীরা ক্রমেই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং সেগুলো আদায়ের জন্য সংগঠিত হতে শুরু করেছে। এব্যাপারে কখনো কখনো তারা আদালতেরও দ্বারস্থ হচ্ছে। এমনকি ভোটদানের মতো রাজনৈতিক অধিকারটিও উপভোগ করা তাদের জন্য কষ্টকর।

নাগরিকতা, সমতা এবং অধিকার (Citizenship, Equality And Rights)

নাগরিকতা কেবলমাত্র একটি আইনগত ধারণা নয়। বিষয়টি সমতা এবং অধিকারের ধারণার সাথেও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ব্রিটিশ সমাজতত্ত্ববিদ টি এইচ মার্শাল (১৮৯৩ - ১৯৮১) এ ধরনের সম্পর্কের ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি ধারণা দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে নাগরিকতা হল "এমন একটি মর্যাদা যা সমাজের পূর্ণ সদস্যদের প্রদান করা হয়। এ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষেরা অধিকার প্রাপ্তি এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমান যার কারণে এই মর্যাদা তাদের প্রদান করা হয়।"

মার্শাল মনে করেন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পৌর এই তিন ধরনের অধিকার মূলত নাগরিকতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

নাগরিক অধিকার ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পদের সুরক্ষা দান করে, রাজনৈতিক অধিকার মানুষকে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণে সহায়তা করে। সামাজিক অধিকার ব্যক্তিকে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেয়। সবগুলো মিলে নাগরিকদের একটি মর্যাদা সম্পন্ন জীবন যাপনের ব্যাপারটিকে সম্ভব করে তুলে।

মার্শাল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকে এক ধরনের 'বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা' হিসাবে দেখতেন। এরূপ শ্রেণি-বৈষম্যের বিরূপ প্রভাবকে প্রতিহত করতে নাগরিকতা সকলের জন্য সমতার অধিকারটি নিশ্চিত করেছে। নাগরিকতা তাই একটি উন্নত, অখণ্ড এবং সুষম সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

নাগরিকতা, সমতা এবং অধিকার সমূহ (Citizenship, Equality and Rights)ঃ-

একজন সমাজ কর্মীর দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষাপটে সুপ্রিমকোর্ট বোম্বে বস্তিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করেন। ১৯৮৫ সালে ওলগা টেলিস বোম্বে পৌর নিগমের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটিতে ফেরিওয়ালাদের জন্য ফুটপাত অথবা বস্তিতে বসবাস করার অধিকার চাওয়া হয়, কারণ তাদের কর্মক্ষেত্রের আশে পাশে কোনো বিকল্প বসবাসের জায়গা নেই। যদি এখান থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের জীবিকার কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। সুপ্রিমকোর্ট বলেন, "সংবিধানের ২১ নং ধারায় বর্ণিত জীবনের অধিকারের মধ্যে জীবিকার অধিকারটিও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ফুটপাতবাসীদের যদি উচ্ছেদ করতে হয়, তাহলে তার আগে তাদের জন্য বিকল্প বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে, এটা তাদের আশ্রয় পাওয়ার অধিকার।"

কারণ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা দিতে হয়, যা বস্তিবাসী কিংবা ফুটপাতবাসীরা সহজে জোগাড় করতে পারেনা।

আমাদের সমাজে যে জনগোষ্ঠীগুলো ক্রমেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে তাদের মধ্যে উপজাতি এবং বনের অধিবাসীরা অন্যতম। নিজেদের মতো বেঁচে থাকার জন্য এ গোষ্ঠীগুলো বনজ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ক্রমাগত জনসংখ্যার চাপ, জীবিকার জন্য নতুন ভূমির প্রয়োজন এবং এদের ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পদের চাহিদা এ সকল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার প্রতি হুমকি স্বরূপ। বন এবং উপকূল এলাকায় অবস্থিত সম্পদ আহরণের প্রতি বাণিজ্যিক স্বার্থের ক্রমবর্ধমান চাপ বনের অধিবাসী এবং উপজাতিদের জীবন জীবিকার উপর আরেক ধরনের হুমকি, অনুরূপভাবে পর্যটন শিল্পও। দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেও কীভাবে এ জনগোষ্ঠীগুলোর জীবন জীবিকা ও আবাসনের অধিকারকে সুরক্ষিত করা যায় সে ব্যাপারে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি শুধু উপজাতি জনগোষ্ঠীকে নয়, বরং সকল নাগরিককেই প্রভাবিত করে।

কোনো সরকারের পক্ষে তার সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার এবং সুযোগের ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করা খুব সহজ নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলো ভিন্নভিন্ন হয় । কোনো এক সম্প্রদায়ের অধিকার এবং অন্য সম্প্রদায়ের অধিকার পরস্পর বিরোধী হতে পারে। নাগরিকের জন্য সমান অধিকারের অর্থ এই নয় যে একই নীতি সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। যেহেতু বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলো আলাদা, নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শুধু এটা নয় যে, এটি সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, বরং বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দাবি এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে নীতি প্রণয়ন করা উচিত।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে পরিবর্তনশীল পৃথিবী, অর্থনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থা নাগরিক অধিকারের একটি নতুন ব্যাখ্যা আশা করে। নাগরিকতা সম্পর্কিত সাধারণ

নাগরিকতা

রাজনৈতিক তত্ত্ব

আইন হল তার প্রথম ধাপ, কিন্তু এর ব্যাখ্যা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। এই প্রেক্ষাপটে যে প্রশ্নগুলো ওঠে আসে তার উত্তর পাওয়া খুব একটা সহজ নয়। সমান নাগরিকতার ধারণার অর্থ হল সকল নাগরিককে সমান অধিকার এবং সুরক্ষা প্রদান করা, নীতি প্রণয়নের সময় সরকার এই বিষয়টিকে নির্দেশাত্মকনীতি হিসাবে গ্রহণ করবে।

চলো চিন্তা করি

জিম্বাবোয়ের ভূমি বন্টন ব্যবস্থার উপর প্রকাশিত সরকারি তথ্যানুসারে প্রায় ৪,৪০০ শ্বেতাঙ্গ পরিবার সেখানকার ৩২ শতাংশ কৃষিজমির মালিক, যা প্রায় ১০ মিলিয়ন হেক্টর। অথচ ১০ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার মাত্র ৩৮ শতাংশ কৃষি জমির মালিক যা প্রায় ১৬ মিলিয়ন হেক্টর। শ্বেতাঙ্গ মালিকানাধীন জমিগুলো খুবই উর্বর এবং সেচ ব্যবস্থার আওতায়, অথচ কৃষ্ণাঙ্গ মালিকানাধীন জমিগুলো তুলনামূলকভাবে কম উর্বর ও সেচ ব্যবস্থার বাইরে। জমির মালিকানাজনিত ইতিহাসের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট হয় যে মাত্র একশ বছর পূর্বে শ্বেতাঙ্গারা স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের কাছ থেকে উর্বর জমিগুলো কৌশলে হাতিয়ে নেয়। যুগ যুগ ধরে শ্বেতাঙ্গারা এখন এখানেই আছে এবং নিজেদের জিম্বাবোয়ান হিসাবে পরিচয় দেয়। বর্তমানে জিম্বাবোয়ের মোট জনসংখ্যার ০.০৬ শতাংশ হল শ্বেতাঙ্গ। ১৯৯৭ সালে জিম্বাবোয়ের রাষ্ট্রপতি মোগাবে প্রায় ১৫০০ খামার অধিগ্রহণের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

নাগরিকতা সম্পর্কিত কোনো ধারণাটি তুমি জিম্বাবোয়ের শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের দাবির সমর্থনে অথবা বিরোধিতায় ব্যবহার করবে?

চলো চর্চা করি

তোমার বাড়ীতে অথবা বিদ্যালয়ে একসাথে বা পাশাপাশি কাজ করে এমন তিনটি শ্রমিক পরিবারের বিষয়ে অনুসন্ধান করো। তাদের জীবনের ব্যাপারে বিশদভাবে জানার চেষ্টা করো। তাদের পূর্ব পুরুষেরা কোথাকার? কখন, কেন এবং কীভাবে তারা এখানে এলো? এখানে তারা থাকে কোথায়? কতজন মিলে একই ঘরে বসবাস করে? তাদের কী কী সুযোগ সুবিধা আছে? তাদের সন্তানরা কি স্কুলে যায়?

চলো চর্চা করি

রাস্তার ফেরিওয়ালাদের ব্যাপারে খোঁজ নাও। (জীবিকা সুরক্ষা এবং রাস্তার ফেরিওয়ালা বৃত্তি) আইন ২০১৪

৬.৪ নাগরিক এবং জাতি (Citizen And Nation)

জাতি রাষ্ট্রের ধারণাটি আধুনিককালে বিবর্তিত হয়। জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা এবং নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কিত প্রাচীন ধারণাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবীদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়। জাতি রাষ্ট্রের ধারণাটি শুধুমাত্র ভৌগোলিক রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একই সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারক। জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, জাতীয় ভাষা এবং নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় প্রকাশ পেতে পারে।

অনেক আধুনিক রাষ্ট্রেই বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মানুষরা বসবাস করে। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের দেওয়া জাতীয় পরিচয় রাজনৈতিক পরিচয় দ্বারা প্রকাশিত হয় যা রাষ্ট্রের সকল সদস্যের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ তাদের পরিচয় এমনভাবে দেওয়ার চেষ্টা করে যাতে এটি যতদূর সম্ভব সর্বজনীন হয়। অর্থাৎ যা সকল নাগরিক নিজেদের জাতির অংশ হিসাবে পরিচয় প্রদান করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ রাষ্ট্র এমনভাবে নিজেদের পরিচয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে যাতে এটা অন্যদের তুলনায় সহজ হয়। এই পদ্ধতিটি কোনো রাষ্ট্রকে পছন্দ অনুসারে কিছু লোকের জন্য নাগরিকতা প্রদান ব্যবস্থাকে সহজ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সত্য যে অন্য দেশের মতো সে নিজেকে প্রবাসীদের দেশ হিসাবে গর্ববোধ করে।

উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্স এমন একটি দেশ যে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সর্বাত্মক বলে মনে করে। দেশটি শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের নাগরিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে তা নয় বরং উত্তর আফ্রিকার মতো অন্যান্য দেশের বংশোদ্ভূত মানুষদেরও নাগরিকতা প্রদান করে। সংস্কৃতি এবং ভাষা একটি দেশের জাতীয় পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাই সকল নাগরিক যেন তাদের জীবন যাপনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় অনুরূপ সংস্কৃতির ঐতিহ্যে নিজেদের একীভূত করে এটা প্রত্যাশা করা হয়। তবে ব্যক্তি জীবনে তারা প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাস এবং তার অনুশীলন করতে পারে। এ ধরনের নীতিকে যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও সামগ্রিক এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারটির ব্যাখ্যা কী এটা নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়, যার ফলে অনেক বিতর্ক তৈরি হয়। ধর্ম বিশ্বাস নাগরিকের ব্যক্তিগত পরিধির মধ্যে হলেও কখনো কখনো কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান তাদের সামগ্রিক জীবনকে প্রভাবিত করে। তোমরা হয়তো এটা শুনেছ ফ্রান্সের স্কুলে অধ্যয়নরত শিখ সম্প্রদায়ের ছাত্ররা নির্ধারিত পোশাকের পাশাপাশি পাগড়ি এবং মুসলিম মেয়েরা মাথায় স্কার্ফ বা ওড়না পরার অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেছিলেন, কিছু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে অনুমতি দেয়নি এই যুক্তিতে যে ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাস জনিত আচরণ বা অভ্যাস দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবেশকে প্রভাবিত করবে। যে সকল ধর্ম বিশ্বাসে এধরনের অভ্যাস বাধ্যতামূলক নয়, তাদের জন্য কোনো সমস্যা হয়না। এতে এটা পরিষ্কার যে জাতীয় সংস্কৃতিতে একীভূত হওয়া কারোর জন্য কঠিন, কারোর জন্য সহজ।

নতুন আবেদনকারীদের নাগরিকতা প্রদানের শর্তসমূহ দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ইজরাইল এবং জার্মানির মত দেশে ধর্ম, জাতিগত পরিচয় ইত্যাদি শর্তগুলো নাগরিকতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। জার্মানিতে কর্মরত ওই সকল তুর্কি শ্রমিকরা যাদের কোনো একসময় এখানে এসে কাজ করার জন্য সরকারিভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল, তারা ক্রমাগত দাবি করে যাচ্ছে তাদের যে সকল সন্তান জার্মানিতে জন্ম নিয়েছে এবং বড়ো হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই তারা জার্মান নাগরিকতা পাওয়ার অধিকারী, বিষয়টি নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে। এই উদাহরণগুলোতে নাগরিকতা সম্পর্কে কিছু সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে এবং একই উদাহরণ যে সকল গণতান্ত্রিক দেশ নিজেদের নাগরিকতা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ও উদার বলে মনে করেন তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ভারত নিজেকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং জাতিরাষ্ট্র বলে মনে করে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও একটি বৃহত্তর ভিত্তি ছিল যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি এবং এলাকার মানুষদের নিয়ে একসাথে চলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হয় কারণ মুসলিম লিগের সাথে মতভেদগুলো সমাধান করা যায়নি। কিন্তু এ বিষয়টি ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের সংকল্পকে গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নির্মাণ আরও সুদৃঢ় করেছে। এই সংকল্পটি ভারতের সংবিধানেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতের সংবিধান বহুধাবিভক্ত সমাজকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে। যেমন আধুনিক সভ্যতা থেকে দূরে থাকা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সমান অধিকারের সুবিধা-বঞ্চিত নারী, তপশিলী জাতি এবং উপজাতি সহ অন্যান্য সকলকে ভারতের সংবিধান পূর্ণ এবং সমান নাগরিকতা প্রদানের চেষ্টা করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বৈচিত্র্যময় ভাষা, ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও অনুশীলন সমূহকেও নিজের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছে। সংবিধান সকলের জন্য সমান অধিকারের ব্যবস্থা করেছে কিন্তু কাউকেই তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাষা কিংবা রীতিনীতি ত্যাগ করার জন্য কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ করেনি। এটা ছিল ভারতীয় সংবিধানের অতুলনীয় অভিজ্ঞতা এবং প্রয়াস। দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগের সমন্বয় প্রর্দশন করা হয়।

সংবিধানে উল্লিখিত নাগরিকতা সম্পর্কিত ধারাগুলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং পার্লামেন্টে পাশ হওয়া সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে পাওয়া যায়। সাধারণ নাগরিকতা বিষয়ে সংবিধান গণতান্ত্রিক এবং সর্বাত্মক নীতির আদর্শকে গ্রহণ করেছে। ভারতে জন্মসূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে, নিবন্ধিকরণ, সাধারণীকরণ অথবা নতুন ভৌগোলিক এলাকা সংযুক্তি করণের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন করা যায়। নাগরিকের অধিকার এবং দায়িত্ব সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে। সংবিধানে এটাও উল্লেখ আছে যে, রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্য করতে পারবেনা। ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকারও সংবিধানে সুনিশ্চত করা হয়েছে।

তথাপি, এ ধরনের নাগরিকতা ও অধিকার সম্পর্কিত সর্বাঙ্গীন শর্তগুলো বিবাদ ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। নারী আন্দোলন, দলিত আন্দোলন অথবা উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের আন্দোলন হল এই ধরনের কিছু বিবাদ বিতর্কের উদাহরণ যেখানে মানুষ মনে করে যে তারা নাগরিকতার সার্বিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ভারতের অভিজ্ঞতায় এটা ইঙ্গিত করে যে কোনো দেশে গণতান্ত্রিক নাগরিকতা হল এক ধরনের প্রকল্প বা আদর্শ যা পূরণে সে কাজ করে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এবং নিজেদের বঞ্চিত ও প্রান্তিক ভাবা মানুষগুলোর নতুন দাবি উত্থাপনের প্রেক্ষাপটে নিত্য নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই দাবিগুলোকেও আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে হয়।

চলো বিতর্ক করি

বিদ্যালয় কিংবা সেনাবাহিনীর মতো সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সার্বজনীন পোশাক পরিধানকে বাধ্য করা এবং পাগড়ির মতো ধর্মীয় কোনো প্রতীক নিষিদ্ধ করা উচিত হবে না।

৬.৫ সর্বজনীন নাগরিকতা (Universal Citizenship)

উদ্বাস্তু অথবা অবৈধ শরণার্থীদের কথা ভাবলে আমাদের মনে অনেক ছবি ভেসে আসে। তার মধ্যে একটি হল এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অনেক মানুষ যারা প্রচুর অর্থ দিয়ে দালালদের মাধ্যমে অবৈধভাবে ইউরোপ অথবা আমেরিকা যাবার চেষ্টা করে। এটি একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তবুও তারা চেষ্টা করে। অন্য একটি ছবি হল এমন মানুষদের যারা যুদ্ধ অথবা দুর্ভিক্ষের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়। এইসকল ঘটনাগুলো আমরা প্রায়ই দূরদর্শনের পর্দায় দেখতে পাই। সুদান, ফিলিস্তিন, বার্মা অথবা বাংলাদেশের শরণার্থীদের মতো এরকম অনেক উদাহরণ আছে। এমন পরিস্থিতি মানুষদের নিজের দেশে কিংবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছে।

আমরা প্রায়ই মনে করি যে যারা কোনো দেশে সাধারণভাবে বসবাস করে এবং কর্ম করে পাশাপাশি ওই সকল মানুষ যারা নাগরিকতার জন্য আবেদন করে, তাদের সকলকেই পূর্ণ সদস্যতা দেওয়া উচিত। কিন্তু যদিও অনেক রাষ্ট্র সর্বাত্মক এবং সর্বজনীন নাগরিকতা প্রদানের আদর্শকে সমর্থন করে, এইক্ষেত্রে তারাও বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে। এই শর্তগুলো সাধারণত সে দেশের সংবিধান ও আইনের ধারায় লিপিবদ্ধ থাকে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে অযাচিত ব্যক্তিদের বিতাড়িত করতে চায়।

তবে এসকল আইনি সীমাবদ্ধতা এমনকি সীমান্তে বেড়া নির্মাণ ও বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আভিবাসীদের ভিড় দেখা যায়। মানুষ সাধারণত যুদ্ধ, নিপীড়ন, দুর্ভিক্ষ অথবা অন্য কোনো কারণে বাস্তুচ্যুত হয়। যদি কোনো রাষ্ট্র তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তারা স্বদেশে ফিরে যেতে পারে না। এই অবস্থায় তারা অবৈধ উদ্বাস্তু কিংবা

রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে। এই সকল লোকেরা অবৈধ শরণার্থী হিসাবে শিবিরে থাকতে বাধ্য হয়। আইনগতভাবে তারা কোনো কাজ করতে পারে না, সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারেনা অথবা কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। এইসমস্যাটি এতই জটিল যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এধরণের শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য একজন "হাই কমিশনার" নিযুক্ত করেছেন।

একটি রাষ্ট্র কী পরিমাণ মানুষকে নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ অনেক রাষ্ট্রের জন্য এটি একটি বিশাল মানবিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা। অনেক রাষ্ট্রেই যুদ্ধ অথবা নিপীড়নের কারণে পালিয়ে আসা লোকদের গ্রহণ করা সম্পর্কিত আইন বা নীতি বর্তমান। কিন্তু তারা এত অধিক সংখ্যায় লোক আশা করে না যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কিংবা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি হুমকি স্বরূপ। ভারত একটি গর্বিত দেশ কারণ সে নিপীড়িত লোকদেরকে আশ্রয় দেয়, যেমন ১৯৫৯ সালে তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা ও তাঁর অনুসারীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ভারতের প্রায় সকল রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অসংখ্য মানুষ অনুপ্রবেশ করেছে এবং এধারা এখনো অব্যাহত। এরূপ অনেক মানুষ বছরের পর বছর রাষ্ট্রহীন হয়ে আছে, তারা হয় কোনো নির্দিষ্ট শিবিরে অথবা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে কোথাও অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে অতি সামান্য কিছু সংখ্যক লোকেদের নাগরিকতা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল সমস্যাগুলো গণতান্ত্রিক নাগরিকতা প্রদান সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারের প্রতি একরকম হুমকি, কারণ গণতান্ত্রিক নাগরিকতার অর্থ হল সমসাময়িক পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য নাগরিকতা এবং অধিকার সুরক্ষিত করা। অবশ্য মানুষ যখন তার পছন্দমত কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকতা পায় না তখন তার জন্য অন্য বিকল্প অবশিষ্ট থাকে না।

রাষ্ট্রহীন জনগণের বিষয়টি বর্তমান পৃথিবীর একটি জ্বলন্ত সমস্যা। রাজনৈতিক সংঘাত এবং যুদ্ধের কারণে অনেক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমান্তও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং সংঘাতের শিকার মানুষেরা পরবর্তীতে করুণ পরিণতির মুখোমুখি হচ্ছে। তারা দেশ হারায়, রাজনৈতিক পরিচিতি ও নিরাপত্তা হারায় এবং বাধ্য হয় অন্য দেশের শরণ নিতে। নাগরিকতা কী ধরনের সমস্যার সমাধান দিতে পারে? যদি না হয়, তাহলে কী ধরনের বিকল্প পরিচিতি বর্তমানে প্রদান করা যায় ? আমরা কি এটা চেষ্টা করতে পারি যে জাতীয় পর্যায়ে নাগরিকতার বাইরে কীভাবে বিকল্প হিসাবে একটি বিশ্বজনীন কিংবা সর্বজনীন পরিচিতির ব্যবস্থা করা যায়? কখনো কখনো বিশ্বনাগরিকতার ধারণার উপর অনেক পরামর্শ সামনে এসেছে। এগুলোর সম্ভাব্যতা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে।

চলো চর্চা করি

বর্তমান ভারতে বসবাসকারী রাষ্ট্রহীন নাগরিকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। এদের যে কোনো একটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

৬.৬ বিশ্ব নাগরিকতা (Global Citizenship)

নীচের মন্তব্যগুলো বিবেচনা করো :

- ২০০৪ সালে সুনামিতে প্রভাবিত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য সীমাহীন সাহায্য এবং সহানুভূতির প্রবল বর্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীরা একে অপরের সাথে যুক্ত হচ্ছে।
- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে 'বার্ড ফ্লু' কিংবা বিশ্বব্যাপী মানুষের জন্য ক্ষতিকারক কোনো ভাইরাসের বিস্তার রোধে ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে।

উল্লেখিত বক্তব্যগুলোতে কী কী সাদৃশ্য আছে? বর্তমানে আমাদের বাস করা এই পৃথিবী সম্পর্কে তারা কী বলে?

বর্তমানে আমরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত পৃথিবীতে বসবাস করছি। যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইনটারনেট, টেলিভিশন, এবং মুঠো ফোনের মতো নতুন প্রযুক্তি পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে ক্রমাগত পাল্টে দিচ্ছে। অতীতে পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তের উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য জানতে বিপরীত প্রান্তের লোকেদের মাসের পর মাস লেগে যেত। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলমান উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা নিমেষেই জানতে পারি। চলমান বিপর্যয় এবং যুদ্ধের অবস্থা আমরা তাৎক্ষণিকভাবেই টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই। এ ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করছে।

বিশ্ব নাগরিকতার সমর্থকদের মতে, যদিও বিশ্ব সম্প্রদায় এবং বৈষয়িক সমাজ বলতে কোনো কিছু এখনো মূর্ত হয়ে ওঠেনি, তবুও পৃথিবীর মানুষ জাতীয় সীমানার বাইরেও নিজেদের পরস্পরের প্রতি সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করছে। তারা মনে করে যে, সুনামিতে কিংবা পৃথিবীর বৃহত্তর বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি অপর প্রান্তের মানুষের অফুরন্ত সাহায্য ও সহযোগিতা বিশ্ব সমাজের আবির্ভাবের এক অনন্য উদাহরণ। তারা অনুধাবন করে যে বিশ্ব নাগরিকতার এ ধারণা এবং অনুভূতিকে আরও শক্তিশালী করা উচিত।

জাতীয় নাগরিকতার ধারণা দাবি করে যে পৃথিবীতে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য রাষ্ট্র আমাদের অধিকার এবং সুরক্ষা প্রদান করে। কিন্তু রাষ্ট্র এ ধরনের অনেক সমস্যার সম্মুখীন

হয় যা সহজে সমাধান করতে পারেনা। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিশ্রুত অধিকারগুলো মানুষের স্বাধীনতা সুরক্ষা দিতে কি সক্ষম? অথবা মানবাধিকার এবং বিশ্বনাগরিকতার ধারণার প্রতি অগ্রসর হওয়ার এটাই কি উপযুক্ত সময় নয়?

বিশ্বনাগরিকতার অন্যতম প্রধান গুরুত্ব হল এই যে এটি আন্তর্জাতিক সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সমন্বয় গড়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং রাষ্ট্রহীন নাগরিকদের নিয়ে উদ্ভুত সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান করতে পারে। অথবা তারা যে সকল রাষ্ট্রে বসবাস করে সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় মানবিক অধিকারগুলো সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করতে পারে।

পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগত সমস্যার কারণে কোনো রাষ্ট্রে নাগরিকের সাম্যের অধিকারকে লঙ্ঘন করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র এবং সেখানকার জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এধরনের সমস্যার সার্বিক সমাধান করা সম্ভব। সুতরাং বর্তমানে সকল নাগরিকের কাছেই সম্পূর্ণ এবং সমান মর্যাদার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিশ্বনাগরিকতার ধারণা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জাতীয় নাগরিকতার ভিত্তি হোক উদার এবং মানবিক মূল্যবোধ, যাতে পৃথিবীর প্রতিটি নাগরিক বিশ্ব সমন্বয় ও পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব অনুভব করে এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে সকলের সাথে একাত্ম হতে পারে।

অনুশীলনী

১) কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পরিপূর্ণ এবং সমান মর্যাদা সম্পন্ন নাগরিকত্বের ধারণা কিছু অধিকার ও বাধ্য বাধকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ কী কী অধিকার প্রত্যাশা করে? রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশীর প্রতি নাগরিকদের কী ধরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে?

২) রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের জন্য সমানাধিকার স্বীকৃত হলেও এই অধিকার গুলি সকলে সমানভাবে ভোগ করতে পারেনা। বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করো।

৩) সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে সংঘটিত এমন যেকোনো দুটি ঘটনা ব্যাখ্যা করো যেখানে নাগরিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে কী ধরনের অধিকার দাবি করা হয়?

৪) শরণার্থীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা উল্লেখ করো। বিশ্ব নাগরিকতার ধারণা কীভাবে তাদের সহায়তা করতে পাবে?

৫) স্থানীয় অধিবাসীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্থানান্তরিত জনগণদের বসবাসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। স্থানান্তরিত জনগণ স্থানীয় অর্থনীতিতে কী কী ভাবে সাহায্য করতে পারে?

৬) ভারতের মতো দেশে যেখানে নাগরিকদের সমান অধিকার স্বীকৃত সেখানে গণতান্ত্রিক নাগরিকত্ব শুধু প্রতিষ্ঠিত স্থিতিশীল বিষয় নয়, এটি একটি গতিশীল পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা। সাম্প্রতিককালে ভারতে উত্থাপিত নাগরিকত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনা করো।

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই অধ্যায়ে জাতি এবং জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ধারণাসমূহের আলোচনা ও পরিচয় করানো হবে। জাতীয়তাবাদের ধারণা কেন উত্থাপিত হল বা তার কার্যকারিতা কি শুধুমাত্র এ বিষয়গুলোতে আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত থাকবে না, বরং আমাদের মূল কাজ হবে জাতীয়তাবাদের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত দাবি ও আকাঙ্ক্ষাগুলোর সঠিক মূল্যায়ন করা। এই অধ্যায়টি পাঠ করে তোমরা জানতে সমর্থ হবে -

- জাতি ও জাতীয়তাবাদের ধারণাসমূহ।
- জাতীয়তাবাদের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে।
- গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মূল্যায়ন করতে পারবে।

৭.১ জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত (Introducing Nationalism)

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণা কী, এই বিষয়টি যাচাই করলে আমরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারি সেগুলো হল দেশাত্মবোধ, জাতীয় পতাকা, দেশের জন্য আত্মবলিদান ইত্যাদির মতো কিছু বিষয়। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি আকর্ষণীয় প্রতীক যা রাষ্ট্রের ক্ষমতা, শক্তি এবং বৈচিত্রতার মতো বিষয়গুলোকে বর্ণনা করে। বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব যে, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞায় উপনীত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। তার অর্থ এই নয় যে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়ার চেষ্টা আমরা ছেড়ে দেব। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অঙ্গনে এর ভূমিকা অপরিসীম।

বিগত দুই শতাব্দী কিংবা তারও বেশি সময় ধরে জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে যা ইতিহাসকে ভিন্ন একটি রূপ দিতে সাহায্য করেছে, এটি মানুষকে গভীর আনুগত্যে পাশাপাশি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষেরও উৎসাহ দেয়। এই ধারণাটি মানুষকে ঐক্যের দিকেও ধাবিত করে, আবার বিভাজিতও করে, দুঃশাসনের নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেয় এবং যুদ্ধ বিগ্রহ, তিক্ততা ও সংঘর্ষের কারণ হিসাবেও কাজ করে। রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যের বিভাজনের পেছনে জাতীয়তাবাদের অবদান থাকে। জাতীয়তাবাদের দ্বারা সৃষ্ট সংগ্রাম বহু রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ এবং পুণঃনির্ধারণের উৎসাহ জুগিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর একটি বিশাল অংশ জাতি-রাষ্ট্রের দ্বারা বিভাজিত দেবে সে রাষ্ট্রগুলো ভৌগোলিক সীমারেখার পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি এখনো শেষ হয়নি এবং এদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এখনো চলছে।

জাতীয়তাবাদের ধারণাটি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ উনিশ শতকের ইউরোপে এজাতীয় ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক ছোটো ছোটো রাজ্য মিলে বৃহত্তর জাতি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়ের জার্মানি এবং ইতালি এরূপ একত্রীকরণ ও সুদৃঢ়করণ ব্যবস্থার প্রতিফলন, লাতিন আমেরিকায়ও অনেক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সীমানার পুণঃনির্ধারণের পাশাপাশি স্থানীয় ভাষা এবং স্থানীয় আনুগত্য ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় ভাষায় ও আনুগত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। জাতীয় রাষ্ট্রের সদস্যতা অর্জন করার মাধ্যমে জনগণ নতুন রাজনৈতিক পরিচিতি লাভ করেছে। বিগত শতাব্দীতে দেখা গেছে আমাদের দেশেও এধরনের ভৌগোলিক একত্রীকরণ ও সমন্বিতকরণের ঘটনা ঘটেছে।

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউরোপের অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিয়ান এবং রুশ সাম্রাজ্য, পাশাপাশি এশিয়া ও আফ্রিকায় গড়ে উঠা ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ এবং পর্তুগিজদের মতো বিশাল সাম্রাজ্যগুলো জাতীয়তাবাদ উত্থাপনের কারণে ভেঙে-চুরে খান খান হয়ে গেছে। ভারত এবং অন্যান্য দেশের মানুষরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি যে সংগ্রাম চালিয়েছিল সেগুলোও জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, তবে এর পেছনে অনুপ্রেরণা ছিল একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিদেশি নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন হওয়ার দৃঢ় সংকল্প।

রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রক্রিয়া এখনো চলছে। ১৯৬০ এর দশক থেকে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অনেক জাতি রাষ্ট্র ও পৃথক রাষ্ট্রের দাবিদার কোনো কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। বর্তমানে আমরা লক্ষ করছি যে পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশ বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলোকে বিভক্ত করার হুমকি দিচ্ছে। এধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বর্তমান কানাডার কুইবেক, উত্তর স্পেনের বেসকুইস, তুর্কি এবং ইরাকের কুর্দ ও শ্রীলঙ্কার তামিলদের মধ্যে চলছে। ভারতের মধ্যে কিছু গোষ্ঠী ভাষাগত জাতীয়তাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আরব দেশগুলোর মধ্যে পেন-আরব নামে আরবি জাতীয়তাবাদ দেশগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বেসকুইস অথবা কুর্দিদের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ভাঙার চেষ্টা করছে।

এ বিষয়ে আমরা সকলে একমত হতে পারি যে, বর্তমান পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদ একটি শক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু জাতি বা জাতীয়তাবাদের উপর সর্বসম্মত কোনো ব্যাখ্যায় উপনীত হওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। জাতি কী? মানুষরা কেন জাতি গঠন করে এবং এর থেকে কী আশা করে? কেন এবং কীভাবে জাতীয়তাবাদের প্রত্যাশা রাষ্ট্রবাদের প্রত্যাশার সাথে সম্পর্কিত? কোনো জাতির কি রাষ্ট্রবাদের কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে? অথবা পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া জাতীয়তাবাদী প্রত্যাশা পূরণ কি সম্ভব? এই অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

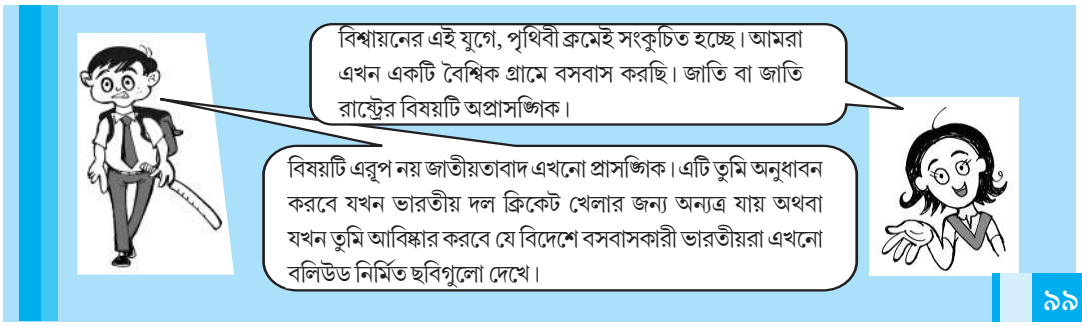

৭.২ জাতি এবং জাতীয়তাবাদ (Nations and Nationalism)

জাতি বলতে হঠাৎ করে সংগঠিত হওয়া কোনো জনগোষ্ঠীকে বোঝায় না। একই সাথে মনুষ্য সমাজে বসবাসকারী সাধারণ কোনো সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী থেকেও এটি আলাদা। একটি পরিবারের মানুষরা যেখানে একে অপরের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানে এবং প্রত্যেক সদস্যই একে অপরের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, এমন পরিবার থেকেও জাতি বিষয়টি পৃথক বা আলাদা। জাতি বলতে আমরা যা বুঝি তা কোনো আদিবাসী, জাতি-উপজাতি বা আত্মীয়তাবদ্ধ কোনো গোষ্ঠী থেকেও আলাদা কারণ উল্লিখিত প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীগুলো বংশ পরম্পরাগত সম্পর্ক, বিবাহ ইত্যাদির দ্বারা পরস্পর সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে যদি আমরা ব্যক্তিগতভাবে সকলকে নাও চিনি তবুও তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের সূত্রগুলো খুঁজে পেতে পারি। কিন্তু একটি জাতির সদস্য হিসাবে আমরা কখনওই বেশিরভাগ নাগরিকের মুখোমুখি হই না, কোনো বংশ পরম্পরাগত কিংবা অন্য কোনো সম্পর্কের দ্বারাও যুক্ত নেই, এটা প্রয়োজনীয় নয়। তবুও জাতির অস্তিত্ব আছে, তার সদস্যদের দ্বারা বেঁচে আছে, এর প্রতি সদস্যদের প্রশ্নাতীত আনুগত্যও আছে।

সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, জাতি গঠিত হয় এমন জনগোষ্ঠী দ্বারা যাদের উত্তরাধিকার, ভাষা, ধর্ম অথবা জাতি সত্তার মতো বৈশিষ্ট্যগুলো সমপর্যায়ভুক্ত। তবে এটাও সত্য যে জাতিসমূহের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলো সমপর্যায়ের হয় না। অনেক জাতি রাষ্ট্রেই সকল মানুষ একই ভাষায় কথা বলে না। উদাহরণ হিসাবে কানাডার নাম নেওয়া যেতে পারে, যেখানে ইংরেজি ও স্পেনীয় ভাষা-ভাষী দুধরনের মানুষই বসবাস করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, এমন ভাষার সংখ্যা প্রচুর। অনেক জাতি রাষ্ট্রেই সকল মানুষ কোনো একটি সর্বজনীন ধর্মের মধ্যে একীভূত হয়নি। সম্প্রদায় এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়।

তাহলে প্রশ্ন আসে কীভাবে জাতি গঠিত হয়? বৃহত্তরভাবে বলতে গেলে জাতি হল একটি 'কাল্পনিক সম্প্রদায়' যারা সম্মিলিত বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা এবং অনুভূতির দ্বারা একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এটি এমন কতগুলো অনুমানের উপর নির্ভরশীল যা ওই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল মানুষ সমবেতভাবে গ্রহণ করে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। চলো যৌথভাবে গ্রহণকৃত ওই সকল অনুমানগুলোকে চিহ্নিত করে বোঝার চেষ্টা করি।

চলো চর্চা করি

তোমার নিজস্ব ভাষায় রচিত একটি দেশাত্মবোধক গান বাছাই করো, এ গানটিতে কীভাবে জাতিকে বর্ণনা করা হয়েছে? তোমার মাতৃভাষায় নির্মিত একটি দেশাত্মবোধক ছায়াছবি চিহ্নিত করো এবং সেটি দেখো। ছবিটিতে জাতীয়তাবাদ এবং এর সাথে যুক্ত জটিলতাসমূহ কীভাবে চিত্রায়িত হয়েছে?

জাতীয়তাবাদ

রাজনৈতিক তত্ত্ব

জাতীয়তাবাদ

যৌথ বিশ্বাস (Shared Beliefs)

প্রথমত, বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ে ওঠে। জাতি কোনো পাহাড়, নদী কিংবা অট্টালিকার মতো নয়, যাদের দেখা এবং অনুভব করা যায়। এগুলো এমন কোনো বস্তু নয় যা মানুষের বিশ্বাস নিরপেক্ষ। বলতে গেলে জাতি সম্পর্কে মানুষ তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারের প্রতি কোনো প্রকার মন্তব্য করতে পারে না। সুতরাং জাতি হল কোনো গোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচিতি এবং ভবিষ্যৎ কল্পনা যার মাধ্যমে তারা একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা নির্মাণের চেষ্টা করে, এক্ষেত্রে জাতিকে একটি সংগঠিত দলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আমরা যখন কোনো দলের কথা বলি, তার অর্থ হল সংগঠিত কিছু মানুষ যারা দলবদ্ধভাবে কোনো কাজ করে অথবা খেলাধুলা করে এবং তারা নিজেদেরকে একটি সুসংগঠিত জোট বলে মনে করে। যদি তারা সুসংহত এবং সমষ্টিগতভাবে কাজ সম্পাদন না করে তাহলে নিশ্চয়ই তাদের দল বলা যাবে না, বরং প্রত্যেকেই খেলাধুলা কিংবা অন্য কোনো কাজের একক ব্যক্তিতে পরিণত হবে। একটি জাতির অস্তিত্ব তখনই টিকে থাকে যখন তার সদস্যরা বিশ্বাস করে যে তারা প্রত্যেকেই পরের তরে।

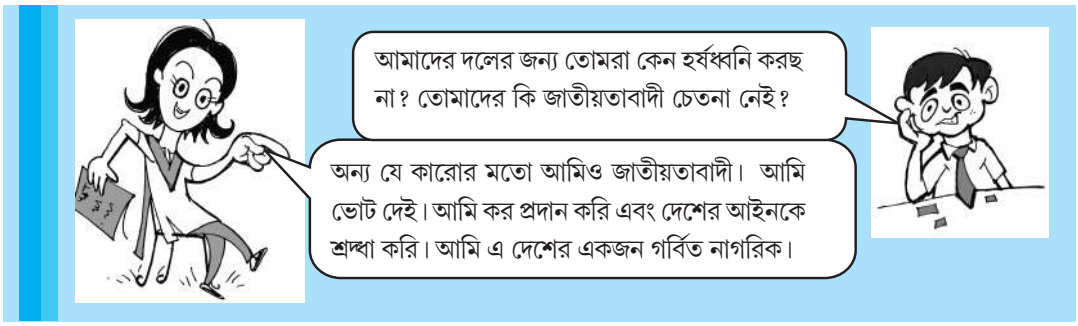

ইতিহাস (History)

দ্বিতীয়ত, যে সকল মানুষ নিজেদের জাতি হিসাবে মনে করে তারা একসাথে এবং ধারাবাহিকভাবে কিছু ঐতিহ্যগত পরিচয় বহন করে। তার অর্থ হল একটি জাতি সুদূর অতীতেও নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় এবং অনাগত ভবিষ্যতেও অনুরূপ অস্তিত্ব অনুভব করে। নিজের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য জাতি নিজের সামগ্রিক স্মৃতিসম্ভার, লোককথা এবং ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহকে চেতনায় ও চর্চায় আঁকড়ে রাখে। তাই, ভারতে জাতীয়তাবাদীরা তার অতীত সভ্যতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং অন্যান্য মহৎ কীর্তিগুলোকে নিজেদের দাবির স্বপক্ষে উপস্থাপন করে। দাবিটি হল এই যে, ভারতীয় সভ্যতার একটি সুদীর্ঘ এবং ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, প্রবহমান এই সভ্যতা ও অখণ্ডতা হল জাতি হিসাবে ভারতীয়দের মূল ভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ যেমন জওহরলাল নেহেরু নিজের লেখা 'দি ডিসকভারি অফ্ ইন্ডিয়া' নামক

বইতে লিখেছেন, "যদিও বাহ্যিকভাবে মানুষের মধ্যে অসংখ্য বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা বিদ্যমান কিন্তু সর্বত্রই অপূর্ব ঐক্য ও অখণ্ডতার ভাব বিরাজমান যা শত রাজনৈতিক পতন ও দুর্দশার মধ্যেও হাজার বছর ধরে আমাদের সকলকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে।"

ভূখণ্ড (Territory)

তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের দ্বারাও জাতি তার পরিচিতি লাভ করে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে দীর্ঘ সময় ধরে একসাথে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ইতিহাসও সামগ্রিকভাবে একই হয় এবং এর মাধ্যমে জাতি হিসাবে সমষ্টিগত পরিচিতি লাভ করে। যা তাদের সমগোত্রীয় লোক হিসাবে নিজেদের ভাবতে সাহায্য করে। সুতরাং এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে, যারা নিজেদের জাতি হিসাবে মনে করে তারা একটি নির্দিষ্ট মাতৃভূমি বা ভূখণ্ডের কথা বলে। যে ভূখণ্ডে তারা বসবাস করে তাদের জীবনে এর একটা পৃথক এবং বিশেষ মর্যাদা আছে। তারা দাবি করে, এ ভূখণ্ড শুধু আমাদের। জাতিসমূহ নিজেদের স্বদেশ ভূমিকে নানারকম বিশেষণ দিয়ে থাকে। যেমন - মাতৃভূমি, পিতৃভূমি অথবা পবিত্রভূমি। উদাহরণস্বরূপ ইহুদি লোকেদের ব্যাপারে বলা যেতে পারে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক কিংবা বিচ্ছিন্ন থাকুক তারা মনে করে তাদের মূল বাসভূমি হল ফিলিস্তিন বা 'প্রতিশ্রুত দেশ'। ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতিরা নদী, পাহাড় অথবা অঞ্চলের নামে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। তবে যখন একাধিক জনগোষ্ঠী একই ভূখণ্ডের উপর নিজেদের দাবি উপস্থাপন করে, তখন নিজেদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি বর্তমান পৃথিবীর রাজনৈতিক সংঘর্ষের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যৌথ রাজনৈতিক মতাদর্শ (Shared Political Ideals)

চতুর্থত, অভিন্ন এবং অখণ্ড অনুভূতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে যখন ভূখণ্ড ও যৌথ পরিচয়ের ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তখন ভবিষ্যৎ ভিত্তিক সমষ্টিগত লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা একটি স্বাধীন রাজনতিক অস্তিত্বের জন্ম দেয়, যা জাতি থেকে সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র করে তোলে। একটি জাতির সদস্যরা এমন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে যা তারা নির্মাণের চেষ্টা করে, এ জন্য তারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং উদারনীতিবাদের মতো কিছু নীতি আদর্শ গ্রহণের সংকল্প করে। এই নীতি আদর্শগুলো এমন কিছু পরিভাষাকে প্রতিনিধিত্ব করে যার মাধ্যমে জাতির সকল সদস্য সমষ্টিগতভাবে জীবন যাপন করে। অন্য কথায় এগুলো একটি জাতির রাজনৈতিক পরিচিতি বহন করে।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকরা সমষ্টিগতভাবে এমন কিছু রাজনৈতিক নীতি আদর্শ নির্মাণ করে যেগুলো ওই জাতি রাষ্ট্রের কিংবা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যরা কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এধরনের দায়বদ্ধতা নাগরিকদের পারস্পরিক অধিকারের স্বীকৃতি ও মর্যাদার মধ্য থেকে জন্ম

জাতীয়তাবাদ

নেয়। একটি জাতি শক্তিশালী হয় যখন তার নাগরিকরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্য পরায়ণ হয়ে ওঠে। আমরা এটাও বলতে পারি যে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা একটি জাতির প্রতি তার নাগরিকদের আনুগত্যে প্রকৃত পরীক্ষা।

সমষ্টিগত রাজনৈতিক পরিচয় (Common Political Identity)

অনেকেই বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রতি সমবেত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সেখানে বসবাসকারী সকল ব্যক্তিকে ঐক্যসূত্রে গাঁথার জন্য যথেষ্ট নয়। পরিবর্তে তারা চায় সমষ্টিগত উত্তরাধিকার অথবা ভাষার মতো কোনো সর্বজন গ্রহণযোগ্য সাংস্কৃতিক পরিচয়। কোনো সন্দেহ নেই যে একই ভাষায় কথা বলা আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগকে সহজ করে তুলে। অনুরূপভাবে একই ধর্ম, একগুচ্ছ সমবেত বিশ্বাস এবং সমষ্টিগত আচরণের জন্ম দেয়, যা আমাদের ভাব বিনিময়কে আন্তরিক করে তোলে। উৎসবসমূহের সমবেত উদ্‌যাপন, ছুটির দিন যাপন, জাতীয় প্রতীকগুলোর প্রতি সমবেত মর্যাদা প্রদর্শন ইত্যাদি সকলকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। কিন্তু মাঝে মাঝে এগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লালিত কিছু নীতি আদর্শের প্রতি হুমকি হিসাবেও প্রতীয়মান হয়।

এর পেছনে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, পৃথিবীর সকল প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলো অভ্যন্তরীণভাবে বৈচিত্রময়। নিজস্ব সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ পরিচর্যা ও বিতর্কের মাধ্যমে এসকল ধর্মগুলো বিকশিত হয়েছে এবং এখনো বেঁচে আছে। যার ফলে প্রত্যেক ধর্মেই অনেকগুলো গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, যারা ধর্মশাস্ত্র ও রীতিনীতির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একে অপর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে। আমরা যদি এ মতপার্থক্যগুলোকে অস্বীকার করে সাধারণ ধর্মীয় আচরণের উপর ভিত্তি করে সমষ্টিগত বলপূর্বক পরিচিতি লাভ করার চেষ্টা করি তাহলে এর অর্থ হবে আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং স্বৈরতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছি।

দ্বিতীয়ত, বেশিরভাগ সমাজ সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্রময়। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের লোকেরা একসাথে এখই ভূখণ্ডে বসবাস করে। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম কিংবা ভাষাগত রীতিনীতি অন্য কোনো সংস্কৃতিতে বিশ্বাসীদের উপর অহেতুক চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ হল ওই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এরূপ চাপিয়ে দেওয়ার নীতি ঐ সম্প্রদায়গুলোর ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। অথবা যারা প্রাধান্য বিস্তারকারী জাতীয় ভাষায় কথা বলে না তারা সুবিধা বঞ্চিত হয়ে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমমর্যাদা, সকলের জন্য স্বাধীনতা ইত্যাদির মতো জনপ্রিয় আদর্শগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লিখিত দুটি কারণেই আমাদের এমন একটি জাতির পরিকল্পনা করা উচিত যা সাংস্কৃতিক না হয়ে রাজনৈতিক হবে। তার অর্থ হল কোনো ধর্ম, জাতি কিংবা ভাষার প্রতি বিশেষ আনুগত্য প্রকাশ না করে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দেশের সকল ঐতিহ্যকেই প্রাধান্যতা এবং সমমর্যাদা দেবে, যেগুলো সেদেশের সংবিধানের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকবে।

আমরা এখানে এমন কতগুলো উপায়ের কথা উল্লেখ করেছি যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার সমষ্টিগত পরিচয় প্রকাশ করে। আমরা এটাও দেখেছি যে কীভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সম অংশীদারিত্বমূলক আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের আলাদা পরিচিতি নির্মাণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন এখনো রয়ে গেছে। যেমন — কেন মানুষ নিজেদেরকে একটি জাতি হিসাবে কল্পনা করে? বিভিন্ন জাতির মৌলিক আকাঙ্ক্ষাগুলো কী কী? পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদে আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

৭.৩ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ (National Self-Determination)

অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠী ব্যতিরেকে জাতিসমূহও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দাবি করে এবং নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চেষ্টা করে। অন্য কথায়, তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করে। এই দাবির স্বপক্ষে তারা নিজেদের মর্যাদা এবং রাষ্ট্রের বিশেষ রাজনৈতিক পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি ও সমর্থন কামনা করতেন। এই ধরনের বেশিরভাগ দাবিসমূহ ওই সকল জনগণ থেকে আসত যারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে এবং একটি সমষ্টিগত পরিচয় অর্জন করছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের এই দাবিগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছার সাথে যুক্ত থাকে। যেখানে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সুরক্ষিত থাকে।

উনিশ শতকের ইউরোপে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের দাবি সমূহ বার বার উঠে আসে। এসময়ে 'এক সংস্কৃতি- এক রাষ্ট্র' ধারণাটি সমর্থন পেতে শুরু করে। পরবর্তীতে বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা পুণর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'এক সংস্কৃতি - এক রাষ্ট্র' ধারণাটি গ্রহণ করা হয়। ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ছোটো ছোটো অনেকগুলো নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সকল দাবিগুলো পূরণ করা সম্ভবপর হয়নি। অন্যদিকে 'এক সংস্কৃতি- এক রাষ্ট্র' দাবি পূরণের জন্য রাষ্ট্র সীমানা পুণর্নির্ধারনের প্রক্রিয়াটি এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে গণহারে স্থানান্তরের উৎসাহ যোগায়। যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় এবং স্বদেশভূমি থেকে বিতাড়িত হয়, যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছিল। অনেকে আবার ভয়ানক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের শিকার হয়।

সাংস্কৃতিকভাবে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়গুলো নিজেদের জন্য পৃথক জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সমূহের সীমানা পুণর্নির্ধারণের যে প্রক্রিয়া শুরু করে তার জন্য মানবতাকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। তাছাড়া এধরনের প্রচেষ্টায় এটাও সম্ভব ছিল না যে, নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলোতে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরই সদস্যতা থাকবে।

প্রকৃত পক্ষে অনেক রাষ্ট্রেই একাধিক জাতি এবং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মানুষরা একসাথে

জাতীয়তাবাদ

বেস্কুতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি (Demand for National Self-Determination in Basque)

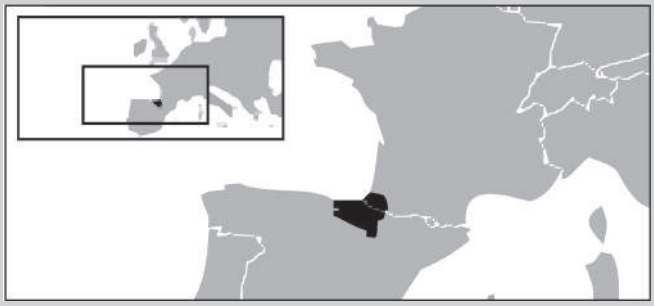

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিটি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উত্থাপিত হয়। চলো এরকম একটি ঘটনার দিকে লক্ষ করি।

বেস্কু হল স্পেনের একটি উন্নত এবং পাহাড়ি এলাকা। নিজের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে স্পেন সরকার এটিকে একটি 'স্বশাসিত' এলাকা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বেস্কুর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা শুধুমাত্র স্বশাসনের অধিকারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা এই এলাকাটিকে একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে মনে করতেন। এ আন্দোলনের সমর্থকরা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যেই দাবি আদায়ের চেষ্টা করতেন সম্প্রতি সেখানে পৃথক রাষ্ট্রের দাবিটি সহিংসতার রূপ ধারণ করে।

বেস্কু জাতীয়তাবাদীদের মতে, তাদের সংস্কৃতি স্পেনীয় সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে যার সাথে স্পেনীয় ভাষার কোনো মিল নেই। বেস্কুর এক তৃতীয়াংশ লোকই কেবলমাত্র স্পেনীয় ভাষা বুঝতে পারে। বেস্কুর পাহাড়ি ভূখণ্ড ভৌগোলিকভাবে স্পেনের বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রোমান সময় থেকেই বেস্কু কখনো স্পেনীয় শাসকদের কাছে নিজেদের স্বশাসনের অধিকারকে সমর্পণ করেনি। তাদের ন্যায় ব্যবস্থা, শাসন প্রক্রিয়া এবং অর্থনীতি সর্বদাই নিজস্ব ধারায় নিয়ন্ত্রিত হত।

উনিশ শতকের প্রায় শেষের দিকে যখন স্পেনের শাসকেরা বেস্কুর বিশেষ রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে তখনই সেখানে নতুন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্পেনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসক ফ্রাঙ্কো বেস্কুর স্বশাসনের ক্ষমতাকে আবারও খর্ব করে। এমনকি সে জনসমক্ষে এবং বাড়ি ঘরে বেস্কুর স্থানীয় ভাষার ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করে। যদিও এধরনের নিপীড়নমূলক নীতি বর্তমানে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে বেস্কুর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা স্পেন সরকারের অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হতে পারেনি এবং এখনো তারা নিজেদের এলাকায় 'বহিরাগতদের' প্রবেশ নিয়ে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। এই আন্দোলনের বিরোধীরা মনে করেন, বর্তমানে পীড়নমূলক নীতিগুলো প্রত্যাহার করার পরেও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করছে। তুমি কি বেস্কু জাতীয়তাবাদীদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবিকে বৈধ মনে কর? বেস্কু কি একটি জাতি? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে তুমি আরও কী জানতে চাও? তুমি কি মনে কর পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও এধরনের জটিলতা আছে? তুমি কি মনে কর আমাদের দেশেও কিছু অঞ্চল বা দলের পক্ষ থেকে এধরনের দাবি করা হয়েছে?

উৎস (Source) - www.wikipedia.org

বসবাস করে আসছে। এদের মধ্যে যারা সংখ্যায় কম তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। যার ফলে, সংখ্যালঘুদের সম মর্যাদাবান নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সমস্যাটি থেকে যায়। নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি ভালো দিক হল এই যে, যারা নিজেদের পৃথক জাতিসত্তা হিসাবে মনে করে, নিজেদের শাসন করার অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করে এবং তারা তাদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে তখন তাদেরকে অন্তত রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামগুলোতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটি প্রবলভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো এটা অনুধাবন করতে পেরেছিল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরাধীন মানুষগুলোকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেবে এবং মানুষের সমষ্টিগত স্বার্থ সুরক্ষায় সচেষ্ট হবে। বেশিরভাগ মুক্তি সংগ্রাম যে সমস্ত লক্ষ্য ও আদর্শের দ্বারা উজ্জীবিত হয় সেগুলো হল ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতির সামগ্রিক সমৃদ্ধি। তবে এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীই কিংবা তাদের মধ্যে যারা জাতিগোষ্ঠী হিসাবে স্বাতন্ত্র, তারা সকলে সহজে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা পৃথক রাষ্ট্র অর্জন করতে পারে না। যার ফলে গণহারে স্থানান্তর, সীমান্ত যুদ্ধ এবং সহিংসতা বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। তাই আমরা এমন এক স্ব-বিরোধী অবস্থা লক্ষ করছি যেখানে অনেক জাতি রাষ্ট্র ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, কিন্তু নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই বসবাসকারী সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে যারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি নিয়ে সোচ্চার হচ্ছে।

কার্যত পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই কীভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আন্দোলন সমূহকে মোকাবেলা করবে তা নিয়ে উভয় সংকটে আছে এবং এতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কেও নতুন প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। বেশিরভাগ মানুষই অনুধাবন করতে শুরু করেছে যে নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। বরং বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলো আরও বেশি গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আদর্শের দিকে অগ্রসর হলে এর সমাধান আরও সহজ হবে। তার অর্থ হল ভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা একসাথে সম অংশীদারিত্ব ও মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে বসবাস করবে, এ বিষয়টি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিশ্চিত করা। শুধুমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার জনিত সমস্যার সমাধানের জন্য নয়, বরং একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। সর্বোপরি একটি জাতি রাষ্ট্র যতক্ষণ না পর্যন্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেসকল জনগোষ্ঠী থেকে আনুগত্য অর্জনও কষ্টসাধ্য হবে।

জাতীয়তাবাদ

৭.৪ জাতীয়তাবাদ এবং বহুত্ববাদ (Nationalism and Pluralism)

যদি আমরা এক সংস্কৃতি-রাষ্ট্র ধারণাটি প্রত্যাখান করি তাহলে এর জন্য এমন বিকল্প বিবেচনা করা উচিত, যার মাধ্যমে একটি দেশে বসবাসকারী সকল সংস্কৃতি ও সম্প্রদায় একসাথে বেঁচে থাকতে এবং বিকশিত হতে পারে। এই লক্ষ্যটিকে সামনে রেখে বর্তমানে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সমাজ নানা উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের ভূখণ্ডে বসবাসকারী সংস্কৃতিগতভাবে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা দিচ্ছে। ভারতের সংবিধানে ধর্মীয়, ভাষা ও সংস্কৃতিগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে একগুচ্ছ ধারা ও উপধারার ব্যবস্থা রয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল সম্প্রদায়ের অধিকারগুলোকে সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে সেগুলো হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও তার সদস্যদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের অধিকার। কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়কে দেশের আইনসভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এসকল অধিকারের বৈধতার মূল ভিত্তি হল যে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আইনের চোখে সমমর্যাদা ও সুরক্ষা দেয়, পাশাপাশি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সত্তাও রক্ষা করে। জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হল, যে বৃহত্তর জাতিসত্তা এমন একটি সমষ্টিগত পরিচয় সৃষ্টি করবে যার মধ্যে রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা ও তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

চলো চর্চা করি

ভারতের এবং বহির্ভারতের নানাবিধ জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের অংশগুলো সংগ্রহ করো। নীচের দেওয়া প্রশ্নগুলো সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করো :

- দাবিগুলোর সপক্ষে কী কী যুক্তি আছে?
- এরজন্য তারা কী কী কৌশল অবলম্বন করেছে?
- তাদের দাবিগুলো কি বৈধ?
- তোমার মতে এ সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে?

যদিও এটা আশা করা হয় যে, এধরনের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা অনেক জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খাকে সন্তুষ্টি প্রদান করবে। তার পরেও কিছু জনগোষ্ঠী পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করতে থাকে। ব্যাপারটি স্ববিরোধী মনে হয় যখন পৃথিবীতে একদিকে বিশ্বায়নের ধারণা বিস্তৃত হচ্ছে, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনাও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করছে।

এধরনের দাবিগুলোকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাধানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহকে যথেষ্ট পরিমাণ উদারতা ও দক্ষতা দেখাতে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি বলতে সাধারণত বিভিন্ন জাতি সত্তার জন্য পৃথক এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিকে বোঝানো হয়। সকল জনগোষ্ঠীর জন্যই পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন যে শুধু অসম্ভব তাই নয়, এটা অনাকাঙ্ক্ষিতও বটে। এধরনের ভাবনা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারে যা কখনোই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে

জাতীয়তাবাদের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

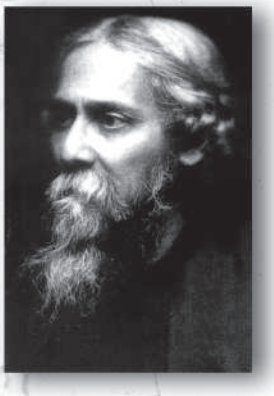

"দেশাত্মবোধ আমাদের সর্বশেষ আধ্যাত্মিক আশ্রয় হতে পারে না : বিশ্ব মানবতাই আমার আশ্রয় স্থল। হিরার মূল্য দিয়ে আমি কাচ ক্রয় করব না এবং যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন দেশাত্মবোধকে মানবতার উপর বিজয়ী হতে দেব না।"

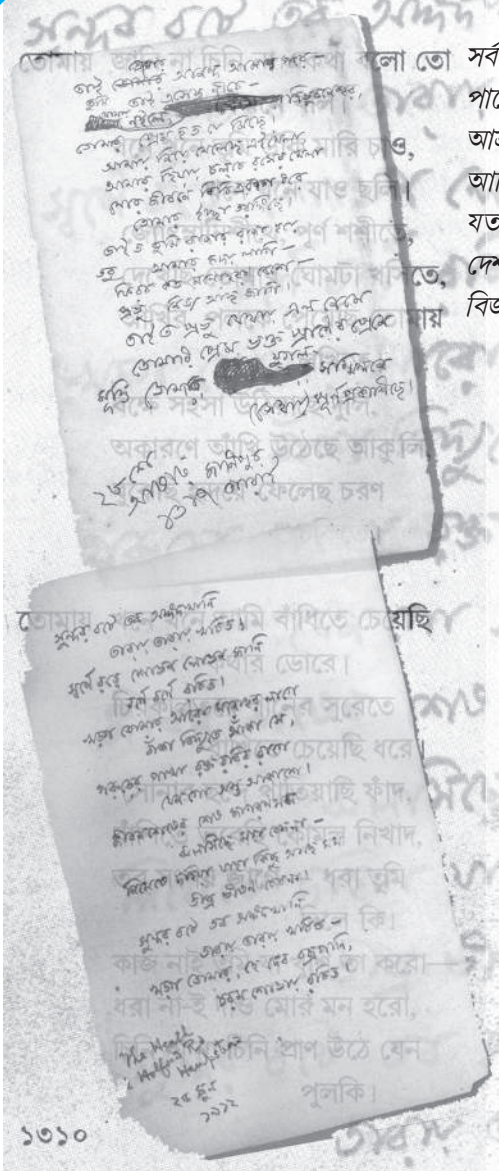

উল্লিখিত বক্তব্যটি হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি ঔপনিবেশবাদী শাসন ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার অধিকারের সপক্ষে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বৃহত্তর মানবীয় সম্পর্কের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। যদিও ব্রিটিশদের নিজস্ব সভ্যতায় এ ধারণাটিকে সম্মান দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পশ্চিমা সভ্যতার বিরোধিতা এবং পশ্চিমা সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান এই দুটি বিষয়কে আলাদাভাবে দেখতেন। যদিও ভারতীয়রা নিজেদেরকে সংস্কৃতি এবং পরম্পরার সূত্রে পরস্পরকে আবদ্ধ করে রাখবে, তবে কখনো মুক্ত এবং লাভজনক বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বর্জন করা তাদের জন্য সমীচীন হবে না।

দেশাত্মবোধের উপর এধরনের সমালোচনা তিনি তার লেখনিতে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন। আসলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে উঠে আসা দেশাত্মবোধের সংকীর্ণ ভাবনাকে তিনি ঘৃণা করতেন, বিশেষ করে ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষার নামে পশ্চিমি সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বর্জনের নীতির প্রতি তিনি এজন্য আশঙ্কা ব্যক্ত করতেন যে, এরূপ ধারণা দেশাত্মবোধের ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং আমাদের দেশে অবস্থানকারী খ্রিস্টান, ইহুদি, জোরাস্ট্রিয়ান ও ইসলামি সভ্যতার প্রতিও শত্রু ভাবাপন্ন করে তুলবে।

জাতীয়তাবাদ

স্থিতিশীল হবে না এবং এই ব্যবস্থা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। বর্তমানে এ ধরনের দাবিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যার অর্থ একটি রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিশেষ কোনো জাতি সত্তাকে কিছু প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করা।

বর্তমানে আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বসবাস করি যা বিভিন্ন জাতিগত সত্তার প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। গোষ্ঠীগত পরিচয় অর্জনের জন্য বিভিন্ন সংগ্রাম বর্তমানে আমরা লক্ষ করছি। এরমধ্যে অনেকেই ভাষাকে জাতীয়তাবাদের অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করছে। যখন পরিচয় অর্জনের দাবিসমূহকে আমরা সমর্থন করি তখন এটাও লক্ষ রাখতে হবে যে এই দাবিগুলো যাতে সমাজকে বিভাজন এবং সংঘর্ষের পথে পরিচালিত না করে। আমাদের মনে রাখতে হবে একজন ব্যক্তির অনেক পরিচয় থাকতে পারে। যেমন— লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ অথবা এলাকা ইত্যাদির প্রত্যেকটি একজন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের ভিত্তি হতে পারে এবং এরকম সবগুলো পরিচয় নিয়ে সে গর্ববোধ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ এটা অনুভব করে যে বিভিন্ন মাত্রায় সে তার ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা দাবি করা ঠিক হবে না যে রাষ্ট্র তার যে-কোন পরিচয়ের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের প্রতি রাজনৈতিক স্বীকৃতিতে তাদের সকল পরিচয় সত্তাকেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যদি অসহিষ্ণু এবং একই ধরনের পরিচয় সত্তা ও জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রভাব বিস্তার করে তবে সেটা হবে সেদেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

জাতীয়তাবাদ

অনুশীলনী

১) একটি জাতি কীভাবে অন্যান্য সমন্বিত জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা?

২) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে তুমি কী বোঝ? এই অধিকার কীভাবে একটি জাতি রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে সহায়ক এবং এর প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?

৩) "আমরা লক্ষ করেছি যে জাতীয়তাবাদ একদিকে যেমন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, তেমনি বিচ্ছিন্নও করে, মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে যেমন সহায়ক তেমনি তাদের মধ্যে তিক্ততা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।" উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

৪) সমগ্র বিশ্বের ক্ষেত্রেই ধর্ম, বংশ, ভাষা বা জাতি কোনো দেশের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সাধারণ কারণ হিসাবে দাবি করা হয় না। এই প্রসঙ্গে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৫) জাতীয়তাবাদী ভাবনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেসকল উপাদানগুলো বিশেষভাবে কাজ করে— উদাহরণসহ সেগুলো ব্যাখ্যা করো।

৬) সংঘর্ষপূর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবনাগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের চেয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কীভাবে অধিক ভূমিকা পালন করে, তা ব্যাখ্যা করো।

৭) তোমার মতে জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?

অনুশীলনী

অষ্টম অধ্যায়

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)

যখন বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সম্প্রদায় একই সমাজে পাশাপাশি বসবাস করে, তখন কীভাবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাদের প্রত্যেকের জন্য সমতা সুনিশ্চিত করবে? এই প্রশ্নটিই পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা এটা দেখার চেষ্টা করব যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারণা কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারণাটি এখনো কার্যত জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। যদিও ধর্ম নিরপেক্ষতার মতো বিষয়টি ভারতবর্ষে একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। একদিকে ভারতের সমস্ত রাজনীতিবিদ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সংরক্ষণ করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে যে তারা ধর্মনিরপেক্ষ। অন্যদিকে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের দুর্ভাবনা, আশঙ্কা এবং সন্দেহের ঘেরাটোপে ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ অবরুদ্ধ থাকে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ শুধুমাত্র যাজক সম্প্রদায় ও ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারাই আক্রান্ত হয়নি, বরং কিছু রাজনীতিবিদ, সমাজ কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরাও এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন।

এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সাহায্যে ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত বিতর্কের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

- ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝায়?
- ধর্মনিরপেক্ষতা কি ভারতের মাটিতে রোপণ করা?
- এটা কি ওই সকল সমাজের জন্য উপযুক্ত যেখানে ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে চলে?
- ধর্ম নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে কি কোনো পক্ষপাতিত্বের স্থান আছে? এটা কি কোনোভাবে সংখ্যালঘুদের প্রশ্রয় দেয়?
- ধর্মনিরপেক্ষতা কি ধর্মবিরোধী?

এই অধ্যায়ের শেষে তোমরা ভারতের মতো গণতান্ত্রিক সমাজে ধর্ম নিরপেক্ষতার গুরুত্ব এবং বিশেষত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা

৮.১ ধর্ম নিরপেক্ষতা কী ? (What is Secularism)

যদিও বহু শতাব্দী ধরে সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী ইহুদিরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার কিন্তু বর্তমানে ইস্রাইলে আরব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন খ্রিস্টান এবং মুসলিমরা ওই সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত যা ইহুদিদের জন্য সহজভাবে উপলব্ধ। সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অ-খ্রিস্টান মানুষরা বিভিন্ন ধরনের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা ভীষণ উদ্বেগজনক। সুতরাং উপরোক্ত উদাহরণগুলো থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান পৃথিবীতে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম।

অন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্ব (Inter religious Domination)

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে, দেশের নাগরিকের এই অধিকার রয়েছে যে, ভারতের যে কোনো প্রান্তে স্বাধীনভাবে ও মর্যাদাপূর্ণভাবে বসবাস করতে পাবে। কিন্তু বাস্তবে ভারতে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও বঞ্চনা বিদ্যমান। নিম্নে উল্লিখিত এরূপ তিনটি উদাহরণ লক্ষ করো।

- ১৯৮৪ সালে দিল্লিতে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কমপক্ষে ২৭০০ জন শিখকে হত্যা করা হয়েছিল। এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকেরা মনে করেন যে যারা এই ঘটনার প্রকৃত অপরাধী তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি।
- ভারতের কাশ্মীর উপত্যকায় কয়েক হাজার হিন্দু পণ্ডিতকে জোরপূর্বক তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। বিগত দুই শতাব্দী ধরে এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো তাদের নিজ ভূমিতে ফিরে আসতে পারেননি।
- ২০০২ সালে গুজরাটে গোধরা কাণ্ডের পরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে কম করেও ১০০০ নাগরিককে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল যাদের মধ্যে বেশির ভাগ মুসলমান। এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জীবিত সদস্যরা পরবর্তী সময়ে আর নিজেদের গ্রামে ফিরে যেতে পারেনি।

উপরোক্ত তিনটি ঘটনাবলির ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়ে মিল রয়েছে? এই সমস্ত ঘটনাবলি কোন না কোনোভাবে চরম বৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে আক্রমণ করা হয়েছে, তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় পরিচিতির কারণে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, মানুষের জন্য ন্যূনতম স্বাধীনতার অধিকার থেকে এ সকল মানুষদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে আন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রতিফলন এবং এক সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়ের উপর উৎপীড়ন।

ধর্মনিরপেক্ষতার আর্দশের সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল এই সমস্ত আন্ত-ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরোধিতা করা। বস্তুতপক্ষে এটি হল ধর্মনিরপেক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল দিক। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল আন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরোধিতা করা। এই দিকটির আরও গভীরে প্রবেশ করা যাক।

অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় কর্তৃত্ব (Intra religion Domination)

কেউ কেউ এটা বিশ্বাস করেন যে ধর্ম হল সাধারণ মানুষের কাছে 'আফিমের নেশার মতো'। ক্রমান্বয়ে একদিন যখন মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং মানুষ সুখী ও সহজ সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে শুরু করবে, তখন ধীরে ধীরে ধর্মের নেশা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যদিও এই ধারণা যাবতীয় মানব শক্তির অতিরঞ্জিত ভাব থেকে গড়ে ওঠে। মানুষের পক্ষে এক জাগতিক বিশ্বের সবকিছু জানা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এর নিয়ন্ত্রণও অসম্ভব। মানুষ তার জীবনের সময়কালকে দীর্ঘায়িত করতে পারে কিন্তু অমর হতে পারে না। আমাদের জীবন থেকে আমরা কোনো দুর্ঘটনা, ভাগ্যের উপাদান কিংবা রোগ ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পেতে পারি না। বিচ্ছেদ এবং ক্ষতি দুটিই মানবীয় পরিস্থিতির অভিন্ন অঙ্গ। জীবনের বিভিন্ন দুর্দশার কারণ মানুষ নিজেই এবং ইচ্ছা করলে সে এটা এড়াতেও পারে। কিন্তু কিছু দুঃখ বা দুর্দশা মানুষের নিজের সৃষ্টি নয়। এই সমস্ত দুঃখ ও দুর্দশার নিরাময় হল ধর্ম, কলা ও দর্শন। ধর্মনিরপেক্ষতা এই বিষয়টি স্বীকার করে, তাই ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্ম বিরোধি বলা যায় না।

তবে যে সমস্যাগুলো আমাদের জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত তাতে ধর্মেরও বেশ প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মানুষ কখনো এমন একটি ধর্মের কল্পনা করতে পারে না, যেখানে নারী পুরুষের সমান অধিকারী সুপ্রতিষ্ঠিত। হিন্দু সমাজে কিছু শ্রেণি রয়েছে যারা সুদীর্ঘ কাল ধরে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। যেমন দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে হিন্দু মহিলাদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। যে ধর্ম যত বেশি সংগঠিত, সেখানে তত বেশি রক্ষণশীল চক্র সক্রিয়, যারা কোনো ধরনের প্রতিবাদ কিংবা বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় মৌলবাদ একটি বড়ো সমস্যা এবং তারা নিজের দেশের ভিতরে ও বাইরে শান্তি বিঘ্নিত করে চলেছে। অনেক ধর্ম বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রতিনিয়ত জাতিগত হিংসার সৃষ্টি করে এবং ভিন্নমত পোষণকারী সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন করে।

সুতরাং, ধর্মীয় কর্তৃত্বকে শুধুমাত্র আন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্বরূপে চিহ্নিত করা যায় না। এটি আরেকটি বিশেষ রূপ ধারণ করে, যার নাম অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় কর্তৃত্ব। ধর্মনিরপেক্ষতা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় কর্তৃত্বের সকল প্রকার রূপের তীব্র বিরোধিতা করে। তাই শুধুমাত্র আন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্ব নয়, এর সঙ্গে অন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্বেরও বিরোধিতা করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। ধর্মনিরপেক্ষতা হল একটি আদর্শগত ধারণা যা বাস্তবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ অর্থাৎ আন্তঃ ধর্মীয় অথবা অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় কর্তৃত্ববিহীন সমাজ প্রত্যাশা করে। নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে গেলে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের মধ্যেই স্বাধীনতার প্রচার করে। একই সাথে আন্তঃধর্মীয় ও অন্তঃধর্মীয় সাম্যকে প্রচার করে। এই রূপরেখায় একটি সংকীর্ণ অথচ স্পষ্ট প্রশ্ন উঠে আসে যে,

এই লক্ষ্যগুলো অর্জনে কী ধরনের রাষ্ট্র প্রয়োজন? অন্য ভাষায় বলতে গেলে কীভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি রাষ্ট্র নিজের সাথে ধর্ম এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংযোগ ঘটায়।

৮.২ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State)

সম্ভবত ধর্মীয় বৈষম্য প্রতিরোধ করার একটি উপায় হল পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করা। শিক্ষা হল নাগরিকের মানসিকতা পরিবর্তন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান পারস্পরিক বিদ্বেষ, সন্দেহ ও কুসংস্কার রয়েছে যেগুলো দূর করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও ব্যক্তিগত ভাববিনিময় অনেক অবদান রাখতে পারে। প্রাণঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কীভাবে একজন মুসলমান একজন হিন্দুকে রক্ষা করেছিল বা কীভাবে একজন হিন্দু একজন মুসলমানকে রক্ষা করেছিল, এই ধরনের গল্পগুলো পড়া খুবই প্রেরণাদায়ক। কিন্তু এটা নিতান্তই অলীক কল্পনা যে, শুধুমাত্র শিক্ষা বা সততা সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করতে পারে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ব্যাপক ও সর্বজনীন ক্ষমতা রয়েছে। রাষ্ট্র কীভাবে তার শক্তি প্রয়োগ কিংবা কার্যকলাপ পরিচালিত করছে তার উপর নির্ভর করে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য এবং আন্তঃধর্মীয় বিবাদ কীভাবে নিরসন হবে। সেজন্য আমাদের এটা দেখা প্রয়োজন কোন্ ধরনের রাষ্ট্র ধর্মীয় সংঘাত প্রতিরোধ এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রচার করতে পারে।

চলো চর্চা করি

এরকম কিছু উপায় নির্দেশ করো যার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমুন্নত রাখা যায়।

কীভাবে একটি রাষ্ট্র কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের একচেটিয়া কর্তৃত্ব নিরসন করতে পারে? প্রথমত, একটি রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মীয় নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হবে না। একটি রাষ্ট্র যদি সম্পূর্ণভাবে কোনো যাজক বা ধর্মনেতার দ্বারা চালিত হয় তবে সেই রাষ্ট্রকে একটি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়। ইউরোপের পোপ শাসিত রাষ্ট্র বা বর্তমান সময়ের তালিবান শাসিত রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র কখনোই অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকদের সহ্য করতে পারে না, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নমূলক আচরণ করা হয় এবং সমাজের সর্বত্র এক ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যস্ত শাসন কায়েম করা হয়। যদি আমরা সাম্য, স্বাধীনতা ও শান্তির আদর্শকে তুলে ধরতে চাই তাহলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র করা প্রয়োজন।

কেউ কেউ এটা বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্র এবং ধর্মের মধ্যে বিভাজন থাকাই একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এ ধরনের অবস্থা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় না, কারণ এরূপ বহু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র রয়েছে যেখানে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে যাজকীয় রাষ্ট্র না হওয়া সত্ত্বেও অ্যাংলিকান চার্চ এবং তার সদস্যদের বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হত। ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত এংলিকান ধর্মই ছিলা

রাষ্ট্রীয় ধর্ম। বর্তমানে পাকিস্তানে সুন্নি ইসলাম নামে একটি রাষ্ট্র ধর্ম রয়েছে। এই ধরনের শাসনতন্ত্রে অভ্যন্তরীণ প্রতিবাদ কিংবা ধর্মীয় সমতার সুযোগ খুবই নগণ্য।

সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে গেলে শুধুমাত্র যাজকীয় রাষ্ট্র না হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তার সঙ্গে ধর্মের আনুষ্ঠানিক বা আইনগত সম্পর্ক রাখাও চলবে না। রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ ধর্মনিরপেক্ষকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হলেও যথেষ্ট নয়। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে অবশ্যই কতগুলো নির্দিষ্ট নীতি ও সমতার আদর্শ থাকা প্রয়োজন, যা আংশিকভাবে ধর্মহীন উৎসগুলো থেকে পাওয়া যায়। এই সমস্ত নীতি ও আদর্শগুলির মধ্যে বৈষম্যের অবসান, শান্তি, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় শোষণের হাত থেকে নিবৃত্তি, আন্তঃধর্মীয় ও অন্তঃধর্মীয় সাম্য ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত হওয়া উচিত।

এই নীতি ও লক্ষ্যগুলোকে সমুন্নত করার জন্য রাষ্ট্রকে সংগঠিত ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অবশ্যই পৃথক করা প্রয়োজন। এই পৃথকীকরণের কোনো নির্দিষ্ট ধরন থাকতে হবে তার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। বস্তুত পৃথকীকরণের প্রকৃতি এবং ধরন বিভিন্ন রকম হতে পারে। এটি নির্ভর করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও মূল্যবোধ কীভাবে সমাজে বিকশিত হয় তার উপর আমরা এখানে দুটি ধারণাকে বিবেচনা করব। প্রথমটি হল ধর্মনিরপেক্ষতার পাশ্চাত্য ধারণা যার প্রতিনিধিত্ব করে আমেরিকা এবং দ্বিতীয়টি হল এমন এক বিকল্প ধারণা যার সর্বোত্তম উদাহরণ হল ভারতবর্ষ।

> **চলো বিতর্ক করি**
>
> অন্য ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসীদের প্রতি গ্রহণশীল এবং সহনশীল হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হল তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করা।
>
> কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা ওই সকল আদর্শের স্বপক্ষে উঠে দাঁড়াব না যেগুলোকে মৌলিক মানবীয় আদর্শ বলে মনে করা হয়।

৮.৩ ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত পাশ্চাত্য ধারণা
(The Western Model of Secularism)

সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সাধারণ সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। তারা কখনোই ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয় বা সমাজে নিজ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতেও চায় না। তবে এ ব্যাপারে একটি স্বাভাবিক ধারণা আছে যা আমেরিকার রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা উৎসাহিত, যেখানে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পৃথকীকরণকে পারস্পরিক বর্জনের ভিত্তিতে দেখা হয়। যেমন রাষ্ট্র ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং ঠিক তেমনি ধর্মীয় সংগঠনও রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কার্যকলাপের স্বাধীন ক্ষেত্র রয়েছে। রাষ্ট্রীয় নীতি কখনোই ধর্মীয় নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না। কোনো ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাস কখনোই রাষ্ট্রের সর্বজনীন নীতি হতে পারে না। তবে যদি এরকম ঘটে থাকে তাহলে মনে করতে হবে যে এটা রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মের অবৈধ অনুপ্রবেশ।

ঠিক একইভাবে রাষ্ট্র কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে পারে না। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্র কোন ধরনের আর্থিক সহায়তা দিতে পারে না।

কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তুর্কিতে প্রচলিত একটি ভিন্ন ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের দিকে লক্ষ করা যাক। এই ধরনের ধর্ম নিরপেক্ষতা কোনো একটি সংগঠিত ধর্মের সাথে দূরত্ব বজায় রাখার পরিবর্তে ধর্মের উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এবং ধর্মকে দাবিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের স্রষ্টা এবং বাস্তবে বলবৎ করেছিলেন মুস্তাফা কামাল আতার্তুক।

তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কির ক্ষমতায় এসেছিলেন। তাঁর একটি স্থির ও নিশ্চিত লক্ষ্য ছিল তুর্কির সামাজিক জীবনে খলিফার যে প্রভুত্ব ছিল তার অবসান করা। আতার্তুক মনে করতেন যে গতানুগতিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া তুর্কি তার দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে কখনোই বেরিয়ে আসতে পারবে না। তিনি তুর্কিকে ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক করার জন্য কিছু কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি নিজের পুরোনো নাম পরিবর্তন করে মুস্তাফা কামাল পাশা থেকে কামাল আতার্তুক নাম গ্রহণ করেন। আতার্তুক শব্দের অর্থ হল তুর্কির পিতা। টুপি (হ্যাট) আইন অনুসারে ফেজ নামের এক ঐতিহ্যগত টুপি যা মুসলমানরা পরিধান করত তা তিনি নিষিদ্ধ করেন এবং পুরুষ ও মহিলাদের পাশ্চাত্য ধরনের পোশাক পরার জন্য উৎসাহিত করেন। তুর্কির প্রথাগত ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে তিনি পাশ্চাত্য (জর্জিয়ান) ক্যালেন্ডারের প্রচলন শুরু করেন। ১৯২৮ সালে তিনি তুর্কির প্রথাগত বর্ণমালার পরিবর্তে সংশোধিত রোমান হরফের তুর্কি বর্ণমালার প্রচলন করেন।

তুমি কি এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা কল্পনা করতে পারো যা তোমার ব্যক্তিগত পরিচয় বহনকারী নাম রাখার ও তোমার পছন্দমতো পোশাক পরিধানের স্বাধীনতা প্রদান করেনা? তাছাড়া তুমি যে ভাষায় কথা বল তাও পরিবর্তন করে দেবে? কীভাবে বিশ্লেষণ করবে যে, কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে ভিন্ন?

যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র তাদের কার্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় কোনো মহিলাকে মন্দিরের পুরোহিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয় তবে রাষ্ট্রের কিছুই করার থাকে না। যদি কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় তার অনুগামীদের ওই ধর্মসম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করে তাহলে রাষ্ট্র কেবলমাত্র নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করতে পারে। যদি কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় তার সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু লোককে মন্দিরের পবিত্র অংশে প্রবেশ করতে না দেয়, তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষে সেখানে কিছুই করার থাকে না। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিষয়, এটা রাষ্ট্রের কোনো আইন বা নীতির বিষয় নয়।

এই সাধারণ ধারণাটি স্বাধীনতা এবং সাম্যকে ব্যক্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে। স্বাধীনতা বলতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বোঝায়। সাম্য বলতে মানুষের মধ্যে যে সমতা রয়েছে তা বোঝায়। এখানে এরকম কোনো ধারণার সুযোগ নেই যেখানে কোনো সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে

তার নিজের পছন্দমতো প্রথা অনুসরণ করতে পারে। এখানে সম্প্রদায়ভিত্তিক অধিকার এবং সংখ্যালঘুদের জন্য অধিকারের খুবই সীমিত সম্ভাবনা রয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইহুদি সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া বেশিরভাগ পাশ্চাত্য সমাজ ধর্মের দিক থেকে প্রায় অভিন্ন। সেই কারণে, স্বাভাবিকভাবে তারা অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় কর্তৃত্বের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করত। যখন অনেক বিষয় বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য চার্চ থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করার উপর জোর দেওয়া হয় তখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আন্তঃধর্মীয় সমতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়।

সবশেষে বলা যায়, মূলধারার ধর্মনিরপেক্ষতার এই রূপটিতে রাষ্ট্র সমর্থিত ধর্মীয় সংস্কারমূলক ধারণার কোনো স্থান নেই। এই বৈশিষ্ট্যটি সরাসরি এমন বোঝাপড়া থেকে উৎপন্ন হয় যেখানে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণ হল পারস্পরিক বর্জনের প্রতিফলন।

৮.৪ ধর্মনিরপেক্ষতার ভারতীয় রূপ (The Indian Model of Secularism)

অনেক সময় এটা বলা হয়ে থাকে যে, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা হল পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার অনুকরণ। কিন্তু, ভারতীয় সংবিধানকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। মৌলিকতার দিক থেকে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা, পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে স্বতন্ত্র। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে পৃথকীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং আন্তঃধর্মীয় সমতার ধারণাটি

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে নেহেরু
Nehru on Secularism

'রাষ্ট্র কর্তৃক সকল ধর্মকে সমানভাবে সংরক্ষণ।' স্বাধীন ভারতবর্ষে একবার একজন ছাত্র জওহরলাল নেহেরুকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি এই উক্তিটি করেন। নেহেরু চেয়েছিলেন এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক যেখানে সকল ধর্ম সম্প্রদায়কে সমানভাবে সংরক্ষণ করা যাবে, কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষতাতিত্ব করা হবে না এবং রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেবে না। নেহেরু ছিলেন ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার দার্শনিক।

নেহেরু ব্যক্তিগতভাবে কোনো ধর্ম পালন করতেন না বা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তাঁর মতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কোন ধর্মের প্রতি শত্রুতা করা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি তুর্কির কামাল আতাতুর্ক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। একই সাথে নেহেরু রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সমস্ত ধরনের সম্পর্কহীনতার পক্ষে ছিলেন না। তাঁর মতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সমাজ সংস্কার করার জন্য ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। নেহেরু নিজে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যেমন পণপ্রথা নিবারণ, সতী প্রথার বিলোপ, জাতিভিত্তিক বৈষম্যের অবসান, মহিলাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সামাজিক স্বাধীনতা প্রদান করা ইত্যাদি।

যদিও নেহেরু বিভিন্ন ব্যাপারে অত্যন্ত নমনীয় মনোভাব পোষণ করতেন। তবু এই ধর্মনিরপেক্ষতার মত বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ও আপোষহীন ছিলেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বুঝতেন সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িকতাবাদের সমান বিরোধিতা করা। নেহেরু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতাবাদের কঠোর নিন্দা করতেন, কারণ তিনি মনে করতেন এটি দেশের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতি হুমকি স্বরূপ। তাঁর মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো আদর্শ বা নীতি নয়, এটি হল ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির একটি নিশ্চয়তার স্বরূপ।

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা যাক।

কী কী কারণে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা স্বতন্ত্র? প্রথমত এটি গভীর ধর্মীয় বৈচিত্র্যতার প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়েছিল যা পাশ্চাত্য আধুনিক ধারণা এবং জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের বহুকাল আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষে প্রথম থেকেই একটি আন্তঃধর্মীয় সহনশীলতার বাতাবরণ বর্তমান রয়েছে। বস্তুত আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে সহনশীলতা ধর্মীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সহনশীলতা প্রত্যেককেই কিছু ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করতে পারে কিন্তু এই অনুমতির স্বাধীনতা সাধারণত সীমিত। পাশাপাশি, সহনশীলতা আমাদেরকে অপছন্দনীয় লোকের সাথেই সহাবস্থান করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এটা সকলের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ যখন একটি দেশ গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, অথচ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ওই মানুষগুলো যখন নিজেদের মর্যাদা ও সম্মানের জন্য লড়াই করে, তখন তা ততটা সহায়ক হয়ে ওঠে না।

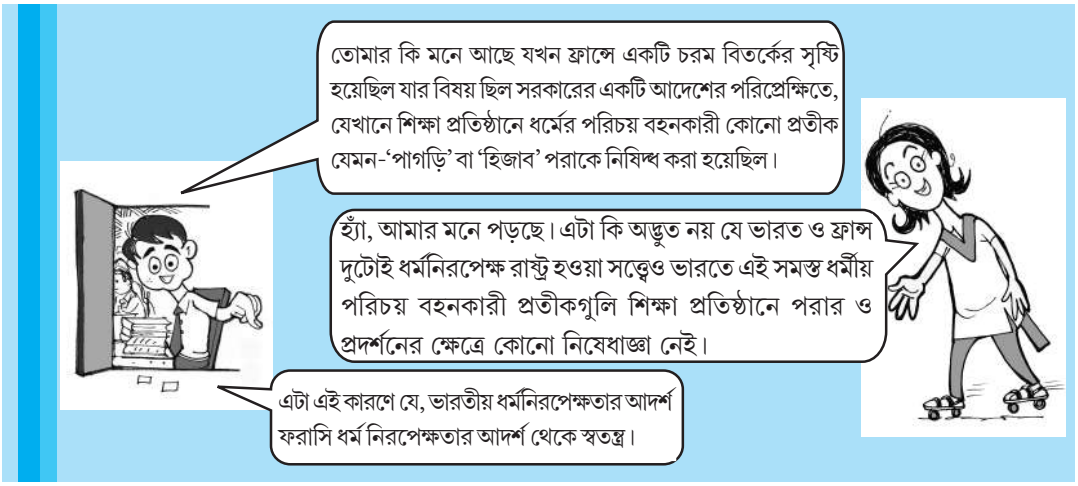

পাশ্চাত্য আধুনিকতার সংস্পর্শে আসার ফলে, সুদীর্ঘ কাল ধরে ভারতবর্ষে চলে আসা সাম্য সম্পর্কে প্রান্তিক এবং উপেক্ষিত ধারণা ক্রমশ উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। এই পাশ্চাত্য ধারণা ভারতীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সাম্যের ধারণা গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। এটা ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যস্ত সমাজ থেকে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সাম্যের ধারণার সূচনা করে। এভাবে ভারতীয় সমাজে আগে থেকেই বিদ্যমান ধর্মীয় বৈচিত্র্যের সাথে পাশ্চাত্যের ধারণার এক সংমিশ্রণ শুরু হয় যার ফলস্বরূপ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা একটি স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করে। যার ফলে ভারতে আন্তঃধর্মীয় ও অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় কর্তৃত্বের সমন্বয় দেখা যায়। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা হিন্দু ধর্মের মধ্যে দলিত ও নারীদের উপর নির্যাতন, মুসলমান বা খ্রিস্টানদের

মধ্যে নারীদের প্রতি বৈষম্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দ্বারা সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকারের প্রতি সম্ভাব্য হুমকিরও সমানভাবে বিরোধিতা করে। মূলধারার পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে এটিই হল তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বিতীয় পার্থক্য হল, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে না বরং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতাও স্বীকার করে। এখানে ব্যক্তি তার নিজের পছন্দ অনুসারে যেকোনো ধর্মপালন করার অধিকার ভোগ করে। একইভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকারের পাশাপাশি নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার রয়েছে।

চলো বিতর্ক করি

তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মীয় পরিচিতি এবং ভেদাভেদের কোন গুরুত্ব নেই।

তৃতীয় পার্থক্যটি হল, যেহেতু একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে আন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্বের উপর সমানভাবে চিন্তা করতে হয়, সেজন্য ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র সমর্থিত ধর্মীয় সংস্কারের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতীয় সংবিধান অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি ভারত সরকার বাল্য বিবাহ বিলোপ এবং আন্তঃজাতিগত বিবাহের উপর হিন্দু ধর্মের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধকে সমাপ্ত করার জন্য অনেক আইন প্রণয়ন করেছে।

স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্ন ওঠে তা হল একটি রাষ্ট্র কি ধর্ম সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ বা সমর্থন করেও ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে পারে? রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণ না করা সত্ত্বেও একটি রাষ্ট্র কি ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে? ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কারণ এটি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয় বা তার দ্বারা কোনো বিশেষ ধর্ম কিংবা ধর্মসমষ্টি সৃষ্টিও হয়নি। তদুপরি ধর্মীয় সমতা অর্জন করার জন্য ভারত একটি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতি অনুসারে আমেরিকার মতো ভারতবর্ষও ধর্ম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে, আবার প্রয়োজনে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কও স্থাপন করতে পারে।

ভারতবর্ষ ধর্মীয় অত্যাচারের অবসান করার জন্য প্রয়োজনে ধর্মের সঙ্গে নেতিবাচক সম্পর্কও স্থাপন করতে পারে। আবার প্রয়োজনে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক নীতিও গ্রহণ করতে পারে, অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্য ভারতীয় সংবিধান সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজেদের পছন্দ অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনেও অনুমতি দিয়ে থাকে এবং এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনে সহায়তাও প্রদান করে থাকে। শান্তি, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শগুলোকে বিকশিত করার জন্য এই সকল কৌশলগত নীতি রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত হতে পারে।

এটা পরিষ্কার যে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার জটিলতাকে 'সকল ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদা' এই বাক্যটির মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এই বাক্যটির অর্থ যদি সমস্ত প্রকার ধর্ম সম্প্রদায়ের

চলো চর্চা করি

ধর্মনিরপেক্ষতা কি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

- ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রীদের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা।
- সরকারি অফিসে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দেওয়া।

চলো চর্চা করি

- গরম হাওয়া এবং বোম্বে নামক ছায়াছবিগুলি কি দেখেছ? এই ছায়াছবিগুলোতে ধর্ম নিরপেক্ষতার কোন্ আদর্শগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে?
- কথা পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত আব্দুল গণি শেখের লেখা 'নেম' ইন ফরসেকিং প্যারাডাইস নামক বইটি পড়ো।

সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সহনশীলতা হয়, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হল। প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আরও অনেক বেশি ব্যাপক। যদি এই বাক্যটির অর্থ সকল প্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং তাদের রীতিনীতির প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন করাকে বোঝায় তাহলে এর মধ্যে কিছু অস্পষ্টতা থেকে যায়, যা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর হস্তক্ষেপ করার নীতিকেও সমর্থন করে। এই ধরনের হস্তক্ষেপ সকল ধর্মের কিছু বিশেষ আচরণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জাতপাত ভিত্তিক ভারতীয় সামাজিক বিন্যাসকে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুমোদন দেয় না। প্রত্যেক ধর্ম ও তার প্রতিটি বিষয়ে সমান সম্মান প্রদর্শন করতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাধ্য নয়। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সংগঠিত ধর্মের কিছু নিয়মের প্রতি একইভাবে প্রয়োজনে অমর্যাদাও প্রদর্শন করতে পারে।

৮.৫ ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার সমালোচনা
(Criticisms of Indian Secularism)

ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা বিভিন্ন দিক থেকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন। এই সমস্ত সমালোচনাগুলি কী কী? এই সমালোচনাগুলোকে কীভাবে প্রতিহত করা সম্ভব?

ধর্মবিরোধী (Anti religious)

প্রথমত এই যুক্তি প্রায়ই প্রদর্শন করা হয় যে ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্মবিরোধী। তবে এটা আশা করি আমরা দেখাতে পেরেছি যে, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা সংগঠিত ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরোধী। এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মবিরোধী বলে গণ্য করা যায় না।

অনুরূপভাবে অনেকে এটা মনে করেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় পরিস্থিতির প্রতি হুমকি স্বরূপ। বস্তুত এটা পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সাম্যকে সমুন্নত রাখে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় পরিচিতিকে বিনষ্ট করার পরিবর্তে তাকে রক্ষা করে। তবে অবশ্য এটা দেখা যায় যে, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা কিছু ধর্মীয় পরিচিতির

ভিত্তিকে দমন করার চেষ্টা করে, যেমন সে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায় অত্যন্ত গোঁড়া, হিংসাত্মক, ধর্মান্ধ, বিভেদপন্থী এবং যারা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। প্রকৃত প্রশ্ন এটা নয় যে কোন্ ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিকে দমন করা হবে, বাস্তব কথা হল, যে ভিত্তিগুলোকে দমন করা হবে সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা আছে না নেই।

পাশ্চাত্য আমদানি (Western Import)

দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করেন ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের সম্পর্ক রয়েছে এবং এটা একটা পাশ্চাত্য ধারণা যা ভারতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে বেমানান। যদিও এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ পাজামা পরিধান করা থেকে ইন্টারনেট এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মতো লক্ষ লক্ষ বিষয় ভারতে বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে যেগুলো পাশ্চাত্য থেকে উদ্ভব হয়েছে। এই কারণের একটি উত্তর হতে পারে, এটা হলে অসুবিধা কী? তুমি কি কোনো ইউরোপীয় ব্যক্তিকে অভিযোগ করতে শুনেছ যে শূন্যের আবিষ্কার ভারতে হয়েছে তাই তারা এটার ব্যবহার করবে না?

যাই হোক এটি একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া। একটি রাষ্ট্রের পক্ষে সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় হল এই রাষ্ট্রের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে কিনা। পাশ্চাত্য দেশগুলো তখনই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় যখন গুরুত্বের সাথে তারা সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনে সংগঠিত ধর্মীয় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত পাশ্চাত্য ধারণা খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে সৃষ্টি হয়নি। তাহলে এই ধারণাটি পাশ্চাত্যের এই দাবির অর্থ কী? ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার পারস্পরিক বর্জনকে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের বলে গণ্য করা হয় কিন্তু এটি সকল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। এই পৃথকীকরণের ধারণাটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন সমাজের দ্বারা ভিন্নভাবে করা হয়। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রয়োজনে নীতিগতভাবে সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে শান্তি বজায় রাখার নিমিত্তে ধর্ম থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পারে, আবার প্রয়োজনে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপও করতে পারে।

আর ঠিক এই ধরনের ধারণাই ভারতে সংগঠিত হয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতে এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষতার ভাব গড়ে উঠেছে যাকে কোনো অবস্থাতেই ভারতের মাটিতে পাশ্চাত্য ধর্ম নিরপেক্ষতার অনুকরণ বলা যাবে না। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই অবদান রয়েছে। পাশ্চাত্যদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ বোঝায়, অন্যদিকে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

সংখ্যালঘুবাদ (Minoritism)

তৃতীয়ত, অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সংখ্যালঘু তোষণের নীতি হিসেবে অভিযোগ করেন। এটা সত্য যে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারকে সংরক্ষণ

করে, তাহলে প্রশ্ন হল এটি কি ন্যায়সংগত? কল্পনা করো যে চারজন প্রাপ্ত বয়স্ক সব থেকে দ্রুত চলমান ট্রেনে ভ্রমণ করছে। মাঝপথে এই চারজনের মধ্যে একজন ধূমপান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তার প্রতিবাদ করলেন কারণ তিনি সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে পারেন না। বাকি দুজন যাত্রীও ধূমপায়ী, সেজন্য তারা কোনো কিছু বললেন না। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখানে দুইজন যাত্রীদের মধ্যে উক্ত বিষয়ে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। সুতরাং তারা একটা সিদ্ধান্ত করলেন যে ভোটাভোটির মধ্যে দিয়ে এর সমাধান করবেন। দুই হালকা ধূমপায়ী ব্যক্তি ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তির সাথে যোগ দেয়, তার ফলে ধূমপান না করা ব্যক্তি দুই ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়। যদিও এক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ব্যক্তি পরাজিত হয়েছে তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে, একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে।

এখন এই ঘটনাটাকে একটু পরিবর্তন করে চিন্তা করা যাক। ধরে নেওয়া যাক এখানে অধুমপায়ী ব্যক্তি শ্বাস কষ্টে ভুগছেন। ধূমপান তার পক্ষে জীবন বিপন্নকারী হতে পারে। সুতরাং ওই কামরাতে যে সহযাত্রীরা আছেন তাদের ধূমপান না করাটা প্রথম ব্যক্তির পক্ষে অপরিহার্য ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে পূর্বে ভোটাভোটির মাধ্যমে নেওয়া সিদ্ধান্তটি কি এই পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক ছিল? তোমার কি মনে হয় না যে আসক্ত ধূমপায়ীকে ততক্ষণ পর্যন্ত সিগারেট পান থেকে নিজেকে বিরত রাখা উচিত যতক্ষণ না পর্যন্ত ট্রেনটি তার গন্তব্যে পৌঁছায়? তুমি সহমত হবে যে, যেখানে মৌলিক স্বার্থের প্রশ্ন রয়েছে সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসাবে ভোটদান অনুচিত। স্বীয় স্বার্থের পরিতৃপ্তিকে কোনো ব্যক্তির প্রাথমিক অধিকার বলে গণ্য করা হয়। যা একজন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা একটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সংখ্যালঘুদের মৌলিক স্বার্থের ক্ষতি করা উচিত নয় সাংবিধানিক আইনের দ্বারা তাদের মৌলিক স্বার্থকে রক্ষা করা উচিত। ভারতীয় সংবিধান ঠিক এই কাজটিই করে চলেছে। সংখ্যালঘু অধিকার যুক্তিসঙ্গত যতক্ষণ পর্যন্ত এই অধিকারগুলো তাদের মৌলিক স্বার্থকে রক্ষা করে।

আমার মনে হয় সবসময় সকলের প্রতি একই ধরনের ব্যবহার করা উচিত নয়।

এই পর্যায়ে অনেকেই এটা বলতে পারেন যে, সংখ্যালঘুদের অধিকার হল কতগুলো বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা যা অন্যান্য মানুষের অধিকারের মূল্যের বিনিময়ে প্রদান করা হয়। তাহলে কেন এই ধরনের বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়? এই প্রশ্নের উত্তর আর একটি উদাহরণের সাহায্যে ভালভাবে দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, একটি প্রেক্ষাগৃহেব দো তলায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী চলছে। ওইখানে পৌঁছানোর একমাত্র মাধ্যম হল সিঁড়ি। প্রত্যেকেই টিকিট কেটে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে সেই চলচিত্র দেখার ক্ষেত্রে স্বাধীন । সত্যি কি তাই? সত্যিই কি প্রত্যেকে স্বাধীন? ধরা যাক এখানে দর্শকদের মধ্যে কিছু বৃদ্ধলোক, কেউ সম্প্রতি পা ভেঙেছে এবং কিছু লোক দিব্যাঙ্গজন। এদের মধ্যে কারো পক্ষেই সিঁড়ি চড়া সম্ভব নয়। তুমি কি মনে করো হুইল চেয়ারে বসা লোকেদের জন্য র‍্যাম্প অথবা লিফটের

ব্যবস্থা করা ভুল হবে? এই ব্যবস্থার ফলে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিরাও সেইসব কাজ করতে পারবে যা অন্য ব্যক্তিরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নিয়মিত করে থাকে। তাহলে বোঝা যায় যে এই স্বল্প সংখ্যক শ্রেণির জন্য দোতলায় উঠার ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যদি সকল স্থানগুলোকে এরকমভাবে নির্মাণ করা হয় যা শুধুমাত্র যুবক এবং সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত সেক্ষেত্রে বিশেষ অংশের ব্যক্তিদের জন্য সহজ কিছু সুবিধা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা না হলে চলচ্চিত্র দেখার মতো বিষয় থেকে সর্বদা কিছু লোককে বঞ্চিত করা হবে। এই ব্যক্তিদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে কখনোই বিশেষ ব্যবস্থা বা সুবিধা প্রদান বলে মনে করা ঠিক নয়। এটা তাদের প্রতি সম্মান এবং মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার যা অন্যদের সঙ্গেও করা হয়। সুতরাং সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ অধিকারকে কখনোই বিশেষ সুবিধা বলে গণ্য করা উচিত নয়।

হস্তক্ষেপবাদী (Interventionist)

চতুর্থত, অনেক সমালোচক মনে করেন ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে দমনমূলক এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার উপর অনেক বেশি হস্তক্ষেপ করে থাকে। এই যুক্তি ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ভুল ব্যাখ্যা করে। এটা সত্যি যে পারস্পরিক বর্জন নীতি প্রত্যাখানের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের মধ্যে অহস্তক্ষেপ নীতিকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এটি অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপবাদী। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিগত দূরত্ব বজায় রাখার আদর্শকে অনুসরণ করে, যেটি হস্তক্ষেপের বিষয়টিকে সম্মতি দেয়। পাশাপাশি যে-কোনো ধরনের হস্তক্ষেপকেই আবার দমনমূলক হস্তক্ষেপ বলা উচিত নয়।

কীভাবে একটি রাষ্ট্র সকল ধর্মের প্রতি একই ধরনের ব্যবহার করতে পারে? প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য সমান সরকারি ছুটির ব্যবস্থা করা কি উচিত? ধর্মীয় উৎসব পরিচালনা সরকারিভাবে বন্ধ করে দিলে কি এই সমস্যার সমাধান সম্ভব?

এটা অবশ্যই সত্যি যে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র সমর্থিত ধর্ম সংস্কারের অনুমতি দেয়। কিন্তু এটাকে উপর থেকে দমনমূলক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া কোনো ধর্মীয় সংস্কার বলে গণ্য করা উচিত নয়। বিতর্কের বিষয় হল এটা কি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়? তাহলে কেন ভারতে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের নিজস্ব আইনগুলো সংশোধন করা হয়নি? এই ব্যাপারে ভারত উভয় সঙ্কটে রয়েছে। একজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীর মতে, ধর্মীয় নিজস্ব আইনগুলো (বিভিন্ন ধর্মে প্রচলিত বিবাহ, উত্তরাধিকার ও পারিবারিক আইন) হল সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষের অধিকারের বহিঃপ্রকাশ। আবার কেউ উক্ত আইনগুলোকে নিরপেক্ষ নীতির পরিপন্থী বলে মনে করতে পারে কারণ এগুলো মহিলাদের সমমর্যাদা প্রদান করে না। সেই জন্য এই আইনগুলো রাষ্ট্রের পক্ষে নিরর্থক। এই ব্যক্তিগত আইনগুলোকে আন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীনতার অভিব্যক্তি রূপে গণ্য করা হয়, অন্যদিকে অন্তঃধর্মীয় কর্তৃত্বের দৃষ্টান্ত বলেও গণ্য করা যায়।

এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলোকে যে-কোনো জটিল মতবাদের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এই ধরনের বিরোধগুলো চিরস্থায়ী। ব্যক্তিগত আইনগুলোকে এমনভাবে সংস্কার করা যেতে পারে যাতে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের সংস্কার রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী দ্বারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে করা যায় না। আবার অন্যদিকে রাষ্ট্র এর থেকে সম্পূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখার নীতি ও গ্রহণ করতে পারে না। রাষ্ট্রকে অবশ্যই সকল ধর্মের অভ্যন্তরীণ, উদারনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক মতকে সমর্থন করার মাধ্যমে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে।

ভোট ব্যাংক রাজনীতি (Vote Bank Politics)

পঞ্চমত, ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ রয়েছে যে, এটি ভোট ব্যাংক রাজনীতিকে উৎসাহিত করে। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। সুতরাং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। প্রথমত, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতিবিদরা জনগণের কাছে ভোট চাইতে বাধ্য। এটা রাজনীতিবিদদের কার্যকলাপের একটি অঙ্গ। কোনো জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করলে বা তাদের ভোট অর্জনের জন্য কোনো বিশেষ নীতি প্রণয়ন করার প্রতিশ্রুতি দিলে সেক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করা ঠিক হবে না। কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন হল ঠিক কি কারণে ভোট চাওয়া হচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই ব্যবস্থা কি শুধুমাত্র নেতাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অথবা ক্ষমতালাভের জন্য বা কোনো গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য? যদি রাজনীতিবিদদেরকে ভোট দানকারী গোষ্ঠী কোনোভাবে লাভবান না হন তাহলে রাজনীতিবিদদের দোষ দেওয়া যেতে পারে। যদি একজন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ সংখ্যালঘুদের ভোট চান এবং তাদের চাহিদা পূরণে সমর্থ হন, তাহলে এটি ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সাফল্য বলে ধরা যেতে পারে, কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অন্যতম কাজ হল সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করা।

কিন্তু যদি একটি গোষ্ঠী উন্নয়ন অন্য একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ এবং অধিকারের বিনিময়ে চাওয়া হয় তাহলে কী হবে? যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদরা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে তাহলে কী হবে? তখন সমাজে আর একটি নতুন ধরনের অন্যায় সৃষ্টি হবে। তুমি কি এই ধরনের কোনো উদাহরণের কথা চিন্তা করতে পারে? এক দুটি নয় বরং এরকম অনেক উদাহরণ দিতে পারি যার ফলে তুমি দাবি করতে পারো যে পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংখ্যালঘুদের পক্ষে ঝুঁকে রয়েছে, যদি তুমি গভীরভাবে চিন্তা কর, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে ভারতবর্ষে এরকম ঘটনার খুব কম নজির রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভোট ব্যাংক রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষতির এমন কিছু নেই, কিন্তু যদি ভোট ব্যাংক রাজনীতির মাধ্যমে অন্যায়ের সৃষ্টি করা হয় তাহলে তা সমর্থনযোগ্য নয়। সাধারণ সত্য হল এই যে ধর্মনিরপেক্ষ দল ভোট ব্যাংক রাজনীতি করলেও তা খুব একটা পীড়াদায়ক নয়। আসলে সকল দলই কিছু সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই কাজটি করে থাকে।

অসম্ভব প্রকল্প (Impossible Project)

সর্বশেষে একটি কঠোর সমালোচনা হল, ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো কাজই করতে পারে না কারণ এর প্রত্যাশা সীমাহীন। এটি এমন সমস্যার সমাধান করতে চায় যা প্রায় অসম্ভব । এই সমস্যাটা কী ? গভীর ভাবে ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা কখনোই শান্তিতে একসঙ্গে বসবাস করতে পারে না। বাস্তবে এই অভিযোগটি সত্য নয়। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সুদীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন ধর্মের লোক এখানে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। এরকম ঘটনা অন্যত্রও লক্ষ করা যায়। ওটোমান সাম্রাজ্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এক্ষেত্রে সমালোচকরা বলতে পারে যে, বৈষম্যপূর্ণ সহাবস্থান হয়তো সম্ভব। সমাজে শ্রেণি বিন্যস্ত ব্যবস্থায় সবাই নিজের স্থান খোঁজে নিতে পারে। সমালোচকরা দাবি করেন যে বর্তমানে এটি ফলপ্রসূ হবে না কারণ সাম্যের আদর্শ ক্রমাগত একটি প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে পরিণত হয়ে উঠছে।

এই ধরনের সমালোচনার উত্তর ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোনো থেকেও উপস্থাপন করা যায়। একটি কঠিন উদ্দেশ্যের জন্য অগ্রসর হওয়া ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নিকট একটি দর্পণ হতে পারে। এটা এজন্য প্রয়োজন কারণ পূর্বেকার অনেক উপনিবেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে শরণার্থী পাশ্চাত্য দেশগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতির ফলে বিশ্বব্যাপী স্থানান্তরিত জনগণের সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই তাদের অভ্যন্তরীণ সমাজের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে প্রায় ভারতের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। এসকল রাষ্ট্রগুলো অধীর আগ্রহের সাথে ভবিষ্যৎ ভারতের অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে আছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা

ভারতের সরকারি ছুটির দিনগুলির তালিকাটি পড়ো ঃ এই তালিকা কি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে সমর্থন করে? তোমার যুক্তি দাও।

বিভিন্ন ছুটির নাম	গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ছুটির তারিখ (২০১৮ ইং)
প্রজাতন্ত্র দিবস	২৬ জানুয়ারি
মহা শিবরাত্রি	১৪ ফেব্রুয়ারি
হোলি	২ মার্চ
মহাবীর জয়ন্তী	২৯ মার্চ
বড়োদিন	৩০ মার্চ
বুদ্ধ পূর্ণিমা	৩০ এপ্রিল
ঈদ-উল-ফিতর	১৬ জুন
স্বাধীনতা দিবস	১৫ আগস্ট
ঈদ-উদ-জোহা (বকরি-ঈদ)	২২ আগস্ট
জন্মাষ্টমী	৩ সেপ্টেম্বর
মহরম	২১ সেপ্টেম্বর
গান্ধি জয়ন্তী	২ অক্টোবর
দশেরা	১৯ অক্টোবর
দীপাবলি	৭ই নভেম্বর
মিলাদ-উন-নবি/ঈদ-এ-মিলাদ (হজরত মহম্মদের জন্মদিন)	২১ নভেম্বর
গুরু নানকের জন্মদিন	২৩ নভেম্বর
ক্রিসমাস ডে	২৫ ডিসেম্বর।

অনুশীলনী

১. নিম্নলিখিত বিষয়ের কোন্‌গুলো ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কেন? যুক্তি দেখাও।

ক) একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি।
খ) যে-কোনো ধর্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি।
গ) সকল ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সমান সমর্থন।
ঘ) বিদ্যালয়ে প্রার্থনাসভা বাধ্যতামূলক করা।
ঙ) যে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান।
চ) সরকার কর্তৃক মন্দির পরিচালন কর্তৃপক্ষ নিয়োগ।
ছ) মন্দিরে দলিত সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ।

২. পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নীচে মিশ্রিত আকারে পরিবেশন করা হল। সেগুলো পৃথক করে একটি নতুন সারণি প্রস্তুত করো।

পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতা	ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা
ধর্ম এবং রাষ্ট্রের একে অপরের বিষয়ে কোনো রূপ হস্তক্ষেপ না করা।	রাষ্ট্র সমর্থিত ধর্মীয় সংস্কারের অনুমোদন
বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতা একটি উদ্বেগের বিষয়।	ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া।
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।	সম্প্রদায়ভিত্তিক অধিকারের উপর কম গুরুত্ব দেওয়া।
ব্যক্তি এবং তার অধিকারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা।	ব্যক্তি এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উভয়ের অধিকার সুরক্ষিত করা।

ধর্মনিরপেক্ষতা

অনুশীলনী

৩. ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে তুমি কী বোঝ? এটাকে কি ধর্মীয় সহনশীলতার সাথে তুলনা করা যায়?

৪. নীচের বক্তব্যগুলোর সাথে কি তুমি সহমত পোষণ কর? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো।

ক) ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের কোনো ধরনের ধর্মীয় পরিচিতি রাখার অনুমতি দেয় না।

খ) ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের অভ্যন্তরীণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্ত ধরনের বৈষম্যের বিরোধী।

গ) ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি পাশ্চাত্য খ্রিস্টান সমাজ থেকে হয়েছে। এটি ভারতের জন্য উপযুক্ত নয়।

৫. ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ থেকেও আরও বেশি কিছু নির্দেশ করে। ব্যাখ্যা করো।

৬. নীতিগত দুরত্বের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো।

নবম অধ্যায়

শান্তি PEACE

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সম্পর্কিত সংবাদ মাধ্যমের জ্বালাময়ী প্রতিবেদন প্রত্যহ মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা একটি সমস্যাসংকুল সময়ের মধ্যে বসবাস করছি। যদিও প্রকৃত শান্তি এখনও অধরা, তবুও শান্তি কথাটি পৃথিবীতে খুব জনপ্রিয়। শব্দটি রাজনীতিবিদ্, সাংবাদিক, শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ ও সেনাবাহিনীর আধিকারিকদের মুখে সর্বদা উচ্চারিত হয়। বিশাল সংখ্যক প্রমাণাদি যেমন সংবিধান, সনদ, চুক্তি কিংবা পাঠ্যবই সমূহে শান্তি বিষয়টিকে লালিত স্বপ্ন এবং মূল্যবোধ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যেহেতু শান্তির ধারণাটি সকলে কামনা করে এবং এর প্রাপ্তির আকাঙ্খাকে সাধুবাদ জানায় সেহেতু আমাদের জন্য এই ধারণাটিকে খুব বেশি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা মূল বিষয় নয়। পরবর্তীতে আমরা দেখব যে শান্তির প্রতি সহজাত ঐক্যমত্য তুলনামূলকভাবে একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। যুগ যুগ ধরে শান্তির অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তাকে বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

শান্তির প্রবক্তারা যে সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হন :

- শান্তি আসলে কী? বর্তমান পৃথিবীতে এই ধারণাটি এত ভঙ্গুর কেন?
- শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য করণীয় কী?
- শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কি বলপ্রয়োগ করতে পারি?
- আমাদের সমাজে ক্রমবর্ধমান অশান্তির পেছনে মূল কারণগুলি কী কী?

এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোকে আমরা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করব।

শান্তি

৯.১ ভূমিকা (Introduction)

'গণতন্ত্র', 'ন্যায়বিচার', 'মানবাধিকার' ইত্যাদির মতো 'শান্তি' শব্দটিও সমাজে বহুচর্চিত। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশার উপর উদ্ভূত সহমত ব্যাপারটি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক। অতীতের অনেক প্রখ্যাত চিন্তাবিদ্ শান্তি কথাটিকে নেতিবাচক অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

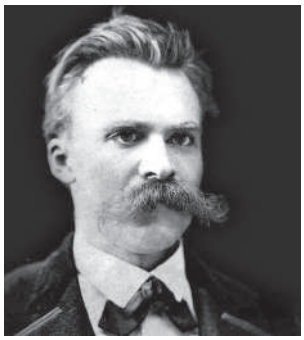

ফ্রেডারিক নিটজেঁ

উনিশ শতকের জার্মান দার্শনিক ফ্রেডারিক নিটজেঁ ওই সকল লোকদের মধ্যে অন্যতম যারা যুদ্ধকে মহিমান্বিত করেছেন। নিটজেঁ শান্তি ব্যাপারটিকে মূল্য দিতেন না, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে কেবলমাত্র সংঘর্ষই সভ্যতাকে বিকশিত করতে পারে। অনুরূপভাবে অন্যান্য অনেক চিন্তাবিদ্ও শান্তির ধারণাকে বিদ্রুপ করতেন এবং সংঘর্ষকে ব্যক্তিগত বীরত্ব ও সমাজের চালিকাশক্তির বাহক বলে মনে করতেন। ইতালির সমাজতত্ত্ববিদ ভিলফ্রেডো প্যারেটো (১৮৪৮-১৯২৩) যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে সকল মানুষ নিজের সামর্থ্য এবং প্রবল ইচ্ছা শক্তির দ্বারা বল প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধন করতেন তারাই বেশিরভাগ সমাজের শাসকশ্রেণিতে পরিণত হতেন। তিনি ওই সকল লোকদের 'সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

এতে এটা প্রমাণিত হয় না যে শান্তির সপক্ষে কোনো প্রবক্তা নেই। বস্তুত, শান্তি কথাটি প্রায় সকল ধর্মেরই মৌলিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। আধুনিক যুগে আধ্যাত্মিক এবং বস্তুবাদী কার্যক্ষেত্রেও শান্তির সপক্ষে অনেক প্রত্যয়ী প্রবক্তাদের লক্ষ করা যায়। মহাত্মা গান্ধি তাদের মধ্যে অন্যতম। শান্তির বর্তমান ধারণাটি শুরু হয় বিংশ শতকে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সংঘর্ষে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। এধরনের বহু সংঘর্ষের কথা তুমি হয়তো ইতিহাসের পাঠ্যবইগুলোতে পড়েছ, যেমন স্বৈরতন্ত্র ও নাৎসিবাদের উত্থান এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধ। ভারত পাকিস্তানের বিভাজনের ভয়াবহতাও আমরা অনেকে স্বচক্ষে দেখেছি।

উপরে উল্লিখিত সংঘর্ষগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নজিরবিহীন ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংগঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা লন্ডন শহরে ভয়াবহ 'কার্পেট বোমা' নিক্ষেপ করে এবং প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশরাও জার্মানের বিভিন্ন শহরের উপর প্রায় ১০০০ বোমার আক্রমণ চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয়, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোসিমা এবং নাগাসাকি নামক জাপানের দুটি শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এই দুটি আক্রমণে

শান্তি

চলো চর্চা করি

ইদিতা মরিসের লেখা 'দ্য ফ্লাওয়ার্স অব হিরোসিমা' নামক উপন্যাসটি পড়ো। লক্ষ কর কীভাবে পারমাণবিক বোমা দীর্ঘ সময় ধরে জনগণের জীবনকে ক্রমাগত বীভৎস করে তুলেছে।

কমপক্ষে ১,২০,০০০ মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয় এবং পরবর্তীতেও বিষাক্ত পারমাণবিক বিকিরণের ফলে অসংখ্য মানুষের জীবনহানি ঘটে। হতাহতদের প্রায় ৯৫ শতাংশই ছিল সাধারণ মানুষ।

যুদ্ধ পরবর্তী দশকগুলোতে পৃথিবীব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের জন্য পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার মত দুটি মহাশক্তিধর দেশ তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। চূড়ান্ত ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে এই মহাশক্তিধর দুটি দেশ বিপুল পরিমাণে পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুত এবং মজুত করতে শুরু করে। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে 'কিউবার মিসাইল সংকট' ছিল সামরিক প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ কালো অধ্যায়। এই সংকট তখন শুরু হয় যখন আমেরিকার গুপ্তচর বিমানগুলো প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিউবায় সোভিয়েত রাশিয়ার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার উপকূলে নৌ-অবরোধ সৃষ্টি করে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণের হুমকি দেয় এবং অতি সত্বর কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রত্যাহারের জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বারা ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রত্যাহারের ফলে এই মুখোমুখি সংঘর্ষের অবসান ঘটে। এই অবস্থাটি দুই সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে, তবে এসংঘর্ষটি সমগ্র মানবসমাজকে ধ্বংসের প্রায় চূড়ান্ত সীমায় ঠেলে দিয়েছিল।

সুতরাং মানুষ শান্তি বিষয়টি প্রশংসা করে শুধুমাত্র এই বিশ্বাসে নয় যে, এটি একটি ভাল ধারণা। অশান্ত বিশ্বে চরম মূল্য দেওয়ার পরেই মানুষ শান্তি কথাটিকে মূল্য দিতে শুরু করেছে। হৃদয় বিদারক এই সংঘর্ষগুলোর বীভৎসতা এখনো আমাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে। বর্তমানে সর্বত্র বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদী ঘটনাসমূহের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন পূর্বের থেকেও বেশি অনিশ্চিত। শান্তি সর্বদাই মূল্যবান কারণ এর প্রতি হুমকি সর্বত্রই বিরাজমান।

সে নিশ্চয় কোনো অনুন্নত দেশ থেকে এসেছে। সে শুধু কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, আশ্রয় ইত্যাদির কথা বলে। তবে পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে একটি শব্দও বলে না।

৯.২ শান্তির অর্থ (The Meaning of Peace)

যুদ্ধহীন পরিস্থিতিকেই শান্তি বলা হয়। এই সংজ্ঞাটি সরল হলেও বিভ্রান্তিকর। কারণ সাধারণত যুদ্ধ হল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষ। তবে রোয়ান্ডা অথবা বসনিয়ায় যা ঘটেছে তা এই প্রকারের যুদ্ধ নয়। এটা ছিল শান্তির উল্লঙ্ঘন কিংবা অনুপস্থিতি, যদিও সকল প্রকার যুদ্ধই শান্তিকে বিঘ্নিত করে, তবে শান্তির অনুপস্থিতিজনিত অবস্থাকে সব সময় যুদ্ধ বলা যায় না।

দ্বিতীয় স্তরের সংজ্ঞায় শান্তি হল সকল প্রকার সংঘর্ষ যেমন যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণহত্যা, গুপ্তহত্যা, অথবা যে কোনো প্রকারের শারীরিক আক্রমণের অনুপস্থিতি। এই সংজ্ঞাটি পূর্বের সংজ্ঞার তুলনায় নির্ভরযোগ্য। যদিও এই সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ নয়। সামাজিক অবকাঠামোর অভ্যন্তরে সংঘর্ষের শেকড় লুকিয়ে আছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলনের মধ্যে প্রোথিত জাতি, শ্রেণি এবং লিঙ্গ বৈষম্য অদৃশ্যভাবে একে অপরকে আঘাত করে চলেছে। নিপীড়িত শ্রেণি যখনই এ ধরণের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে, তখনই বিবাদ এবং সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। 'এরূপ কাঠামোগত সহিংসা' বিশাল আকারের বিপর্যয়কে প্রসারিত করে। চলো, এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জাতিবাদ, উপনিবেশবাদ, পিতৃতান্ত্রিকতা, উঁচু-নীচু জাতিভেদ প্রথা এবং শ্রেণিবৈষম্যবাদের দ্বারা সৃষ্ট কিছু প্রকৃষ্ট উদাহরণের দিকে তাকাই।

কাঠামোগত সহিংসতার ধরন (Forms of Structural Violence)

চিরাচরিত জাতিভেদ প্রথায় কিছু সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য বলে মনে করা হয়। যদিও স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান এধরনের প্রথাকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে, তবুও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ এখনও তাদের সামাজিক বর্জন এবং অবর্ণনীয় দুর্দশা ও বঞ্চনার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এরূপ কুৎসিত প্রথার ক্ষতচিহ্নকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য আমাদের দেশ ক্রমাগত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। শ্রেণিভিত্তিক কোনো সামাজিক প্রথা নমনীয় হলেও তা বড়ো ধরনের বৈষম্য ও উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেশিরভাগ শ্রমজীবি মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়, যেখানে কাজের পরিবেশ এবং মজুরি ব্যবস্থা ভীষণ ভয়ঙ্কর। এমনকি উন্নত রাষ্ট্রগুলোতেও এরূপ অবহেলিত মানুষ যথেষ্ট সংখ্যায় বসবাস করে।

পিতৃতন্ত্র হল এক ধরনের সামাজিকভাবে সংগঠিত রূপ, যার পরিণতি নারীদের নিয়মতান্ত্রিক পরাধীনতা ও বঞ্চনা। যে সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে পিতৃতান্ত্রিকতার স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহল কন্যাভ্রূণ হত্যা, তাদের প্রতি প্রয়োজনীয় যত্নহীনতা ও শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীদের প্রতি নিপীড়ন, যৌতুক সম্পর্কিত অপরাধ, কর্মস্থলে শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, পরিবারের সম্মান রক্ষায় স্বজনহত্যা (অনার কিলিং) ইত্যাদি। ২০১১ সালের আদমসুমারি

চলো চর্চা করি

নীচের মন্তব্যগুলোর সাথে তুমি কি একমত এবং কেন:

- 'সকল কুকর্মই সংগঠিত হয় আত্মার কারণে।' 'যদি আত্মার রূপান্তর হয় কুকর্ম কি অবশিষ্ট থাকে?'

  — গৌতম বুদ্ধ।

- 'সহিংসতা যদি ভালো কিছুও বয়ে আনে তবু আমি তার প্রতিবাদ করি, কারণ এই ভালো ক্ষণস্থায়ী: এটা (সহিংসতা) যে বিপর্যয় বয়ে আনে তা দীর্ঘস্থায়ী।'

  — মহাত্মা গান্ধি।

- 'তুমি তাদের মধ্যে পরিগণিত হও যাদের দৃষ্টি শত্রুর সন্ধান করে ... শান্তিকে ভালোবাসো নতুন যুদ্ধের সূত্রপাত হিসাবে — ক্ষণস্থায়ী শান্তি দীর্ঘস্থায়ী শান্তির চেয়েও বেশি। আমার পরামর্শমতো কাজের প্রতি নয়, বিজয়ের দিকে অগ্রসর হও। যুদ্ধই তোমার কর্ম হউক, বিজয় হউক তোমার শান্তি।'

  — ফ্রেডারিক নিটজেঁ

অনুযায়ী ভারতে (০—৬বছর পর্যন্ত) প্রতি ১০০০ পুরুষের মধ্যে মহিলার সংখ্যা হল ৯১৯। পিতৃতান্ত্রিকতা যে কত ধ্বংসাত্মক এই পরিসংখ্যানটি তা প্রমাণ করে।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা, যেখানে কোনো একটি দেশের জনগণ বিদেশি শাসকদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরাধীন থাকে, সে অবস্থা এখন আর নেই। তবে ইজরাইলি কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের চলমান সংগ্রাম এটা প্রমাণ করে যে উপনিবেশবাদী শাসন এখনো সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়নি। এছাড়া ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দ্বারা একসময়ে শোষিত দেশগুলো এখনো বিভিন্ন প্রকারের দুর্দশা থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসতে পারছে না, যেগুলো তারা ঔপনিবেশিক শাসনকালে সহ্য করত।

উগ্রজাতিবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ কোনো একটি জাতি কিংবা সম্প্রদায়ের সামগ্রিক সত্তাকে কালিমালিপ্ত অথবা বিপর্যস্ত করে তুলে। যে আদর্শের দ্বারা মানবসমাজ বিশেষ বিশেষ জাতিগোষ্ঠিতে বিভাজিত হয় তা বৈজ্ঞানিকভাবে ক্ষতিকারক, কারণ এটি দমনমূলক সামাজিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দেয়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের দাসত্ব (১৮৬৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত), হিটলারের জার্মানি কর্তৃক ইহুদিদের গণহত্যা ও বর্ণবাদী প্রথা যা ১৯৯২ সাল পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার গ্রহণ করেছিল এবং যে ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের দেশের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল। পশ্চিমা দেশগুলোতে এখনো জাতিগত বৈষম্য অপ্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান এবং তা এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা

শরণার্থীদের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। উগ্রজাতিবাদী প্রথার প্রতিরূপ হল দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচলিত সাম্প্রদায়িকতাবাদ যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বেশিরভাগই হল ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণ।

সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির উপকরণ

এধরণের সহিংসতায় মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরিক আঘাতে জর্জরিত জনগণ প্রায়ই বিভিন্ন হতাশা ও ক্ষোভ-বিক্ষোভ ব্যক্ত করে, যা পরবর্তী প্রজন্মকেও প্রভাবিত করে। কখনো কখনো বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা কিংবা কটূক্তির কারণে তারা নতুন করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দক্ষিণ এশিয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা পরস্পরের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি অভিযোগের অনেক উদাহরণ আমাদের কাছে আছে। যেমন ওই সকল সহিংস ঘটনা যা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের সময় সংগঠিত হয়েছিল।

সঠিক এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জন করা সম্ভব হবে যদি কার্যকর আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক ক্ষোভ এবং সহিংসতার কারণগুলোকে চিহ্নিত করে তা নির্মূল করা যায়। তাই ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার চলমান প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে দুদেশের সকল প্রকার মানুষের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ককে আরও সমুন্নত করার বিষয়টিও যুক্ত করা উচিত।

সহিংসতা দূরীকরণ (Eliminating Violence)

ইউনেস্কোর সংবিধান (ইউনাইটেড নেশনস্ এডুকেশন সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন) সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে: 'যেহেতু যুদ্ধের উৎস হল মানুষের আত্মা সেহেতু শান্তি প্রতিষ্ঠাও মানুষের আত্মাতেই সংগঠিত হবে।' অনেক বর্ষ পুরোনো আধ্যাত্মিক নীতি যেমন, সহানুভূতি এবং ধ্যানের মত অনুশীলন এধরনের প্রয়াসকে সঠিকভাবে উৎসাহিত করেছে। আধুনিক চিকিৎসা ও নিরাময় পদ্ধতি যেমন মনস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষণও এরূপ কর্মসম্পাদন করতে পারে।

চলো চর্চা করি

নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত কিছু মানুষের নামের তালিকা প্রস্তুত করো। তাদের যে কোনো একজন সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।

তবে আমরা লক্ষ করেছি যে সহিংসতা শুধুমাত্র ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিকতা থেকেই উদ্ভব হয় না, বরং তা সমাজের মূল অবকাঠামোতেই গ্রথিত। একটি ন্যায়পরায়ণ ও গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের দ্বারাই কাঠামোগত সংঘর্ষের অবসান ঘটতে পারে। শান্তি হল বিভাজিত মানুষের সুষম সহাবস্থানের ফলশ্রুতি। এটা কখনোই সকলের জন্য একটি পর্বে অর্জন করা যাবে না। শান্তি নিজে সর্বশেষ কথা নয়, বৃহত্তর দৃষ্টিকোণে শান্তি হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সকল প্রকারের

নৈতিক এবং বাস্তবিক উপাদানগুলো সমষ্টিগতভাবে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে।

৯.৩ সহিংসতা কি কখনো শান্তির সহায়ক হতে পারে? (Can Violence ever promote peace ?)

এটা দাবি করা হয় যে অশুভ হলেও সহিংসতা কখনো কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হয়ে উঠে। যুক্তি হিসাবে বলা যায় যে, স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসকদের ক্রমাগত নিপীড়ন থেকে জনগণকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র পথ হল তাদের বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করা। নির্যাতিত মানুষের সহিংস মুক্তি আন্দোলন এক্ষেত্রে বৈধ বলে বিবেচনা করা হয় । তবে সহিংসতার প্রবণতা কখনো আত্মহননের দিকে ধাবিত হয়। সহিংসতা একবার শুরু হয়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, পেছনে রেখে যায় শুধু ধ্বংস এবং মৃত্যুর মিছিল।

চলো চর্চা করি

কম্বোডিয়ার সামরিক শাসক খেমার রোজের শাসনকালকে হিংসাত্মক প্রতি বিপ্লবী আন্দোলনের ভয়ঙ্কর উদাহরণ হিসাবে মনে করা হয়। এটা ছিল পল পট দ্বারা পরিচালিত চরম বিদ্রোহের পরিণতি, যার মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির মুক্তির নিমিত্তে সেখানে একটি সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়।

১৯৭৫-১৯৭৯ সময়কালে এমন আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে ১.৭ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়। (যা ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার ২১শতাংশ)। পূর্ব শতাব্দীর মধ্যে এটা ছিল মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা।

কতগুলো স্পষ্ট এবং কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে আমূল সংস্কারবাদী আন্দোলনের দ্বারা গৃহীত সহিংসতা সর্বদাই এমন নাটকীয় কিংবা ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে আসে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এটি এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকরূপ নেয় যা পরবর্তী রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠে। অনুরূপ ঘটনা এন এল এফ (নেশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট) নামক সংগঠনটির ক্ষেত্রেও ঘটে, যারা সহিংসতার মাধ্যমে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিল। ১৯৬২ সালে যখন দেশটি ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে তখন সংগঠনটির দ্বারা পরিচালিত শাসন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অবনমিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে ইসলামি মৌলবাদের দিকে ধাবিত হয়।

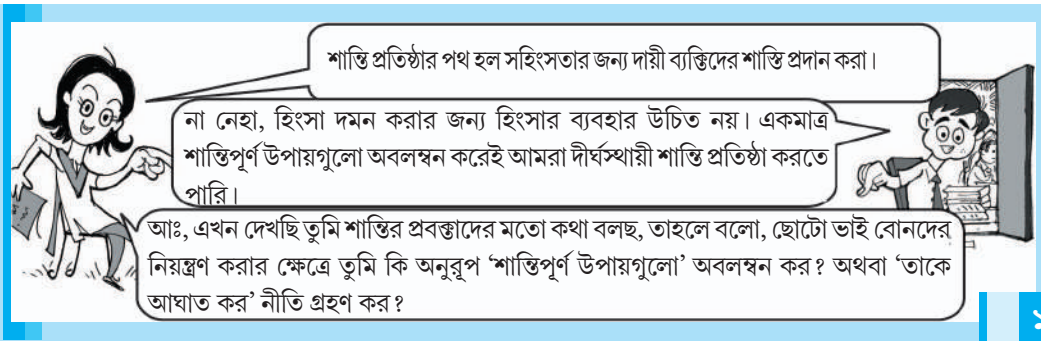

গান্ধিজির অহিংস নীতি(Mahatma Gandhi on Non-Violence)

তুমি হয়তো এ প্রবাদটি শুনেছ যে, 'অসহায়তার অপর নাম মহাত্মা গান্ধি।' অসহায়তাকে অহিংসা এবং অহিংসাকে গান্ধিজির সাথে যুক্ত করার প্রবণতা থেকেই কিছু মানুষ এধরণের উক্তি করে থাকেন। এই হাল্কা মন্তব্যটি বহুলভাবে প্রচারিত একটি জনমতেও পরিণত হয়েছে যে অহিংসা হল দুর্বলের আদর্শ। অহিংসার এরূপ আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে গান্ধিজি এর একটি বিকল্প আদর্শ তুলে ধরেছেন। সাধারণত আমরা অহিংসা বলতে আঘাত না করাকে বুঝি। যা শারীরিক আঘাতকে উৎসাহ দেয় না তাই অহিংসতা । এই অর্থকে গান্ধিজি দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে অহিংসার অর্থ শুধু দৈহিক আঘাত করা থেকে বিরত হওয়া নয় বরং মানসিক আঘাত অথবা জীবন জীবিকার ক্ষতি করা থেকেও দূরে থাকা। এমনকি কি কাউকে আঘাত করার মানসিকতা পরিত্যাগ করাও অহিংসা। তিনি মনে করেন 'হিংসার কারণ হওয়ার' অর্থ নিজে কাউকে প্রত্যক্ষ আঘাত করাকে বোঝায় না। তিনি আরও বলেন, 'আমি যদি অন্যজনকে আঘাত করতে কাউকে সাহায্য করি অথবা যে কোনো সহিংস কর্মদ্বারা লাভবান হই তাহলে আমি হিংসার অভিযোগে অভিযুক্ত হব।' এই দৃষ্টিভঙ্গিতে হিংসার সাথে যুক্ত গান্ধিজির ধারণা 'কাঠামোগত হিংসার' কাছাকাছি। গান্ধিজি প্রবর্তিত অহিংস নীতির দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি আরও বেশি ইতিবাচক। যেমন, কাউকে আঘাত করার কারণ না হওয়াই যথেষ্ট নয়। অহিংসতার জন্য প্রয়োজন সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতা। গান্ধিজি নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিকতাবাদের বিরোধিতা করতেন। তাঁর মতে অহিংসার অর্থ হল সকলের জন্য কল্যাণ এবং সুন্দরের প্রত্যাশা করা। অতএব যারা অহিংসার পূজারি তাদের গভীর প্ররোচনার মধ্যেও দৈহিক এবং মানসিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে। অহিংসা হল একটি সক্রিয় ও অদম্য শক্তি যার মধ্যে ভীরুতা কিংবা কাপুরুষতার কোনো স্থান নেই। বস্তুত গান্ধিজি এটাও বলেছেন যে, যারা অহিংসার মাধ্যমে নিজেদের সুরক্ষা করার শক্তি অর্জন করতে পারে না, তা অহিংসার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকার চেয়ে কিছুটা হিংসা অবলম্বন করে সক্রিয় থাকা তাদের জন্য উত্তম। তাই গান্ধিবাদীরা মনে করেন শুরুতে উল্লিখিত প্রবাদটি পরিবর্তন করে বলা উচিত 'দৃঢ়তার অপর নাম মহাত্মা গান্ধি'।

একারণে শান্তির প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা কোনো বৈধ উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রেও সহিংসতার পরিবর্তে নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন। যদিও তারা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন, তবুও তারা মনে করেন যে অত্যাচারীর মন ও হৃদয়কে জয় করার মূল অস্ত্র হল সত্য এবং সহমর্মিতার ক্রমাগত প্রচার।

এর অর্থ সংগ্রামরত মানুষের সামর্থ্যকে ছোটো করে দেখা নয় বরং প্রতিবাদের অহিংস আদর্শের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা। আইন অমান্য আন্দোলন এধরনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যা সার্থকভাবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে শোষকের পীড়ন পদ্ধতিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এমন আরেকটি

চলো বিতর্ক করি

তুমি কি মনে কর কখনো কখনো হিংসার পথ অবলম্বন করা জরুরি হয়ে পড়ে? সর্বোপরি, জার্মানির নাৎসি শাসকদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য বহিরাগত সামরিক হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

উৎকৃষ্ট আদর্শ গান্ধিজি প্রয়োগ করেছিলেন, যার নাম সত্যাগ্রহ। সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে অবস্থান নিয়ে গান্ধিজি ব্রিটিশ শাসকদের বিবেককে নাড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। যখনই এ পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে তখনই তিনি বিশাল গণআন্দোলনের দ্বারা অহিংস পদ্ধতিতে দমনমূলক আইন অমান্য করে ব্রিটিশ শাসকদের উপর নৈতিক এবং রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

চলো চর্চা করি

দক্ষিণ আফ্রিকা, চম্পারন এবং ডান্ডি অভিযানে ব্যবহৃত গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কিত উপকরণগুলো সংগ্রহ করো। সম্ভব হলে গিরিরাজ কিশোর প্রণীত 'পেহেলা গিরমিটিয়া' বইটি পড়ো।

মার্টিন লুথার কিং এর পৌর অধিকার আন্দোলন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করো। কীভাবে তিনি গান্ধিজির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

গান্ধিজি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে মার্টিন লুথার কিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি চলমান জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৬০ এর দশকে অনুরূপ একটি আন্দোলন শুরু করেন।

৯.৪ শান্তি এবং রাষ্ট্র (Peace and The State)

এটা প্রায়ই যুক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হয় যে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রই পৃথিবীর বিভাজনই শান্তির পথে একটি বড় বাধা। যেহেতু প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা বলে মনে করে সেহেতু নিজের জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষাকে সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য বলে মনে করেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হল আমরা যেন নিজেদের বৃহত্তর মানবতার অংশ হিসাবে ভাবি। কিন্তু রাষ্ট্রসমূহ মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করে। নিজ নাগরিকদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য অন্যকে আঘাত করতেও তারা দ্বিধা করে না।

তাছাড়া বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেক রাষ্ট্রই সামরিক শক্তি ও আগ্রাসী কৌশলগুলোকে সুসংহত করে চলেছে। প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রই শুধুমাত্র নিজেদের নাগরিকদের সুরক্ষার নিমিত্তে তার সামরিক শক্তি, সেনা কিংবা আরক্ষাবাহিনীকে ব্যবহার করার কথা, কিন্তু বাস্তবে নিজ

একটি বিব্রতকর উভয় সংকট জনিত পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে নতুন এলাকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এধরণের প্রবণতা সাধারণ বিরোধকে পূর্ণমাত্রিক যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। যেমন ১৯৯০ সালে ইরাক, তৈল সমৃদ্ধ প্রতিবেশী ছোটো রাষ্ট্র কুয়েত দখল করে। এই দখলকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এই যুক্তিতে যে, একসময় কুয়েত ইরাকেরই প্রদেশ ছিল যা সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছানুসারে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কুয়েতের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ ছিল যে দেশটি ইরাকে তৈল সরবরাহকারী পাইপ লাইন নষ্ট করেছিল। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সামরিক মিত্র বাহিনী ইরাকের উপর ভীষণ প্রত্যাঘাত করে। একটি সক্রিয় বৈশ্বিক সরকারের উপস্থিতি সত্বেও এধরণের সংঘর্ষ প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান। এসকল ঘটনার ক্রমবর্ধমান অবস্থার জন্য দায়ী বিশ্বব্যাপী অস্ত্র কোম্পানিগুলোর হীন স্বার্থ, যাদের কাছে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত লাভজনক।

নাগরিকদের স্বাধীন মতামত দমন করতেও এদের ব্যবহার করা হয়। এই অবস্থাটি সাম্প্রতিক মায়ানমারের মত কর্তৃত্ববাদী এবং সামরিক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় বেশি করে স্পষ্ট। রাষ্ট্রকে অর্থবহ গণতন্ত্রে রূপান্তর এবং অধিক দায়িত্বশীল করার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলোর দীর্ঘস্থায়ী সমাধান সম্ভব। এধরণের ফলপ্রসূ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নাগরিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। এই সমাধান সূত্রটি বর্ণবাদ-পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার গ্রহণ করেছিল, যা বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক সফলতার ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত। তাই গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শান্তি রক্ষার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

৯.৫ শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি
(Different Approaches to the Pursuit of Peace)

শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এই কৌশল গুলোকে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রিকতা ও সার্বভৌমিকতাকে সমর্থন ও সম্মান করে এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার প্রতিযোগিতাকে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রত্যাশা হল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার সুষম ব্যবস্থাপনা এবং 'ক্ষমতার ভারসাম্যতার' নীতি গ্রহণের দ্বারা সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা। উনিশ শতকে এই ধরনের ভারসাম্য লক্ষ করা যায় যখন ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে আঁতাত বা মিত্রতা গড়ে তুলে সম্ভাব্য আগ্রাসন এবং বহুমাত্রিক যুদ্ধং দেহি অবস্থাকে প্রতিহত করেছিল।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটিও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধকে মান্যতা দেয়। কিন্তু রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তাও সম্ভাব্যতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টিও এক্ষেত্রে বিবেচ্য। এধরনের সহযোগিতা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াকে সমৃদ্ধ করে এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাজনিত ক্ষোভ প্রশমিত করে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী বিরোধ এবং সংঘর্ষ হ্রাস পায় এবং শান্তির সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপের উদাহরণ বার বার দিয়ে থাকেন, যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক একীকরণের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত জোট গঠিত হয় এবং সেখানে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম দুটির বিপরীতে তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মনে করে মানব ইতিহাসের ক্ষয়িষ্ণু পর্ব। এটি জাতি রাষ্ট্রে ঊর্ধ্বে এমন এক ব্যবস্থার প্রত্যাশা করে যা সকল মানুষকে বৈশ্বিক সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিপালন করে নিশ্চিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। এমন স্বপ্ন সুন্দর

শান্তিবাদ (Pacifism)

শান্তিবাদ সংকট নিরসনের মাধ্যম হিসাবে যুদ্ধ কিংবা সংঘর্ষ বিরোধী বিকল্পগুলো সম্পর্কে প্রচার করে। এই মতবাদের অন্তর্ভুক্ত অভিমতগুলোর অন্যতম হল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে কূটনৈতিক তৎপরতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অপর অভিমতটি হল পরিস্থিতি যতই ভয়ানক হোক না কেন, যুদ্ধ কিংবা বলপ্রয়োগ নীতির তীব্র বিরোধিতা করা। নীতি কিংবা প্রয়োগবাদের ভিত্তিতে শান্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত। নীতিগত শান্তিবাদ এমন বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি হয় যা মনে করে যুদ্ধ, মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার অথবা বলপ্রয়োগ জনিত যেকোনো হিংসাত্মক কার্যকলাপ নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ অন্যায়। প্রয়োগবাদী শান্তিবাদ এধরনের চরমনীতি গ্রহণ করে না বরং মনে করে যে, সংকট নিরসনে যুদ্ধ ছাড়াও ভালো বিকল্প ব্যবস্থা খোলা থাকে। পাশাপাশি এটাও বিবেচনা করে যে, যুদ্ধের দ্বারা অর্জিত লাভ তার ক্ষতির থেকেও মূল্যবান। 'পায়রা' বা 'শান্তির প্রতীক' ইত্যাদি বাগ্‌ধারা ওই সকল লোকেদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যারা যেকোনো পরিস্থিতিতে যুদ্ধকে এড়িয়ে চলে। উল্লিখিত শব্দমালা পায়রার শান্ত প্রকৃতিকে বর্ণনা করে। শান্তির পায়রা নামে ভূষিত কিছু মানুষকে প্রকৃত শান্তিবাদী বলা যায় না কারণ ক্ষেত্র বিশেষে তারা যুদ্ধকে বৈধ বলে মনে করে। পায়রার পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ হল 'ঈগল' অথবা 'যুদ্ধবাদী'। কিছু কিছু শান্তিবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করলেও সকল প্রকার বলপ্রয়োগ শারীরিক আক্রমণ অথবা সম্পদ ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধ বিরোধীরা বিশেষভাবে আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরোধিতা করে। তবে সব ধরনের সংঘর্ষকে সাধারণত অস্বীকার করে না। অন্যান্য শান্তিবাদীরা অহিংসার নীতিতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে একমাত্র অহিংসাই সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

ইউকিপেডিয়া থেকে সংগৃহীত, সকলের জন্য উন্মুক্ত বিশ্বকোশ।

ঠিকানা :***http://en.wikipedia.org/wiki/Pacifism>***

সম্প্রদায় গঠনের বীজ ইতিমধ্যে বপন করা হয়েছে, যা লক্ষ করা যায় বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক মিত্রতা ও মিথস্ক্রিয়তার মধ্যে। এই প্রক্রিয়ায় বহুজাতিক নিগম ও কোম্পানি এবং গণআন্দোলনের মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বৃহত্তর ভূমিকা পালন করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা যুক্তি দিয়ে বলে থাকেন যে চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে লুপ্তপ্রায় রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য ও সার্বভৌমিকতাকে ক্রমাগত দুর্বল করে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করছে যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উল্লিখিত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকেই গ্রহণ করেছে। নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচটি প্রভাবশালী দেশকে স্থায়ী সদস্যতা এবং 'ভেটো' ক্ষমতা (অন্য সদস্যদের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা)প্রদান করেছে। তবে পরিষদ নিজেই আন্তর্জাতিক ক্ষমতা কাঠামোর চলমান ক্রমোচ্চস্তরীয় ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক

পরিষদ বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতাকে সাহায্য করে। মানবাধিকার কমিশন অধিকার সম্পর্কিত বহুজাতিক নিয়মনীতিগুলোকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করে।

৯.৬ সমসাময়িক বাধাসমূহ (Contemporary Challenges)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঝুলিতে অনেক সফলতা থাকা সত্ত্বেও এটি শান্তির প্রতিবন্ধকতা গুলোকে আটকাতে কিংবা সমূলে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিবর্তে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলো নিজেদের একচেটিয়া সার্বভৌমিকতা, স্বার্থ ও অগ্রাধিকার অর্জনের জন্য আঞ্চলিক শক্তি কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক সামরিক জোট গঠন করেছে। যার ফলে তারা কোনো বিদেশি ভূখণ্ড দখল বা অন্য রাষ্ট্রের উপর সরাসরি সামরিক আক্রমণ চালাতেও দ্বিধাবোধ করে না। এর স্পষ্ট উদাহরণ ইরাক এবং আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার সাম্প্রতিক আক্রমণ ও অযাচিত হস্তক্ষেপ। ফলে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ বিগ্রহে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে।

সন্ত্রাসবাদের উত্থানের পেছনে আংশিকভাবে রয়েছে যুদ্ধবাদী আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থপরতা ও দায়সারা অদক্ষ আচরণ। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদীরা আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা নির্মিত অস্ত্রের সুনিপুণ এবং নির্মম ব্যবহারের মাধ্যমে শান্তির প্রতি বিশাল হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহর) ধ্বংস করা ছিল এই নির্মম সত্যের জ্বলন্ত উদাহরণ। সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা জীবাণু (রাসায়নিক) এবং পরমাণুর মত গণবিধ্বংসী অস্ত্রগুলোর ব্যবহারের ভয়ানক সম্ভাবনা এখনও বিরাজ করছে।

চলো চর্চা করি

কোনো এক বা একাধিক প্রতীক খচিত একটি শান্তি পুরস্কারের পরিকল্পনা করো। কোন্ প্রতীকটি তোমার মতে উৎকৃষ্টভাবে 'শান্তির' ধারণাকে প্রতিফলিত করবে? তুমি কাকে এবং কেন এ পুরস্কারটি দিতে চাও?

সন্ত্রাসবাদীদের গেরিলা কৌশল এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার লালসা দমন করতে বিশ্ব সম্প্রদায় ব্যর্থ হয়েছে। কোনো গোষ্ঠীর সকল মানুষকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস কিংবা গণহত্যা করা হলে বিশ্ব সম্প্রদায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৪ সালে আফ্রিকান দেশ রোয়ান্ডায় হুতু সন্ত্রাসবাদীরা প্রায় পাঁচ লক্ষ টুটসি সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করেছিল, যা ছিল একটি ভয়ংকর ঘটনা। এই গণহত্যার পূর্বে যথেষ্ট পরিমাণে গোয়েন্দা তথ্য দেওয়া হয়েছিল এবং তা বিশ্বব্যাপী সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিতও হয়, তারপরেও এই ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে কোনো আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। রোয়ান্ডার সম্ভাব্য গণহত্যা রোধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও কোনো প্রকার শান্তিবাহিনী প্রেরণ করেনি।

এই সব বলার অর্থ এই নয় যে, শান্তির সম্ভাবনা হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান এবং কোস্টারিকার মত দেশ প্রতিরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী গঠন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা

শান্তি

করা হয়েছে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চুক্তির মাধ্যমে ওই সকল মুক্তাঞ্চলে যেকোনো প্রকারের পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ, উন্নয়ন অথবা মোতায়েন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে এখনো পর্যন্ত এধরনের ছয়টি পরমাণু মুক্তাঞ্চল গঠিত হয়েছে এবং তা সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতির পর্যায়ে রয়েছে। এই ছয়টি অঞ্চল যে সকল জায়গা জুড়ে রয়েছে তাহল, দক্ষিণ মেরু অঞ্চল, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, মোঙ্গালিয়া এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। ১৯৯১ সালে পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার বিভাজন পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চলমান সামরিক তথা পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রায় সমাপ্ত করে দিয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য একটি আশু হুমকিকে রোধ করা গেছে।

চলো বিতর্ক করি

বর্তমান বিশ্বে পরমাণু অস্ত্রের উপস্থিতি যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

তাছাড়া সমসাময়িক যুগেও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে জনপ্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল উদ্যোগগুলোকে সমষ্টিগতভাবে শান্তি আন্দোলন বলে বর্ণনা করা হয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা এই আন্দোলনকে সঞ্চারিত করেছে। রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে এই আন্দোলন এখন সর্বত্রই গ্রহণ ও অনুসরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে কূটনীতিবিদ্, ধর্মবিদ্, গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণ, শিক্ষাবিদ্, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং শ্রমিক সহ সমাজের সকল অংশের লোকেরা এই আন্দোলনের সাথে ক্রমাগত যুক্ত হচ্ছে। নারী ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষার মতো সামাজিক আন্দোলন গুলোর সাথে যৌথ সম্পর্ক স্থাপন করে শান্তি আন্দোলন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'শান্তি বিদ্যা অধ্যয়ন' নামে একটি বিশেষ জ্ঞান পাঠক্রম চালু হয়েছে, যা ইন্টারনেটের মত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সফলভাবে প্রচার করা হচ্ছে।

এই অধ্যায়ে আমরা শান্তির বিভিন্ন দিক যেমন, তার অর্থ, বৌদ্ধিক ও বাস্তবিক বাধা বিপত্তিসমূহ এবং এর ভবিষ্যৎ সমাধানগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি। আমরা লক্ষ করেছি যে মানবতার বিকাশ ও কল্যাণের পক্ষে সহায়ক সুষম সামাজিক সম্পর্ক নির্মাণের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টাই হল শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপকরণ। শান্তির যাত্রাপথে সাধারণ অন্যায় থেকে সাম্রাজ্যবাদের মতো অনেক বাধা-বিপত্তি আসতে পারে। এসকল বাধা বিপত্তি নির্মূলের জন্য নির্বিচারে হিংসাত্মক কার্যকলাপ গ্রহণ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও অনৈতিক। বর্তমানে গণহত্যা, সন্ত্রাসবাদ এবং আগ্রাসী ও সর্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে শান্তিবাদী এবং যুদ্ধবাদীদের মধ্যে বিরোধের দেওয়াল ক্রমাগত মজবুত হচ্ছে। এই কঠিন মুহূর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আশু প্রয়োজন হল সুদৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কর্মতৎপরতা।

অনুশীলনী

অনুশীলনী

১। তুমি কি মনে কর যে শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন জরুরি? মানুষের মন কি শান্তিতে উৎসাহিত করে এবং এই বিষয়ে শুধু মানুষের মানসিকতা পরিবর্তনের উপর জোর দিলেই চলবে?

২। একটি রাষ্ট্র অবশ্যই তার নাগরিকদের জীবন ও অধিকারের সুরক্ষা বিধান করবে। কিন্তু, কখনো কখনো রাষ্ট্রকে কিছু মানুষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

৩। সমাজে শান্তি তখনই উপলব্ধি করা যায় যখন সমাজে মানুষের জন্য স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তুমি কি একমত?

৪। হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাহায্যে দীর্ঘস্থায়ী ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এই মন্তব্যটি সম্পর্কে তোমার অভিমত কী ?

৫। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে বর্ণিত প্রধান প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।

দশম অধ্যায়

উ ন্ন য় ন
(Development)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা ও এ সম্পর্কিত কিছু সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে এই অধ্যায়টি শুরু হবে। পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যাবলির সমাধানের পথ খুঁজে বের করা হবে এবং বিকল্প পথের অনুসন্ধান করা হবে। এই অধ্যায়টি পাঠ করার পর তোমরা —

- উন্নয়ন শব্দটির প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বর্তমান উন্নয়ন প্রকল্পের সাফল্য ও সমস্যাগুলো বর্ণনা করতে পারবে এবং
- উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিকল্প কিছু মডেল উপস্থাপন করতে পারবে।

১০.১ ভূমিকা (Introduction)

মনে করো, কোনো বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কাজের অঙ্গ হিসাবে বাৎসরিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে। একটি শ্রেণির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক বিগত বছরের সাময়িক পত্রিকাটিকে আদর্শ মডেল ধরে বর্তমান বছরের সাময়িক পত্রিকাটি কী ধরনের হবে সে বিষয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং কে কোনো বিষয়ে অর্থাৎ গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখবে তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেন। ফলস্বরূপ, যে ছাত্র ক্রিকেট খেলার উপর প্রবন্ধ লিখতে আগ্রহী, তাকে ভিন্ন একটি বিষয়ে লিখতে বলা হল এবং যাকে ক্রিকেট খেলার উপর লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় সে আসলে নাটকের উপর প্রবন্ধ লিখতে বেশি আগ্রহী। এক্ষেত্রে এটাও সম্ভব যে তিনজন ছাত্র যারা মিলিতভাবে ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে আগ্রহী, তাদের অন্য কোনো দলে ভিন্ন একটি বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হল। অন্য একটি শ্রেণিকক্ষে সাময়িক পত্রিকার বিষয় নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের জন্য অবশেষে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যাকে সবাই মেনে নেয়।

তোমার মতে কোন্ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা এমন একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করবে যেখানে শিক্ষার্থীরা উৎকৃষ্ট বিষয়ে নিজেদের বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করবে? প্রথম সাময়িক পত্রিকাটি দেখতে সুন্দর হলেও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সেটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে কতটা আকর্ষণীয় হতে পেরেছে? যে ছাত্রটি ক্রিকেটের উপর লিখতে আগ্রহী সে কি তার জন্য নির্ধারিত বিষয়ে সমান দক্ষতার সাথে লিখতে পারবে? কোন্ সাময়িক পত্রিকাটি অসাধারণ ও কোন্‌টি সাধারণ মানের হবে? কোন্ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা সাময়িক পত্রিকার কাজ অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে এবং কোন শ্রেণি এটি শুধু নিয়মমাফিক বাড়ির কাজ হিসাবে সম্পাদন করবে? অনুরূপ ভাবে সমাজের ক্ষেত্রেও উন্নয়নের জন্য কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত এবং তা সম্পাদনের সঠিক পথ কী, এ বিষয়টি বিদ্যালয়ের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ঘটনার সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রত্যাশা পূরণের পন্থা হিসাবে আমরা যান্ত্রিকভাবে এরূপ মডেল অনুসরণ করতে পারি যা পূর্ব থেকেই আমাদের দেশে বা অন্য কোন দেশে অনুসরণ করা হয়। এছাড়া আমরা সার্বিকভাবে সমাজের সকল শ্রেণির নাগরিকের উন্নয়ন সাধনের কথা মাথায় রেখে এমন প্রকল্প বা মডেল রচনা করতে পারি যা তাদের স্বাধীনতা, অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশ পরিচালকগণ জনমতকে উপেক্ষা করে গৃহীত প্রকল্প বা মডেল যান্ত্রিকভাবে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন, অথবা এই প্রকল্পের সাথে যারা জড়িত তাদের কথা বিবেচনা করে আলোচনা সাপেক্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

বৃহত্তর অর্থে উন্নয়ন বলতে বোঝায় অগ্রগতি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনের মানোন্নয়ন। উন্নয়নের এই ধারণা সামনে রেখে একটি সমাজ তার লক্ষ্য স্থির করে এবং সেই লক্ষ্য পূরণের সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে। যদিও উন্নয়নের এই ধারণাকে অনেক সময় সংকীর্ণ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন সমাজের আধুনিকীকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে অনেকে উন্নয়নের ভিত্তি বলে মনে করেন। দুর্ভাগ্যবশত প্রায়শই উন্নয়নকে পূর্ব নির্ধারিত কতগুলো লক্ষ্য অর্জনের সাথে তুলনা করা হয়। যেমন, কোনো নদীতে বাঁধ তৈরি করা, কলকারখানা ও হাসপাতাল স্থাপন করা ইত্যাদি। কিন্তু সত্যিকারের অর্থে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের কথা এক্ষেত্রে হয়তো বিবেচনা করা হয়নি। যার ফলে উন্নয়নের এই প্রক্রিয়ায় সমাজের কিছু মানুষের লাভ হলেও একটা বৃহৎ অংশের জনগণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যেমন, প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিবাসীরা অনেকেই বাস্তুচ্যুত হন এবং সরকারি সাহায্যের অভাবে তাদের জীবন যাত্রার মানের অবনতি ঘটে।

প্রশ্ন হলো উন্নয়নের স্বার্থে জনগণের অধিকার কতটা ক্ষুণ্ণ করা যায়? উন্নয়নের সুফল ও দায়বদ্ধতা কি সঠিকভাবে বন্টিত হয়েছে? অথবা প্রকল্প নির্ধারণের সময় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? সুতরাং উন্নয়ন কথাটি বর্তমানে রাজনৈতিক বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর নানা সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়, পাশাপাশি বিকল্প প্রকল্পের মডেলও পেশ করা হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কোনো দেশের উন্নয়নের বৃহত্তর ধারণা অনুসরণ করা উচিত যার উপর ভিত্তি করে সে দেশের বাস্তবিক উন্নয়নের চিত্র পরিমাপ করা যায়।

১০.২ উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ
(The Challenge of Development)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উন্নয়নের ধারণা গুরুত্বলাভ করতে থাকে। সে সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলো রাষ্ট্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা খুব বেশি উন্নত ছিল না বলে বেশিরভাগ নাগরিকের জীবনযাত্রার মান ছিল নিম্নমুখী। এমনকি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধার যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে এই দেশগুলোকে সে সময় 'অনুন্নত' বা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। উন্নয়নের নিরিখে এই রাষ্ট্রগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের ধনী রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে ছিল।

১৯৫০-৬০ এর দশকে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলো যখন ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে তখন তাদের সামনে অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল দারিদ্র্য, অপুষ্টি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও অন্যান্য অপ্রতুল নাগরিক পরিসেবা সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলা করা। তারা

অভিযোগ করে বলে যে, তাদের এই অনুন্নয়নের অন্যতম কারণ হল সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ। তাদের মতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ স্থানীয় জনগণের স্বার্থে ব্যবহার না করে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ শুধু নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এই সকল রাষ্ট্রগুলো জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দেশীয় সম্পদের পুনর্ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে। এর ফলে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়, যার দ্বারা তারা নিজেদের অনগ্রসরতা দূর করে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। এই ধারণা থেকে তারা নতুন নতুন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত হয়ে উঠে।

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আমরা শেষ হয়ে যাব।

বিগত বছরগুলিতে উন্নয়নের এই ধারনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নয়ন বলতে আধুনিকীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলোর সমকক্ষ হওয়াকে বোঝাত। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুত শিল্পায়ন এবং কৃষি ও শিক্ষার আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা চালায়। শুরুতে মনে করা হত যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রই হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সে সময় পৃথিবীর বহুরাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প রচনা করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বিদেশী ঋণ ও সহায়তা গ্রহণ করে।

ভারতবর্ষে ১৯৫০ সাল থেকে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেকগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শুরু থেকেই এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারত সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হাতে নেয়। যেমন ভাখরা নাঙ্গাল বাঁধ প্রকল্প, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইস্পাত কারখানা স্থাপন, খনন, সার কারখানা স্থাপন এবং কৃষির আধুনিকীকরণ ইত্যাদি। এটা আশা করা হয়েছিল যে, এই সকল বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হয়েছিল যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই সুফল ধীরে ধীরে দেশের দরিদ্র অংশের জনগণের মধ্যে 'চুঁইয়ে পড়বে', যা সকল শ্রেণির জনগণের অর্থনৈতিক মানোন্নোয়ন এবং বৈষম্য দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই উদ্দেশ্যে সরকার বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত কৌশলগুলো গ্রহণ করে। আই আই টির মতো আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উন্নত রাষ্ট্রগুলো থেকে প্রযুক্তিগত

জ্ঞান অর্জনের জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটা বিশ্বাস করা হয়েছিল যে এই সকল উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ ধীরে ধীরে উন্নয়ন ও আধুনিকতার পথে এগিয়ে যাবে।

ভারত ও অন্যান্য রাষ্ট্রের এই সকল উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বিভিন্ন সময়ে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। ফলস্বরূপ উন্নয়নের লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১০.৩ উন্নয়ন মডেলের সমালোচনা (Criticism of Development Model)

সমালোচকদের মতে যে সকল উন্নয়ন মডেল বিভিন্ন রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত হয়েছে, সেগুলো উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যয়ের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ এখনও সীমাহীন ঋণের বোঝায় ন্যুব্জ এবং এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য উন্নত রাষ্ট্রগুলো থেকে নতুন করে ঋণ নিচ্ছে। ফলে অর্জিত অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে উন্নয়ন-লক্ষ্যের কোনো প্রকার সামঞ্জস্য থাকছে না এবং দারিদ্র্য ও মহামারির মতো বিপর্যয় সমগ্র মহাদেশকে গ্রাস করছে।

এই কাজটি করো

তোমাদের এলাকায় কি কোনো গুরত্বপূর্ণ প্রকল্প যেমন বাঁধ নির্মাণ, রাস্তাঘাট, রেল বা শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে? এসকল প্রকল্পের বিরুদ্ধে কি কোন প্রতিবাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে? আন্দোলনকারীগণ কোন্ কোন্ বিষয় উত্থাপন করে? এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য কী? বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য আন্দোলনকারী ও সরকারি আধিকারিকদের সাথে কথা বলো।

উন্নয়নের সামাজিক মূল্য (The Social Costs of Development)

এই ধরনের উন্নয়ন মডেলের সামাজিক মূল্যও অপরিসীম। বিশাল বাঁধ নির্মাণ, শিল্প কারখানা স্থাপন, খনন কার্য এবং অন্যান্য পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে অসংখ্য মানুষ তাদের এলাকা ও ঘর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়। এই ধরনের বাস্তুচ্যুতির ফলে জীবন জীবিকা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় এবং দারিদ্র্যতার বৃদ্ধি ঘটে। ঐতিহ্যগত ভাবে অভ্যস্ত কৃষিজীবিগণ যদি নিজেদের পেশা ও বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়, তাহলে তারা শহুরে এবং গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা আরও স্ফীত হয়। দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠা ঐতিহ্যগত ও পেশাগত দক্ষতাও বিনষ্ট হয়। নতুন স্থানে উদ্বাস্তু হওয়ার ফলে এ সকল মানুষ নিজেদের সম্প্রদায়গত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলে। স্বভূমি থেকে এই ধরনের উৎখাত অনেক রাষ্ট্রই সমাজকে সংঘাতের দিকে ধাবিত করছে।

বাস্তুচ্যুত জনগণ সবসময় তাদের দুর্ভাগ্যজনিত অবস্থাকে নীরবে মেনে নেয়নি। তোমরা হয়তো 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের' কথা শুনেছ, যা দীর্ঘকাল ধরে নর্মদা নদীর উপর সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের সমর্থকরা দাবী করে যে এই বাঁধের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে, বিশাল এলাকাজুড়ে কৃষিজমি সেচের আওতায়

আসবে এবং কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের মতো মরু এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে। বাঁধ নির্মাণের বিরোধীরা এই দাবিগুলো মানতে চায় না। তাদের মতে এই বাঁধের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এই সব লোকেরা বাঁধ নির্মাণ ও প্লাবনের কারণে নিজ বাস্তু এবং জীবিকা দুটোই হারিয়েছে। এই মানুষগুলোর অধিকাংশই আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের; যারা দেশের সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির অন্তর্গত। অনেকে এই যুক্তিও দিয়ে থাকে যে এইধরনের বাঁধ নির্মাণ বিশাল বনাঞ্চলকে প্লাবিত করে এবং বৃহত্তর প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে।

উন্নয়নের পরিবেশগত মূল্য (Environmental Costs of Development)

অনেক দেশেই উন্নয়ন প্রক্রিয়া বড়ো আকারে পরিবেশগত ভারসাম্যকে ব্যাহত করছে এবং যার কুফল শুধু বাস্তুচ্যুত জনগণই নয়, সকল প্রকার মানুষই ভোগ করতে শুরু করেছে। ২০০৪ সালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূল অঞ্চলে আছড়ে পরা 'সুনামির' সময়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে ম্যানগ্রোভ (গরান গাছ বিশিষ্ট বনাঞ্চল) ধ্বংস এবং সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বিশাল বিশাল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণই এই ধ্বংস লীলার অন্যতম কারণ। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্ব উষ্ণায়ণের কথা শুনেছ। মেরু অঞ্চলে ক্রমাগত বরফ গলার ফলে বায়ু মণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস ক্রমাগত প্রবেশ করছে যার কারণে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের মত দেশের নিম্নাঞ্চল গুলো বন্যা ও প্লাবনে ডুবে যাচ্ছে।

দূর ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিবেশগত সংকট আমাদের সকলকেই গভীরভাবে গ্রাস করবে। ইতিমধ্যেই বায়ু দূষণ ধনী- দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য ভয়ানক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ অপচয় বিশেষ করে কম সুবিধাভোগী মানুষের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে আনবে। বনাঞ্চল ধ্বংস হলে দরিদ্ররাই বেশি প্রভাবিত হয় কারণ তারাই বেঁচে থাকার তাগিদে খাদ্য, ওষুধ ও জ্বালানি ইত্যাদি কাজে বনজ সম্পদ ব্যবহার করে থাকে। নদী, পুকুর ইত্যাদি শুকিয়ে গেলে কিংবা ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নীচে নেমে গেলে ব্যবহার যোগ্য জল সংগ্রহের জন্য মহিলাদের দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়।

আমাদের প্রত্যাশিত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো বর্তমানে প্রাকৃতিক শক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের উপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভরশীল। পৃথিবীতে শক্তির বেশিরভাগ আহরণ করা হয় অনবীকরণযোগ্য উৎস যেমন, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম থেকে।

মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের জন্য আমাজন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার ঘন বন উজাড় করা হচ্ছে। অনবীকরণযোগ্য সম্পদ কি যথেষ্ট পরিমাণে মজুত আছে, যা দিয়ে উন্নত রাষ্ট্রগুলো কিংবা সকল মানুষ বিলাসী জীবন যাপন করতে পারবে? এ ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হবে, 'না'। যদি তাই হয় তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্মের কী হবে? তাদের হাতে কি আমরা বহুমাত্রিক সমস্যা জর্জরিত একটি ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবী তুলে দিচ্ছি?

কেন্ সারো-উইয়া (Ken Saro-Wiwa)

কল্পনা করো যে তোমার বাড়ির পেছনে হঠাৎ করে প্রচুর গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেল। উন্নয়নের নাম করে সরকার যদি সেখান থেকে একটু একটু ধন নিয়ে যায়, তোমার কেমন লাগবে? এ ধরনের উন্নয়ন তোমার জীবনযাত্রার মান কিংবা বসবাসরত এলাকায় সুযোগ সুবিধা সমূহকে প্রতিফলিত করবে না। আবার, গুপ্তধনের পাশে অবস্থানের কারণে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বারবার তোমার বাড়িঘর ভাঙচুর করবে। এই ধরনের উন্নয়নকর্ম কি এই সকল মানুষদের প্রতি চরম অন্যায় নয়, যাদের বাড়িতে কিংবা আশপাশে গুপ্তধন পাওয়া গেছে?

১৯৫০ সালে নাইজেরিয়ার ওগোনি অঞ্চলে খনিজ তেল আবিষ্কৃত হয়, সেখান থেকে পরবর্তীতে অপরিশোধিত তৈল উৎপাদন শুরু হয়। তৎক্ষণাৎ ওই অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিকাশ ও বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যবস্থার কারণে দুর্নীতি, পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হতে থাকে। ফলে যে এলাকায় খনিজ সম্পদ পাওয়া গেল, সে অঞ্চলের উন্নয়নই সর্বপ্রথম বাধাপ্রাপ্ত হল।

জন্মসূত্রে ওগোনি অঞ্চলের অধিবাসী কেন্ সারো-উইয়া ১৯৮০ দশকের একজন নামকরা সাংবাদিক, লেখক এবং টেলিভশন প্রযোজক ছিলেন। গবেষণায় তিনি আবিষ্কার করে যে তার আশপাশে প্রবল নির্যাতন চলছে এবং উনি এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি লক্ষ করলেন যে ওগোনির কৃষকদের পায়ের তলায় প্রাপ্ত সম্পদের মধ্য দিয়ে শিল্পপতিরা লাভবান হচ্ছে অথচ বিনিময়ে সেখানকার পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত করা হল এবং মানুষের জীবন জীবিকা চরমভাবে উপেক্ষিত থেকে গেল।

১৯৯০ সালে সারো-উইয়া তৃণমূল স্তরের সকল শ্রেণির মানুষদের নিয়ে 'মুভমেন্ট ফর দ্য সারভাইভাল অব দ্য ওগোনি পিপল' (MOSOP) নামে সবার জন্য উন্মুক্ত একটি রাজনৈতিক অহিংস আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলন এতটাই শক্তিশালী ছিল যে ১৯৯৩ সালেই তৈল কোম্পানিগুলো ওগোনি অঞ্চল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এর জন্য সারো-উইয়াকে চরম মূল্য দিতে হয়। নাইজেরিয়ার সামরিক শাসকরা তাঁকে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা হত্যা মামলায় জড়িয়ে সামরিক ট্রাইবুন্যালে বিচারের নামে প্রহসন করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। সারো-উইয়া বলেছিলেন যে আসলে সামরিক শাসকরা ওগোনি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হওয়া বহুজাতিক কোম্পানি 'শেল' (Shell) এর পক্ষ অবলম্বন করে তাকে এই শাস্তি দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলো একজোট হয়ে বিচারের নামে এই প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে এবং তাঁর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলনকে উপেক্ষা করে নাইজেরিয়ার সামরিক শাসকরা ১৯৯৫ সালে সারো-উইয়ার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।

পরিবেশ বাদ (Environmentalism)

তুমি নিশ্চয় দূষণ, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন, বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন ইত্যাদি শব্দগুলো সম্পর্কে প্রায়ই শুনে থাক। পরিবেশ আন্দোলনের সাথে যুক্ত বহুল প্রচলিত এই শব্দগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। পরিবেশবাদীরা মনে করেন যে মানব সমাজের এটা জানা উচিত কীভাবে বাস্তুতন্ত্রের সাথে সুষম সম্পর্ক বজায় রেখে বাঁচতে হয় এবং কেন নিজেদের তাৎক্ষণিক স্বার্থপূরণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার করা যায় না। তারা এটাও বিশ্বাস করেন যে মানব সমাজ এত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় এবং ধ্বংস করছে, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাবে দূষিত আবহাওয়া, বিষাক্ত নদী ও একটি অনুর্বর পৃথিবী।

পরিবেশবাদী আন্দোলনগুলোর মূল শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় উনিশ শতকের শিল্পায়নের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামের মধ্যে। বর্তমানে পরিবেশ আন্দোলন একটি বিশ্বজনীন রূপ লাভ করেছে। যেখানে হাজারো সংখ্যায় বেসরকারি সংগঠন এবং কিছু পরিবেশ বান্ধব রাজনৈতিক দলও রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে যুক্ত বিশ্বখ্যাত কিছু সংগঠন রয়েছে। যেমন গ্রিন পিস এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড।

চিপকো আন্দোলন নামে ভারতেও একটি সংগঠন হিমালয়ের বনাঞ্চল সংরক্ষণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এসকল সংগঠন সংশ্লিষ্ট সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে পরিবেশের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে প্রণয়ন ও পরিমার্জনের জন্য বাধ্য করে।

উন্নয়নের মূল্যায়ন
(Assessing Development)

এটা অবশ্যই বলা যাবে না যে পৃথিবীতে উন্নয়ন শুধুমাত্র নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। এর মাধ্যমে কিছু দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি উন্নয়নশীল বিশ্বে বৈষম্যের মাত্রা খুব একটা হ্রাস না পেলেও দারিদ্র্য সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা হিসাবে এখনও বিরাজমান। সাধারণত এটা মনে করা হয় যে বিত্তবানদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাব সমাজের দরিদ্র এবং সুবিধা-বঞ্চিত শ্রেণির উপরেও পড়ে এবং তাতে সকলের জীবনযাত্রার মান সামান্য উন্নত হয়। তবে বিশ্বব্যাপী ধনী এবং দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। একটি দেশের প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশি হলেও তার সুবিধা যে সমাজের সকলেই সমানভাবে পাবে তা নিশ্চিত নয়। যখনই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তার থেকে লব্ধ সুবিধাগুলো সুষমভাবে বণ্টিত হয় না, তখনই বর্তমান সুবিধাভোগীরাই সেগুলো আরও বেশি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে।

সাম্প্রতিক কাল থেকে এটা ক্রমাগত স্বীকৃত হচ্ছে যে উন্নয়নের একটি ব্যাপক ধারণা গ্রহণ করা উচিত। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে সমস্যা আরও বাড়তে থাকে; যার ফলে অর্থনৈতিক প্রগতি সন্তোষজনক হয় না। সুতরাং বর্তমানে বৃহত্তর অর্থে উন্নয়ন বলতে এমন এক ব্যাপক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে সমাজের সকলেই আরও উন্নত ও মান সম্মত জীবনযাপন করতে পারে।

উন্নয়ন

রাজনৈতিক তত্ত্ব

উন্নয়ন বলতে যদি মানুষের জীবনের গুণগতমান বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বোঝায় তাহলে যুক্তি দিয়ে এটা বলা যেতে পারে যে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের হার উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না, বরং এ ধরনের চিন্তা হবে বিভ্রান্তিকর। বর্তমানে উন্নয়নের বৃহত্তর এবং বিকল্প মাপকাঠির অনুসন্ধান চলছে। এমন একটি মাপকাঠি হচ্ছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন প্রতিবেদন যা প্রতিবছর ইউ এন ডি পি (UNDP) দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নসূচক যেমন সাক্ষরতা, শিক্ষা, সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল, গর্ভকালীন মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে রাষ্ট্রসমূহের কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে একটি ক্রমতালিকা প্রস্তুত করে। এই মাপকাঠিগুলোকে মানব উন্নয়নসূচক বলা হয়। উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে উন্নয়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের স্বাধীন পছন্দ ও সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবনের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থানের মতো প্রয়োজনগুলোকে সহজভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়। এই ধারণাকে বলা হয় মৌলিক চাহিদাজনিত দৃষ্টিভঙ্গি। প্রচলিত জনপ্রিয় স্লোগান যেমন 'অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান', 'গরিবি হঠাও', রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি এমন এক সংবেদনশীলতার জন্ম দেয় যার ভিত্তিতে সমাজ মনে করে যে জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষেই মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, কোনো ব্যক্তি যদি খাদ্য এবং বাসস্থানের অভাবে ক্ষুধায় অথবা ঠান্ডায় মৃত্যুবরণ করে, অথবা কোনো শিশু যদি বিদ্যালয়ে না গিয়ে শ্রমিকের কাজ করে, তাহলে এগুলো হবে অনুন্নত রাষ্ট্রের উদাহরণ।

চলো চিন্তা করি

তোমার জন্য সহজলভ্য সাম্প্রতিক মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে উন্নয়নসূচক সম্পর্কে তথ্যাদি (সংবাদ প্রতিবেদন , নিবন্ধ, তালিকা ইত্যাদি) সংগ্রহ করো। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন দল তৈরি করে প্রত্যেকে নীচে দেওয়া বিষয়গুলো সম্পর্কে ভারতের অবস্থান নির্ণয় করো।

- মানব উন্নয়ন সূচকের তালিকায় ভারতের অবস্থান পরিবর্তন।
- প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় ভারতের অবস্থান।
- বিভিন্ন মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের পরিসংখ্যান।
- মানব উন্নয়ন সূচক হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সাথে ভারতের অবস্থান যাচাই করো।

১০.৪ উন্নয়নের বিকল্প ধারণা
(Alternative Conceptions of Developement)

পূর্বের অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা এ পর্যন্ত চলে আসা উন্নয়নের ধারণাগুলোর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করেছি। এতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সংকীর্ণ নীতির ফলে বর্তমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলো মানব ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অবর্ণনীয় ক্ষতি করেছে, পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রম দ্বারা লব্ধ সুবিধাগুলো মানুষের মধ্যে অসমভাবে বন্টিত হয়েছে। আবার, বিভিন্ন রাষ্ট্রে দ্বারা গৃহীত উন্নয়ন কৌশলগুলো মূলত ছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রকল্প ও পদ্ধতিগুলোর অগ্রাধিকার যাচাই এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল সিদ্ধান্তই উচ্চস্তরীয় রাজনৈতিক নেতা ও আমলারা প্রণয়ন করতেন। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলের জনগণের সাথে সরকার কিংবা আমলা কখনোই এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করত না, অথচ এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই মানুষগুলোই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হত। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের পরম্পরাগতভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হত না এবং তাদের সাথে যুক্ত পারিবেশিক ও মানবিক স্বার্থগুলোও বিবেচনা করা হত না। এ বিষয়টি গণতান্ত্রিক কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক উভয় ধরনের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই সত্য। সুতরাং উন্নয়ন এমন এক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে যার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণি যারা এই প্রকল্পগুলোর সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী। যার ফলে তখন এক বিকল্প উন্নয়নের ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে যা ন্যায়সঙ্গত এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন রূপরেখা তৈরি করার জন্য সচেষ্ট। এই বিকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অধিকার, সমতা,স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মতো বিষয়গুলো বিবেচনা করা হচ্ছে। এই অনুচ্ছেদে উন্নয়ন বিতর্কের প্রেক্ষাপটে আমরা অনুসন্ধান করব, কীভাবে বিকল্প উন্নয়ন ভাবনাগুলো নতুন দিক নির্দেশ করছে।

চলো চর্চা করি

প্রত্যহ আমাদের দ্বারা পরিত্যক্ত বস্তুগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো। চিন্তা করো কীভাবে পরিত্যক্ত বস্তুগুলো নবীকরণ ও পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ হ্রাস করতে পারি।

অধিকারের দাবি (Right Claims)

আমরা লক্ষ করেছি কীভাবে ক্ষমতাবান লোকেরা উন্নয়নের সুবিধাগুলো কোণঠাসা করে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে গেছে অথচ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ঘটা পরিবেশগত বিপর্যয়, স্থানীয় মানুষের বাস্তুচ্যুতি এবং জীবনজীবিকা হারিয়ে যাওয়ার মতো অবর্ণনীয় ক্ষতি এখনো দরিদ্র এবং অসহায় জনগণ বহন করে চলেছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত বিষয়সমূহের অন্যতম একটি হল, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি উন্নয়ন প্রকল্পে প্রভাবিত জনগণের সুরক্ষার দাবি সম্পর্কিত। গণতন্ত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত জনগণের পরামর্শ দেওয়ার অধিকার কি স্বীকৃত? সরকার অনুমোদিত কোনো সিদ্ধান্ত যদি জনগণের জীবিকার উৎসের উপর হুমকি স্বরূপ প্রতীয়মান হয়, সে ক্ষেত্রে তারা কি জীবিকার অধিকার সংরক্ষণের জন্য দাবি করতে পারে? অন্য প্রশ্নটি

হল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার সম্পর্কিত। কোনো সম্প্রদায় কি ঐতিহ্যগত ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের অধিকার দাবি করতে পারে? এই দাবিটি বিশেষভাবে উপজাতি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা বিশেষ সামাজিক রীতিনীতি মেনে প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে সমষ্টিগত জীবনযাপন করে।

এখানে মৌলিক প্রশ্ন হল, প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা কার? স্থানীয় সম্প্রদায়, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র, নাকি সকলের সম্মিলিত মালিকানা? যদি আমরা মনে করি প্রাকৃতিক সম্পদ সকল মানুষের, তাহলে 'সকলে' বলতে ভবিষ্যত প্রজন্মকেও বোঝানো হয়। এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক সমাজের প্রধান দায়িত্ব হল বিভিন্ন স্তরের জনগণের পৃথক পৃথক দাবিগুলো মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান করা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের আশা আকাঙ্খার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।

চলো চর্চা করি

প্রবাহমান নদ-নদীগুলোর মালিক জনগণ, সরকার নয়। সুতরাং জল সম্পদ সম্পর্কিত যে কোনো সিদ্ধান্ত জনগণের সম্মতি ছাড়া নেওয়া উচিত নয়।

গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ (Democratic Participation)

তোমার নিজের ভালোর জন্যই পিতা-মাতা এবং গুরুজনদের মান্য কর, এ ধরনের কথা তোমাকে কতবার বলা হয়েছে? এই প্রশ্নটি শুনে তোমার কি কখনো বলতে ইচ্ছে করেছে আমার জন্য যদি এটা ভালো হয় তবে এ বিষয়ে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিন, গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পদের জন্য বিবাদ অথবা উন্নত জীবন অর্জনের ক্ষেত্রে মত পার্থক্যগুলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে উপর থেকে আরোপিত নয় বরং সকলের স্বাধীন মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং, সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকেই যদি সমষ্টিগত উন্নত জীবনের প্রত্যাশী হয়, তাহলে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সফল বাস্তবায়নের পন্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। অন্যের দ্বারা প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসরণ করা আর অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমটি হল অন্যের দ্বারা পরিকল্পনা । সৎ উদ্দেশ্যে প্রণীত হলেও স্থানীয় প্রয়োজন অনুভবের ক্ষেত্রে তা অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অপরিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণই হল মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়ন।

গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন উভয়ই সকলের সার্বিক কল্যাণ কামনা করে। কিন্তু কোন্ পদ্ধতির দ্বারা সার্বিক কল্যাণ কথাটি ব্যাখ্যা করা যায়? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

এই দেশগুলোতে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার প্রেক্ষাপটে যে সকল উপায়গুলো সুপারিশ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল নির্দিষ্ট এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পে সেখানকার সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহকে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। যার জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টিকে সমর্থন করা হয়েছে। একদিকে এটা যুক্তি

চলো চর্চা করি

এগুলো নমর্দা উপত্যকার দমখেদি গ্রামের সত্যাগ্রহের ছবি। সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণের ফলে নর্মদা উপত্যকায় প্রবল বন্যার সৃষ্টি হয়। 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনের সাথে যুক্ত প্রতিবাদীরা বন্যার জলস্ফীতিতেও দাঁড়িয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করতে থাকে। বাড়ন্ত বন্যার জল যখন তাদের কাঁধ স্পর্শ করে তখন সরকার তাদের গ্রেপ্তার করে। এই বিতর্ক সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করো এবং এই বাঁধের সুবিধা/অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করো। সর্দার সরোবর বাঁধ কি স্থানীয় জলসংকট সমাধানের উত্তম পন্থা ছিল? সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদ কি বৈধ ছিল?

ছবির উৎস ঃ হরেকৃষ্ণ এবং দীপা জৈন / www.narmada.org

হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যে জনগণের সাথে ওই সকল পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা উচিত যা তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এর ফলে ক্ষতিকারক যে কোনো পরিকল্পনাকে স্থানীয় জনগণ প্রত্যাখ্যানও করতে পারে। অন্যদিকে এটাও বলা হয় যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণ সম্পদসমূহকে তাদের প্রয়োজনের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। কোথায় রাস্তা নির্মাণ করা প্রয়োজন, মেট্রো অথবা স্থানীয় যানবাহনের গমনাগমন পথ, কোথায় বিনোদন উদ্যান বা বিদ্যালয় নির্মাণ করা প্রয়োজন, গ্রামসুরক্ষায় কোথায় বাঁধ নির্মাণ হবে, ইন্টারনেট ব্যবস্থা কোথায় থাকবে ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় জনগণই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

পূর্বে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে চলমান উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো হল "উপর থেকে নীচে" এবং এই ব্যবস্থায় জনগণ হল উন্নয়নের উদ্দেশ্য। এটা মনে করা হয় যে এই ধরনের সমস্যা সমাধানের একটি উত্তম পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিতে জনগণের অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে কিছুটা অবহেলা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীভূত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার মাধ্যমে পরম্পরাগত ও আধুনিক পদ্ধতি সৃজনশীলতার সাথে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রা (Development and Life Style)

উন্নয়নের বিকল্প ধারা অতিমাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভরশীলতা, পারিবেশিক বর্জ্যবৃদ্ধি, ব্যয়বহুল পরিকল্পনা ইত্যাদি থেকে সরে আসার চেষ্টা করে। দেশে মুঠো ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা, অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম, কিংবা নিজস্ব গাড়ি ব্যবহারকারীর সংখ্যার নিরিখে উন্নয়নকে পরিমাপ করা

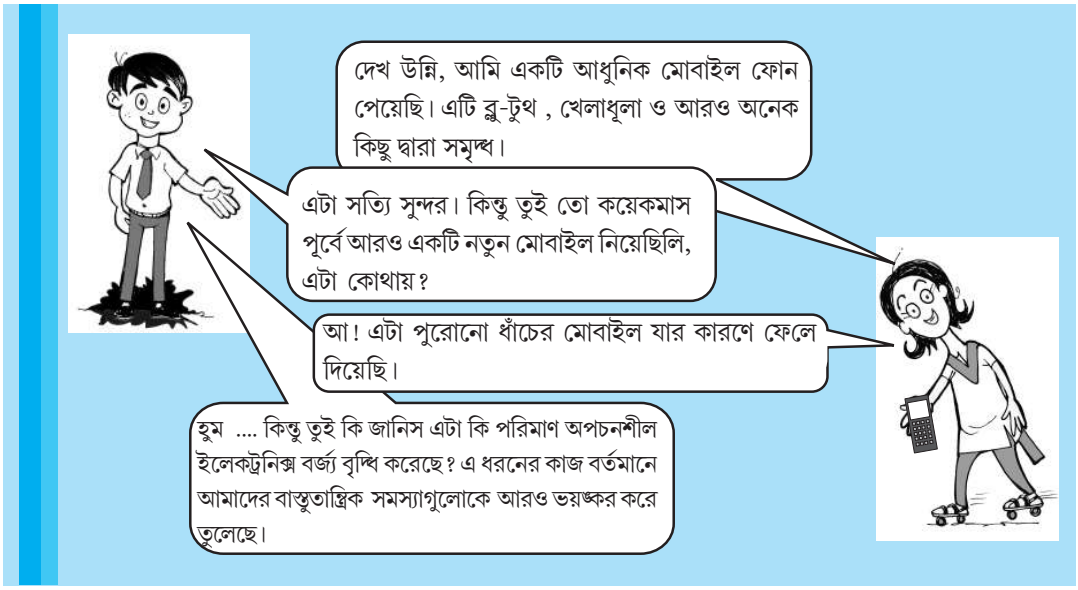

উচিত নয়, বরং তা করতে হবে মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের সন্তুষ্টি এবং শান্তি ও সম্প্রীতির মাধ্যমে জনগণের মান সম্মত জীবনযাপনের ভিত্তিতে। উন্নয়নের এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং শক্তির পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসগুলোকে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করার জন্য প্রচেষ্টা নিতে হবে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, সৌর এবং জৈব গ্যাস প্রকল্প স্থাপন, প্রাকৃতিকভাবে জৈব সার উৎপাদন, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ইত্যাদি হল উল্লিখিত প্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসকল কর্মকাণ্ডের জন্য স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যেখানে স্থানীয় জনগণের অধিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। অত্যধিক উন্নয়নের জন্য বড়ো প্রকল্প গ্রহণ করাই একমাত্র পথ নয়। বড়ো বড়ো বাঁধ নির্মাণের বিরোধীরা সবসময়ই ছোটো ছোটো বাঁধ নির্মাণের পক্ষপাতী। কারণ এতে বিনিয়োগ কম লাগে, বেশি সংখ্যক মানুষকে উচ্ছেদ করতে হয় না এবং যা স্থানীয় জনগণের জন্য কল্যাণকর হয়।

উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে, অনবীকরণযোগ্য বস্তুর ব্যবহার কমিয়ে আমাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। অনেকে এটাকে নিয়ে কূট তর্ক করে যে, এ ধরনের আবেদনের মধ্য দিয়ে জনগণকে নিজস্ব জীবনযাত্রার মান খাটো করতে বলা হয় এবং এর মাধ্যমে তাদের পছন্দমতো

জীবন যাপনের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়। বিতর্কে এটাও বলা যায় যে বিকল্প জীবনধারা, স্বপ্ন, সুন্দর ভবিষ্যৎ এর প্রত্যাশায় ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতাকে বৃদ্ধি করে। তবে এধরনের নীতি সরকার এবং জনগণের মধ্যে বৃহত্তর পারস্পরিক সহযোগিতা কামনা করে। এর অর্থ হল উন্নয়নের যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা। কিন্তু যদি আমরা উন্নয়নকে ব্যক্তির স্বাধীনতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসেবে ধরে নিই এবং জনগণকে নিষ্ক্রিয় না ভেবে উন্নয়নের সক্রিয় সুবিধাভোগী হিসাবে মনে করি, তাহলে বিকল্প উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় সমষ্টিগত সহমতে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ায় অধিকার, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার বিষয়ে আমাদের ধারণা আরও প্রসারিত হবে।

উপসংহার (Conclusion)

উন্নয়নের ধারণা উন্নত জীবনের প্রত্যাশা করে। এটা একটা শক্তিশালী প্রত্যাশা,যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের কর্মশক্তির সঞ্চালক হিসেবে কাজ করে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কীভাবে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য উন্নয়ন সম্পর্কিত মতাদর্শগুলো তীব্র সমালোচনার দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক, দীর্ঘস্থায়ী এবং আরও বেশি ন্যায়সংগত একটি উন্নয়ন আদর্শের জন্য বহুমাত্রিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলছে। এই প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র, সমতা এবং অধিকারের মতো রাজনৈতিক তত্ত্বের ধারণাগুলোকে নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়ায় যে বিষয়গুলো ওঠে এসেছে তার একটি হল, আমাদের পছন্দ কিংবা আশা-আকাঙ্খা পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ এবং প্রজাতিসমূহের জীবনধারাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। তাই ভাবা উচিত যে আমরা বিশ্ব পরিমণ্ডলের অংশমাত্র এবং আমাদের ভাগ্য অন্যের ভাগ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং পছন্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের মৌলিক কর্তব্য হল বর্তমান প্রয়োজনের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থগুলোকেও সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা।

অনুশীলনী

১) উন্নয়ন বলতে তুমি কী বোঝ ? উন্নয়নের এই ধরনের সংজ্ঞার দ্বারা কি সমাজের সকল অংশের মানুষ লাভবান হয়?

২) পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে যে ধরনের উন্নয়নের ধারণা ব্যক্ত করা হয়, তার সামাজিক ও পারিবেশিক মূল্য ব্যাখ্যা করো।

৩) উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট কিছু নিত্যনতুন অধিকার ও দাবি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪) অন্যান্য ধরনের সরকারের তুলনায় গণতান্ত্রিক সরকার কীভাবে উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহায্যে মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে?

৫) তোমার মতে, উন্নয়নের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক মূল্য যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় প্রতিবাদী আন্দোলনসমূহ কতটুকু সফল হয়েছে? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : প্রথম পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট ছবি (সর্দার সরোবর নর্মদা নিগম লিমিটেড)

নোট